শতকসেরা হাসির গল্প

প্রকাশন

৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রকাশক : অমিতা চট্টোপাধ্যায়
আশীর্বাদ প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রথম প্রকাশ : ৩০ জানুয়ারি ১৯৬১

উপদেষ্টা :
অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়ান স্মল ইণ্ডাস্ট্রি,
বিজনেস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট

অলংকরণ : গোপাল সান্যাল

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : বিজন কর্মকার

মুদ্রক : অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণি (ব্লক কে-১)
কলকাতা ৭০০ ০০৬

শুরুর কথা

অনুরূপ সঙ্কলন আছে। অতিশয় কঠিন কাজ। কেন কঠিন? যেমনটি করতে চাই তেমনটি করা যায় না। শুদ্ধ বাংলায় যা সরস গল্প, কথ্য বাংলায় তা হাসির গল্প। তাই কী? সরস আর হাসি এক নয়। হাসির গল্প বললে গল্পটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হল। সমস্ত মাত্রা কেড়ে নিয়ে একটিই রাখা হল, সেটি হল হাসি। পাঠক পড়বেন আর হাহা করে হাসবেন।

লেখকের এ বড় কঠিন দায়। পাঠককে হাসাতে হবে। পরতে পরতে হাসির উপাদান খুঁজতে হবে। সার্কাসের ক্লাউন, নাটকের ভাঁড়। তাঁদের হাতে বাড়তি একটি অস্ত্র থাকে। সেটি হল অঙ্গভঙ্গি। ইংরেজি করলে, বডি ল্যাঙ্গোয়েজ। লেখকের হাতে মাত্র একটি অস্ত্র, ল্যাঙ্গোয়েজ। কথা শুধু কথা।

এই কথার কারিগর যাঁরা, তাঁর মজার মজার কথা দিয়ে মানুষকে হাসিয়েছেন। তিনটি উপাদান, পরিস্থিতি, চরিত্র আর সংলাপ। হাসির লেখক যাঁরা তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন রসের আঁধার। রসিক না হলে রসিকতা করা যায় না। মানুষের এটি একটি জন্মগত গুণ! সব রসিকই যে লেখক হবেন এমনও আশা করা যায় না। অনেকে কথায় কথায় পরিবেশ মাত করে দিতে পারেন। এঁরা হলেন মজলিশি মানুষ। যদি বলা হয়, লিখুন না, আর যদি লেখেনও, হতাশ হতে হবে। কোথায় গেল সেই 'উইট', 'হিউমার', 'ফ্লেয়ার', 'স্পার্ক'।

হাসির লেখা যে-কোনও মুহূর্তে হাস্যকর হয়ে যেতে পারে। হাসিও হল না, কান্নাও হল না, কিছুই হল না। এই জাতের লেখা সহজ কাজ নয়। বীরবল বললেন, 'বাংলাভাষায় গুণপনাযুক্ত ছ্যাবলামির বড় অভাব।' কেন অভাব? চর্চা নেই। দ্বিতীয় কারণ, মানুষ বিষয়ে থাকলে বিষয়ী হয়। সেই চর্চাই তখন তার জীবন অধিকার করে। সাহিত্য আর ধর্ম, একই টাকার এ-পিঠ,ও-পিঠ। নিরাসক্ত দৃষ্টি আর জীবনবোধ না থাকলে রসসৃষ্টি করা যায় না। কোনওরকম ধান্দা, পাওয়ার আশা থাকলে সাহিত্য একপেশে হবে, জীবনবিমুখ হবে। বাস্তব, বাস্তব বলে যতই চিৎকার করা হোক, উপস্থাপিত বাস্তব হবে তৈরি বাস্তব। যেমন জীবন, তেমন জীবন। স্রষ্টা কোনওরকম রাজনীতি জানেন না। সৃষ্টি তাঁর খেয়াল। একই জঙ্গলে সুন্দর বাঘ, সুন্দরী হরিণ। চাঁদের আলোয় হরিণ দেখে বাঘ কবিতা লিখতে বসবে না— সুর চাপিয়ে, বনভূমি কাঁপিয়ে সে গাইবে না, ওগো চপলা নয়না হরিণী। গাছের ডাল থেকে জাম্বুবান নেমে এসে তবলা বাজাবে না। ভাল্লুক ধরবে না গিটার। সাহিত্যিক হরিণ পুলিটজারের আশায় বাঘের বিরুদ্ধে কলম ধরবে না, সন্ত্রাসবাদী বাঘ আমাদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। আমরা আলাদা একটা রাজত্ব চাই। নিরীহ হরিণ সন্ত্রাসবাদী হয়ে কোমরে আর ডি এক্স বেঁধে তাদের ঘাঁটি উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে আত্মঘাতী আক্রমণকারী হবে না। যতদিন পৃথিবীতে বাঘ থাকবে ততদিন তারা হরিণ শিকার করবে।

যতদিন পৃথিবীতে মানুষ থাকবে, ততদিন এক শ্রেণীর মানুষ আর এক শ্রেণীর মানুষকে শোষণ করবে। এক রাজনৈতিক মতবাদের মানুষ অন্য মতবাদী মানুষের উপর হামলা চালাবে। উভয়পক্ষের হানাহানি দেখে গণতন্ত্র হাসবে। সাধারণ মানুষ সহজাত রসবোধ নিয়ে যা বলবেন, তা প্রবাদ হয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসবে— রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

জীবনের বাইরে দাঁড়িয়ে যাঁরা জীবনকে দেখতে জানেন, তাঁরাই জানেন হাসতে আর হাসাতে। নির্মোহ, স্বচ্ছ দৃষ্টি লাভ করে, সর্বত্রই বেঁচে থাকার ফুটবল খেলা দেখেন। কোই জিতা, কোই হারা। বড়া মজা আয়া। এই নজর থেকেই কলম লেখে,

All the world's a stage / And all the men and
women merely players /They have their exits
and their entrances.

এটি ইওরোপের কলম, শেক্সপিয়ার। আমাদের প্রসাদী কলমে, 'এই সংসার মজার কুটি, আমি খাইদাই আর মজা লুটি।' আর আজু গোঁসাই লিখলেন, 'এই সংসার রসের কুটি।' আবার ইওরোপের আর একটি কলম লিখলেন,

Tell me not, in mournful numbers,
Life is but an empty dream.

লংফেলোর দর্শনে Life is real! Life is earnest / And the grave is not its goal. তাঁর মতে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবে মরো না। আর অতীত - Let the dead Past bury its dead / Act-act in the living Present! / Heart within, and God overhead.

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ছদ্মনাম 'ইন্দ্রজিৎ', তিনি এই গোত্রের লেখক ও লেখা নিয়ে যে-সুন্দর আলোচনা রেখে গেছেন তা এই ভাবনার সঙ্গে মেলে। তিনি বলছেন, রম্যলেখক 'আগে কথক, পরে লেখক। অবশ্য লেখকমানুষরা সাধারণত মুখচোরা স্বভাবের লোক। তাঁদের কলমের ডগায় যত সহজে কথা জোগায় জিবের ডগায় তত সহজ নয়। আবার এমন মানুষ দেখেছি যাঁরা চমৎকার আসর জমিয়ে গল্প করতে পারেন, কিন্তু সেই কথাকেই যদি লেখার পাতায় হাজির করতে বলা হয়, তা হলে তা এমন আড়ষ্ট, এমন অপ্রতিভ মূর্তিতে দেখা দেবে যে তাকে আর সেই প্রাণবন্ত স্বতঃস্ফূর্ত কথা বলে চেনাই যাবে না। গুছিয়ে বলা আর গুছিয়ে লেখা এক কথা নয়। বেশির ভাগ মানুষই মুখে এক, কলমে আর। ... ভারতচন্দ্র বলেছিলেন, 'পড়িয়াছি যেই মত বর্ণিবারে পারি; এঁদের কথা হল— বলিয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি।' এঁরা কারা? যাঁরা মজলিশি আবার, 'শব্দের কলরবকে নিঃশব্দের কলরব দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। 'বন্ধুদের মশলিশে যে কথা রসিয়ে জাঁকিয়ে বলতে ভালবাসেন, সে কথাই বৃহত্তর মজলিশ অর্থাৎ বিস্তৃততর পাঠক সমাজকে উদ্দেশ করে লিখে থাকেন।'

যাঁদের কলমের জোর ছিল, এখনও যাঁরা আছেন, যাঁরা হাসির লেখা, মজার লেখা লিখতে পারেন, তাঁরা সাহিত্যের এই বিভাগটিকে কেন যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না। একটি বড়

কারণ বুদ্ধিজীবী মহলে এই লেখার কদর নেই। শুধুমাত্র হাসির লেখা, রম্যরচনার জন্যে লেখককে বড় কোনও পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় না। আরও একটি কারণ হাসির গল্পের চরিত্ররা কখনও স্বাভাবিক হয় না। কেউ একসেন্ট্রিক, কেউ বদরাগী, কেউ ভুলে যায়, বিস্মৃতিপ্রবণ, কেউ আড় বোঝা। চরিত্র আর স্বভাবে ব্যালেন্সড নয়। মজা জমাবার জন্যে এই ধরনের চরিত্র আনতে হয়। এ ছাড়া সিচুয়েশান! এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশ তৈরি করতে হয় যা স্বাভাবিক নয়। এমন কিছু ঘটবে যা সহসা ঘটে না। এমন ঘটনা বাস্তবে ঘটবে কিনা, তাও জোর করে বলা যায় না। কল্পনা আর লেখার গুণে সেই পরিস্থিতিই হয়ে উঠবে বাস্তব— কল্পিত বাস্তব। কিছুক্ষণের জন্যে পাঠক চলে যাবেন সেই জগতে। মজে যাবেন।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে। কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন, তেমনি রসভারতী স্বয়ম্বর সভায় আর সকলকে বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।'

রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করছেন, 'সাহিত্যের মধ্যে কোন বস্তুকে আমরা খুঁজি! ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন সেটা রসবস্তু ... এই রসটা এমন জিনিস যাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায় এবং একপক্ষ অথবা উভয়পক্ষ ভূমিসাৎ হইলেও কোনো মীমাংসা হয় না।'

'অ্যারিস্টোফেনস— রম্যনাটক' সম্পাদক ভূমিকায় লিখলেন,

Laughter is more direct and more Universal
than the emotions of trageoly,
Intellectual fun. needless to say, is
not necessarily lofty.

শাস্ত্র ন'প্রকার রসের কথা বলছেন, শৃঙ্গার বা আদিরস, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত। মতান্তরে রস দশপ্রকার। দশমটি হল, বাৎসল্য রস বা বৎসল রস।

এই সঙ্কলনে হাস্যরসেরই আয়োজন। যাঁরা লঘু ও গুরু উভয় প্রকারই লিখতেন এবং লিখছেন, তাঁদেরই রচনা থেকে এক একটি গল্প সংগৃহীত। অনেকেই দূরে রয়ে গেলেন, কারণ তাঁদের রচনা ক্রমশই দুর্লভ থেকে দুর্লভতর হয়ে যাচ্ছে। ফিরিয়ে আনার তেমন কোনও প্রয়াস নেই। অদ্ভুত উদাসীনতায় এই সব নক্ষত্র ক্রমশই দূর আকাশে চলে যাচ্ছেন। এই সঙ্কলন প্রস্তুত-কালে আর একটি অভিজ্ঞতা হল, আমাদের এই রাজ্যে গ্রন্থাগারের অভাব। যেগুলি আছে, তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাসও আমরা হারাচ্ছি।

কানকাটা রাজার দেশ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক ছিল রাজা আর তাঁর ছিল এক মস্ত বড়ো দেশ। তার নাম হল কানকাটার দেশ। সেই দেশের সকলেরই কান কাটা। হাতি, ঘোড়া, ছাগল, গরু, মেয়ে, পুরুষ, গরিব, বড়োমানুষ সকলেরই কান কাটা। বড়োলোকদের এক কান, মেয়েদের এক কানের আধখানা, আর যত জীবজন্তু গরিব দুঃখীদের দুটি কানই কাটা থাকত। সে দেশে এমন কেউ ছিল না যার মাথায় দুটি আস্ত কান, কেবল সেই কানকাটা দেশের রাজার মাথায় একজোড়া আস্ত কান ছিল। আর সকলেই কেউ লম্বা চুল দিয়ে, কেউ চাঁপ দাড়ি দিয়ে, কেউ বা বিশ গজ মলমলের পাগড়ি দিয়ে কাটা কানা ঢেকে রাখত, কিন্তু সেই রাজা মাথা একেবারে ন্যাড়া করে সেই ন্যাড়া মাথায় জরির তাজ চাপিয়ে গজমোতির বীরবৌলিতে দুখানা কান সাজিয়ে সোনার রাজসিংহাসনে বসে থাকতেন।

একদিন সেই রাজা এক-কান মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কানকাটা ঘোড়ায় চেপে শিকারে বার হলেন। শিকার আর কিছুই নয়, কেবল জন্তু জানোয়ারের কান কাটা। রাজ্যের বাইরে এক বন ছিল, সেই বনে কানকাটা দেশের রাজা আর এক-কান মন্ত্রী কান শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। এমনি শিকার করতে করতে বেলা যখন অনেক হল, সূর্যদেব মাথার উপর উঠলেন, তখন রাজা আর মন্ত্রী একটা প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় ঘোড়া বেঁধে শুকনো কাঠে আগুন করে যত জীবজন্তুর শিকার করা কান রাঁধতে লাগলেন। মন্ত্রী রাঁধতে লাগলেন আর রাজা খেতে লাগলেন, মন্ত্রীকেও দু-একটা দিতে থাকলেন। এমনি করে দু'জনে খাওয়া শেষ করে সেই গাছের তলায় শুয়ে আরাম করছেন, রাজার চোখ বুজে এসেছে, মন্ত্রীর বেশ নাক ডাকছে এমন সময় একটা বীর হনুমান সেই গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে রাজাকে বললে, — 'রাজা তুই বড়ো দুষ্টু, সকলের কান কেটে বেড়াস, আজ সকালে আমার কান কেটেছিস ; তার শাস্তি ভোগ কর্।' এই বলে রাজার দুই গালে চড় মেরে একটা কান ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল। রাজা যাতনায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে যখন জ্ঞান হল, তখন রাজা চারিদিকে চেয়ে দেখলেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, হনুমানটা কোথাও নেই, মন্ত্রীবর পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন। রাজার এমনি রাগ হল যে তখনি মন্ত্রীর বাকি কানটা এক টানে ছিঁড়ে দেন ; কিন্তু অমনি নিজের কানের কথা মনে পড়ল, রাজা দেখলেন ছেঁড়া কানটি ধূলায় পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেটিকে তুলে নিয়ে সযত্নে পাতায় মুড়ে পকেটে রেখে তাজ টুপির সোনার জরির ঝালর কাটা কানের উপর হেলিয়ে দিলেন যাতে কেউ কান দেখতে না পায়, তারপর মন্ত্রীর পেটে গুঁতো মেরে বললেন, — ঘোড়া আন। এক গুঁতোয় মন্ত্রীর নাক ডাকা হঠাৎ বন্ধ হল, আর এক গুঁতোয় মন্ত্রী লাফিয়ে উঠে রাজার সামনে ঘোড়া হাজির করলেন। রাজা কোনো কথা না বলে একটি লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে একদম ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়িতে হাজির। সেখানে তাড়াতাড়ি সহিসের হাতে ঘোড়া দিয়েই একেবারে শয়ন-ঘরে খিল দিয়ে পালঙ্কে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

সকাল হয়ে গেল, রাজবাড়ির সকলের ঘুম ভাঙল, রাজা তখনও ঘুমিয়ে আছেন। রাজার নিয়ম ছিল রাজা ঘুমিয়ে থাকতেন, আর নাপিত এসে দাড়ি কামিয়ে দিত, সেই নিয়ম মত সকাল বেলা নাপিত এসে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করলে। এক গাল কামিয়ে যেই আর এক গাল কামাতে যাবে এমন সময় রাজা 'দুর্গা দুর্গা' বলে জেগে উঠলেন। নজর পড়ল নাপিতের দিকে, দেখলেন নাপিত ক্ষুর হাতে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কানে হাত দিয়ে দেখলেন কান নেই। রাজা আপসোসে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে নাপিতের হাতে ধরে বললেন, — 'নাপিত ভায়া এ কথা প্রকাশ কর না। তোমাকে অনেক ধনরত্ন দেব।' নাপিত বললে, 'কার মাথায় কটা কান যে এ কথা প্রকাশ করব!' শুনে রাজা খুশি হলেন। নাপিতের কাছে আর-আধখানা দাড়ি কামিয়ে তাকে দু-হাতে দু-মুঠো মোহর দিয়ে বিদায় করলেন। নাপিত মোহর নিয়ে বিদায় হল বটে কিন্তু তার মন সেই কাটা কানের দিকে পড়ে রইল। কাজে কর্মে ঘুমিয়ে জেগে কী লোকের দাড়ি কামাবার সময়, কী সকাল, কী সন্ধ্যা মনে হতে লাগল — রাজার কান কাটা, রাজার কান কাটা ; কিন্তু কারুর কাছে এ কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না — মাথা কাটা যাবে। নাপিত জাত সহজে একটু বেশী কথা কয়, কিন্তু পাছে অন্য কথার সঙ্গে কানের কথা বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়ে তার মুখ একেবারে বন্ধ হল। কথা কইতে না পা পেয়ে পেট ফুলে তার প্রাণ যায় আর কি।

এমন সময় একদিন রাজা নাপিতের কাছে দাড়ি কামিয়ে সোনার কৌটো খুলে কাটা কানটি নেড়ে চেড়ে দেখছেন, আর অমনি কোত্থেকে একটা কাক ফস্ করে এসে ছোঁ মেরে রাজার হাত থেকে কানটি নিয়ে উড়ে পালাল। রাজা বললেন — 'হাঁ হাঁ হাঁ ধরো। কাক কান নিয়ে গেল!' রাজা মাথা ঘুরে সেইখানে বসে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, প্রজাদের কাছে কী করে মুখ দেখাব।

এদিকে নাপিত ক্ষুর ভাঁড় ফেলে দৌড়। পড়ে-তা-মরে এমন দৌড়। শহরের লোক বলতে লাগল — নাপিত ভায়া নাপিত ভায়া হল কী? পাগলের মতো ছুটছ কেন?

নাপিত না রাম না গঙ্গা কাকের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে একেবারে অজগর বনে গিয়ে হাজির। কাকটা একটা অশ্বত্থ গাছে বসে আবার উড়ে চলল, কিন্তু নাপিত আর এক পা চলতে পারল না, সেই অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল, আর ভাবতে লাগল — 'এখন কী করি? রাজার কান কাটা ছিল, অনেক কষ্টে সে কথা চেপে রেখেছিলুম ; এখন সেই কান কাকে নিলে এ কথাও যদি আবার চাপতে হয় তাহলে আমার দফা একদম রফা! ফোলা পেট এবারে ফেঁসে যাবে, এখন করি কী?' নাপিত এই কথা ভাবছে এমন সময় গাছ বললে — 'নাপিত ভায়া ভাবছ কী?'

নাপিত বলল, — 'রাজার কথা।'

গাছ বলল — 'সে কমন?'

তখন নাপিত চারিদিকে চেয়ে চুপিচুপি বললে —

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা।।'

এই কথা বলতেই নাপিতের ফোলা পেট একেবারে কমে আগেকার মতো হয়ে গেল,

বেচারা বড়োই আরাম পেল, এক আরামের নিঃশ্বাস ফেলে মনের ফুর্তিতে রাজবাড়িতে ফিরে চলল।

নাপিত চলে গেলে বিদেশী এক ঢুলি সেই গাছের তলায় এল। এসে দেখলে গাছটা যেন আস্তে দুলছে, তার সমস্ত পাতা থরথর করে কাঁপছে, সমস্ত ডাল মড়মড় করছে — আর মাঝে মাঝে বলছে—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা।।'

ঢুলি ভাবলে এ তো বড়ো মজার গাছ! এরই কাঠ দিয়ে একটা ঢোল তৈরি করি। এই বলে একখানা কুড়ুল নিয়ে সেই গাছ কাটতে আরম্ভ করলে।

গাছ বললে — 'ঢুলি, ঢুলি আমায় কাটিসনে!'

— আর কাটিসনে! এক-দুই-তিন কোপে একটা ডাল কেটে নিয়ে ঢোল তৈরি করে— 'রাজার কান কাটা, তাই নিলে কাক ব্যাটা' বাজাতে বাজাতে ঢুলি কানকাটা শহরের দিকে চলে গেল।

এদিকে কানকাটা শহরে রাজা কান হারিয়ে মলিন মুখে বসে আছেন আর নাপিতকে বলছেন — 'নাপিত ভায়া এ কথা যেন প্রকাশ না হয়!' নাপিত বলছে — 'মহারাজ কার মাথায় দুটো কান যে এ কথা প্রকাশ করবে!' এমন সময় রাস্তায় ঢোল বেজে উঠল —

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা।।'

রাজা রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে নাপিতের চুলের মুঠি এক হাতে আর অন্য হাতে খাপ-খোলা তরোয়াল ধরে বললেন— 'তবে রে পাজি! তুই নাকি এ কথা প্রকাশ করিসনি? শোন্ দেখি ঢোলে কী বাজছে!' নাপিত শুনলে ঢোলে বাজছে—

'রাজার কানা কাটা
তাই নিলে কাক ব্যাটা।।'

নাপিত কাঁদতে কাঁদতে বললে— দোহাই মহারাজ, এ কথা আমি কাউকে বলিনি, কেবল বনের ভিতর গাছকে বলেছি। তা নইলে হুজুর পেটটা ফেটে মরে যেতুম। আর আমি মরে গেলে আপনার দাড়ি কে কামিয়ে দিত বলুন?'

রাজা বললেন— 'চল্ ব্যাটা গাছের কাছে।' বলে নাপিতকে নিয়ে রাজা মুড়িসুড়ি দিয়ে গাছের কাছে গেলেন। নাপিত বললে— 'গাছ আমি তোমায় কী বলেছি? সত্য কথা বলবে।'

গাছ বললে —

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা।।'

রাজা বললেন — 'আর কারো কাছে নাপিত বলেছে কি?'

গাছ বললে — 'না।'

রাজা বললেন — 'তবে ঢুলি জানলে কেমন করে?'

গাছ বললে — 'আমার ডাল কেটে ঢুলি ঢোল করেছে। তাই ঢোল বাজছে — 'রাজার কান কাটা।' আমি তাকে অনেকবার ডাল কাটতে বারণ করেছিলাম কিন্তু সে শোনেনি।'

রাজা বললেন — 'গাছ, এ দোষ তোমার ; আমি তোমায় কেটে উনুনে পোড়াব।'

গাছ বললে — 'মহারাজ, এমন কাজ কর না। সেই ঢুলি আমার ডাল কেটেছে, আমি তাকে শাস্তি দেব। তুমি কাল সকালে তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এস।'

রাজা বললেন — 'আমার কাটা কানের কথা প্রকাশ হল তার উপায়? প্রজারা যে আমার রাজত্ব কেড়ে নেবে।'

গাছ বলে — 'সে ভয় নেই, আমি কাল তোমার কাটা কান জোড়া দেব।' শুনে রাজা খুশি হয়ে রাজ্যে ফিরলেন।

রাজা ফিরে আসতেই রাজার রানী, রাজার মন্ত্রী, রাজার যত প্রজা রাজাকে ঘিরে বললে — 'রাজামশাই তোমার কান দেখি'। রাজা দেখালেন — এক কান কাটা। তখন কেউ বললে, — 'ছি ছি', কেউ বললে — 'হায় হায়'। কেউ বললে, — 'এমন রাজার প্রজা হব না।' তখন রাজা বললেন, 'বাছারা কাল আমার কাটা-কান জোড়া যাবে, তোমরা এখন সেই ঢুলিকে বন্দী কর। কাল সকালে তাকে নিয়ে বনে যে অশ্বত্থ গাছে তারই তলায় যেও।' রাজার কথা শুনে প্রজারা সেই ঢুলিকে বন্দী করবার জন্যে ছুটল।

তার পরদিন সকালে রাজা মন্ত্রী নাপিত, রাজ্যের প্রজা আর সেই ঢুলিকে নিয়ে ধুমধাম করে সেই অশ্বত্থতলায় হাজির হলেন। রাজা বললেন, 'অশ্বত্থ ঠাকুর ঢুলির বিচার কর।'

অশ্বত্থ ঠাকুর নাপিতকে বললেন— 'নাপিত, ঢুলির একটি কান কেটে রাজার কানে জুড়ে দাও।' নাপিত ঢুলির একটি কান কেটে রাজার কানে জুড়ে দিল। চারদিকে ঢাক-ঢোল বেজে উঠল, রাজার কান জোড়া লেগে গেল। এমন সময় যে হনুমান রাজার কান ছিঁড়েছিল সে এসে বললে— 'অশ্বত্থ ঠাকুর, বিচার কর— রাজামশায় আমার কান কেটেছে, আমার কান চাই।'

অশ্বত্থ বললে, — 'রাজা ঢুলির অন্য কান কেটে হনুকে দাও। এক কান কাটা থাকলে বেচারির বড়ো অসুবিধা হত— দেশের বাইরে দিয়ে যেতে হত। এইবার ঢুলির দু-কান কাটা হল— সে এখন দেশের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে।'

রাজা এক কোপে ঢুলির আর-এক কান কেটে হনুর কানে জুড়ে দিলেন— আবার ঢাক-ঢোল বেজে উঠল। তখন অশ্বত্থ ঠাকুর বললে, — 'ঢুলি এইবার ঢোল বাজা।' ঢুলি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে ঢোল বাজাতে লাগল— ঢোল বাজছে—

'ঢুলির কান কাটা।
ঢুলির কান কাটা।।'

রাজা ফুল-চন্দনে অশ্বত্থ ঠাকুরের পুজো দিয়ে ঘরে ফিরলেন। রানী রাজার কান দেখে বললেন— 'একটি কান কিন্তু কালো হল।'

রাজা বললেন— 'তা হোক, কাটা কানের থেকে কালো কান ভালো। নেই মামার চেয়ে কানা-মামা ভালো।'

সব্বোনাশ

আশাপূর্ণা দেবী

গাড়ির শব্দে বারান্দা থেকে পাতিহাঁসের মত গলাটা বাড়িয়ে নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে দেকে নিয়েই পিঙ্কি চীৎকারে করে উঠল 'ওমা; পাঁউরুটি মাসি!!'

আহ্লাদে পিঙ্কির চুলগুলো সোনালী আর মুখটা রূপোলী হয়ে উঠল। আর এমন দুদ্দাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল যে, নেমেই ধাক্কা নানকুর সঙ্গে! নানকুও উঠছিল কিনা হুড়মুড়িয়ে।

অন্যদিন হলে অবশ্য এই ধাক্কার ফলে খুনোখুনি হয়ে যেত, কিন্তু আজ নানকু সেদিকে গেল না, চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'পিঙ্কি সব্বোনাশ! পাঁউরুটি মাসসি!'

পাঁউরুটি মাসি ওদের প্রাণের দেবী, ছুটি ছাটাই যখনই কলকাতায় চলে আসে পাঁউরুটি মাসি, পিঙ্কি নানকু আহ্লাদের সাগরে ভাসে।

কারণ?

কারণ ফুলো ফুলো গোলগাল পাঁউরুটি মাসির গুণের যে তুলনা নেই! পাঁউরুটি মাসি গান গায় সুন্দর, কথা বলে মিষ্টি, গল্প বলে অপূর্ব! আর সর্বদাই যেন হাসি খুশির খনি।

তা ছাড়া পাঁউরুটি মাসি এলে — মা?

মা তো একেবারে অন্য মানুষ!

সারা বছরে আর কবে মা এমন আহ্লাদের পাহাড়, আর উদারতার অবতার হয়ে ওঠেন?

পাঁউরুটি মাসি থাকাকালীন অবস্থায় কত কীই না বাগিয়ে নেওয়া যায়। যা চাও — মা স্রেফ কল্পতরু! হাসবেন আর বলবেন, 'দেখছিস তো পাঁউরুটি, কি রকম চাঁদচাওয়া আবদার আমার ছেলেমেয়ের! ধরেছ যখন তোমরা ছাড়বে না জানি। এই নাও টাকা!'

অথচ অন্য সময়?

অন্য সময় রেগে গেলে বলবেন, 'চাঁদচাওয়া আবদার, ছেলেমেয়ের! টাকা যেন গাছে ফলে!'

মানে?

মানে হচ্ছে, মা অর্থাৎ পাঁউরুটি মাসির রাঙাদি, চান তাঁদের দুই মাসতুতো বোনের অনর্গল গল্পের মধ্যে কোনো ব্যাঘাত এসে না নাক গলায়! অতএব পিঙ্কি নানকু জিনিস চাইলে জিনিস, পড়ায় ছুটি চাইলে ছুটি, যা খুশি করতে চাইলে যা খুশির অনুমতি।

এই পাঁউরুটি মাসির আবির্ভাবে 'সব্বোনাশ!'

পিঙ্কির সোনালী-হয়ে-ওঠা চুল কালো হয়ে গেল, সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে

উঠল। পিঙ্কি দাঁড়িয়ে পড়ে চোখ পাকিয়ে বললো, সব্‌বোনাশ মানে কী রে দাদা?'

সববোনাশ মানে সববোনাশ! মানে আজই এক্ষুণি পটকাকাকু আসছে!

সিঁড়িতে বসে পড়ে পিঙ্কিও বলল, সববোনাশ!

পটকাকাকুও ওদের প্রাণের ঠাকুর, তার সরু লম্বা খটখটে হাড়ে হাজার ভেল্‌কি। পটকাকাকু ঘড়ি গুঁড়িয়ে আস্ত করা, নোট উড়িয়ে ঘুড়িধরা, ইত্যাদি করে একশো রকম ম্যাজিক জানে, পটকাকাকু পঞ্চাশ প্রাণীর ডাক ডাকতে পারে, আর স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন ভুবনের খবর নির্ভুল বলতে পারে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনকালেরও পারে। তাছাড়া পট্‌কা কাকু এলেই তো বাবা করুণাপারাবার, মহতের অবতার!

নিজে ডেকে ডেকে বলবেন, 'পিঙ্কি নানকু তোমরা আজ কোন দিকে বেড়াতে চেতে চাও বল। আমি গাড়ি রেখে যাচ্ছি। আচ্ছা পটকাকেই বোলো তার যেদিকে ইচ্ছে! পেট্রলের টাকা রেখে গেলাম রে পটকা, বেশ পেটঠেশে তেল ভরে নিবি।'

এই পেটঠাশার ব্যাপারের লক্ষ্যটা যে বাবার পিসতুতো ভাই পট্‌কা, পিঙ্কি নানকু উপলক্ষ্য মাত্র, তা কি আর বোঝে না ওরা? কিন্তু বুঝে ক্ষতি কি? ওদের তো হু হু করা বাতাস চোখে মুখে লাগিয়ে মাইলের পর মাইল গাড়ি চড়ার সুখটা জোটে।

আবার নিজেও পটকা কাকু কম নাকি?

পটকা কাকু মানেই সার্কাস, সিনেমা খেলাদেখা, ইত্যাদি করে রাত্তির আমোদ।

আর পটকা-কাকুর অনারে রান্নাঘরে রোজ উৎসব।

অথচ পিঙ্কি বলল, পটকা-কাকু? সব্‌বোনাশ!

মানে কি?

মানে তা'হলে খুলেই বলতে হয়। মানে হচ্ছে পাঁউরুটি মাসি যেমন মার প্রাণের পুতুল, পটকা কাকু তেমনি বাবার প্রাণের মাণিক! কাজেই পাঁউরুটি মাসি এলে মার মনে হয় তেমন যত্ন হচ্ছে না, বাবা মোটেই আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। আর পটকা কাকু এলেই বাবার মনে হয় তেমন যত্ন হচ্ছে না, মা মোটেই আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

অতএব?

অতএব ওঁদের কেউ একজন এলেই বাবাতে আর মা-তে রোজ ধুন্ধুমার বাধে।

পাঁউরুটি মাসি এক মাস থাকলে বাবা যদি উনত্রিশ দিন গাড়ি দান করেও একটা দিন বিশেষ কাজে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান, মা আক্ষেপ করে বলেন, এবারে আর পাঁউরুটিকে নিয়ে বেড়ানোই হল না! অথচ কত জায়গায় নিয়ে যাব ভেবেছিলাম —

আর পটকা কাকু দু'মাস থাকলে মা যদি উনষাট দিন ভোজপর্ব চালিয়ে একটা দিনও শুধু সাধাসিধে ডাল ভাত রাঁধেন, বাবা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, এবার আর পটকাকে তেমন জুৎ করে খাওয়ান হল না। অথচ পটকা খেতেটেতে ভালবাসে—

কথাটা অবিশ্যি সত্যি।

পিঙ্কি নানকু জানে সে কথা। বরং তারা অবাক হয়ে গবেষণা করে— পটকা কাকুর ওই সরু লম্বা দেহটার মধ্যে এত খাবার-দাবার ঢোকে কোথায়, আশ্রয় নেয় কোথায়! কুড়িটা লুচি, বারোটা ফ্রাই, যোলটা চপ্, এক সের মাংস, গোটা আষ্টেক রাজভোগ, বড় একবাটি পায়েস এক সঙ্গে পেটের মধ্যে চালান করে দিয়েও, পটকা কাকু যখন দাঁড়িয়ে ওঠে, দেখতে পাওয়া যাবে যেখানকার পেট সেখানে!

সেই পেটে পিঠে এক, হাড় আর চামড়া।

এত মাল যায় কোথায়?

ভেবেছে ওরা অনেক দিন। সারা গায়ে ছড়িয়ে গেলেও তো গায়ে একটু মাংস লাগবে?

পিঙ্কির বাবাও সেই কথাই বলেন, যত্নআত্তি পেলে তো গায়ে একটু মাংস লাগতো! বারো মাস মেসে পড়ে থাকে যত্ন পায় না! নিজের বোনটি যখন আসে, তখন তো বেশ তিনদিনেই পাঁউরুটিকে ফুলিয়ে তুলোর গাঁট করে তুলতে পারে।

ব্যস!

বুঝতেই পারছো?

আর মার রাগ হবারই কথা। পাঁউরুটি মাসি কোনোদিন তিনটের বেশি লুচি খেতে পারেন নি, আধখানা ছাড়া একখানা চপ্ খায় না, আর মিষ্টি? সে তো দেখলেই চোখ বোজে!

তবে বাবা বিশ্বাস করেন না। বাবা বলেন, হুঁ। হলেই হল! তা'হলে বলতে হবে গ্যাসবেলুনের মত বাতাস পাম্প করা হয় ওকে!

কাজেই — নারদ! নারদ!

কিন্তু সে তো এক একজনের জন্যে।

এক সঙ্গে দু'জন হলে কী হবে, বা হতে পারে, অথবা হওয়া সম্ভব, তা আন্দাজ করতে না পেরে ওরা দুজনেই বলে, সব্বোনাশ!

তারপর অবশ্য ছুটে বাইরে বেরিয়ে যায় দুজনেই কারণ আর একটা গাড়ির শব্দ হয়ে গেছে ততক্ষণে।

বাবা চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ি ঢোকেন, এই শুনছো, পটকু এসেছে! ইস, কতদিন পরে যে এলি পটকু!

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন 'ও মা পাঁউরুটি তুই? ওরে বাবারে কী মজারে! উঃ কত দিন যে দেখিনি তোকে পাঁউরুটি!'

পাঁউরুটি মাসি আর পটকাকাবু দু'জনেই একসঙ্গে মাকে আর বাবাবে প্রণাম করেন, কিন্তু ততক্ষণে তো সুরু হয়ে গেছে ধুন্ধুমার!

পাঁউরুটির দিকে তুমি তাকালে না যে বড়?

মা বললেন রেগে রেগে।

বাবাও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, তুমিও পটকার দিকে তাকাওনি!

ও বেচারী বারোমাস হোস্টেলে পড়ে থাকে। এতদিন পরে দিদির কাছে এল, ওর দিকে আগে তাকাব না?

সারাক্ষণ তো তুমি এখন ভাইকে নিয়েই মত্ত থাকবে, আমার বোনটার যত্ন হচ্ছে কিনা, বেড়াতে পাচ্ছে কিনা, সিনেমা দেখল কিনা, এসব খোঁজই করবে না!

তুমিও সারাক্ষণ বোন নিয়ে মত্ত থাকবে, আমার ভাইটা খেতে পেল কিনা, শুতে পেল কিনা, তার জামা কাপড় শুকোলো কিনা খোঁজই করবে না!

তা মত্ত থাকবো না? জানো পাঁউরুটি আমার থেকে দশ বছরের ছোট ছোট্টবোনটি!

তা মত্ত থাকবার রাইট আমারও আছে, পটকাও আমার থেকে বারো বছরের ছোট ছোট্ট ভাইটি!

আহা! আহা! কত যে আদরের ও আমার!

দু'জনেই নিশ্বাস ফেললেন।

সেই অবসরে পটকা কাকু বলে উঠলো, সুটকেশটা কোথায় রাখবো বৌদি?

আর পাঁউরুটি মাসি বলে উঠল, ট্যাক্সিড্রাইভার কত নিল জামাইবাবু?

পিঙ্কিদের মা এবার যাট্ যাট করে ছুটে এলেন, 'ওমা তুমি নিজে সুটকেশটা বইছে, পটকা ঠাকুরপো! ছি ছি, রাখো রাখো ওইখানেই রাখো।'

নানকুদের বাবা বলে উঠলেন, আহা আহা তোকে আর ট্যাক্সিভাড়া নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না পাউঁরুটি, থাম! চুপ কর!

তখনকার মত অবশ্য কিঞ্চিত সন্ধি হল। কারণ মা ওদের জন্যে চা জলখাবার আনতে গেলেন, আর বাবা ওদের জন্যে চাকরকে বকাবকি করতে গেলেন।

কিন্তু সে আর কতটুকু?

সন্ধি তো এক্ষুণি বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, জানা কথা!

নানকু আর পিঙ্কির দিকে এতক্ষণে তাকালো পাঁউরুটি মাসি! হেসে ফেলে বললো, জামাইবাবু কী ঝগড়াটে!

পটকাকাকুও এতক্ষণ পরে তাকালো ওদের দিকে হেসে বললো, বৌদি কী রাগী!

তারপর নিজেরা তাকিয়ে বললো, আমাদের নিয়ে তাহলে এখন নারদ নারদ চলবে কি বল?

তা চললোই।

উঠতে বসতে খেতে বেড়াতে বাবা বলছেন, পটকার কথা তুমি ভাবছই না! আর মা বলছেন, পাঁউরুটির কথা তুমি মনের কোণেও আনছো না!

বাবা যদি গাড়ি রেখে যান, মা বলেন নির্ঘাৎ ভাইয়ের জন্যে রেখে গেছেন, তোমাদের

আর চড়ে কাজ নেই পাঁউরুটি!

যদি গাড়ি নিয়ে যান, মা বলে বেড়ান, নির্ঘাৎ পাঁউরুটির জন্যে! পাছে আমি ওকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাই!

মা যেদিন রান্না ঘরে ভাল ভাল সব আইটেম করেন, বাবা তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে বলেন, বুঝতে পেরেছি নিজের বোনের জন্যে! তা নইলে এত ভাল-মন্দের ব্যবস্থা!

যেদিন একটু ঝাড়া ঝাপটা রাঁধেন, বাবা ঘাড় নেড়ে বলেন, বুঝতে বাকি নেই, আমার ভাইয়ের জন্যে! পাছে সে একটু খায় দায়—

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনে ক্ষমা চেয়ে নেন পটকা ঠাকুরপো, তুমি কিছু মনে কোরনা ভাই, তোমার দাদার একচোখেমি দোষেই মন্দ হচ্ছি আমি!

পাঁউরুটি ভাই তুই কিছু মনে করিস না, তোর দিদির একচোখোমির দোষেই অভদ্র হতে হচ্ছে আমায়।

ব্যস্ আবার লেগে গেল তুলোরাম খেলারাম!

কিন্তু এদিকে পিঙ্কি আর নানাকুর এবারের পুজোর ছুটিটাই ওবলেট! ওরা না পাচ্ছে পটকাকাকুর কাছে পড়ে থাকতে, না পাচ্ছে পাঁউরুটি মাসির কাছেই বসে থাকতে।

পাঁউরুটি মাসির স্কুলের ছাত্রীরা যে কী বেদম রামবোকা, এ গল্পতো কোনোই হল না। এবার আর পটকাকাবুর কলেজের ছাত্ররা যে কি সাংঘাতিক বিচ্ছু চালাক, সে গল্পও কোনোই হল না। এবার আর পটকাকাবুর কলেজের ছাত্ররা যে কি সাংঘাতিক বিচ্ছু চালাক, সে গল্পও থলে চাপা।

এদিকে পাঁউরুটি মাসি ডেকে ডেকে বলে, এবার আর তোরা গল্প শুনতে আসিস না কেন রে পিঙ্কি নানকু? কাকা এসেছে বলে বুঝি সাপের পা দেখেছিস? মাসিকে আর চিনতেই পারছিস না?

অতএব এসে এসে পড়তে হয় ওদের। পটকা কাকুর যে নতুন ম্যাজিক দেখাবে বলেছিল, যাওয়া হয় না সেদিকে।

ওদিকে পটকাকাকু ডেকে ডেকে বলে এবার বুঝি মাসিকে পেয়ে দিনে তারা দেখেছিস তোরা? কাকুকে আর চিনতেই পাচ্ছিস না!

কাজে কাজেই এসে বসে পড়তে হয় ওদের।

অথচ ম্যাজিকে মন বসে না। ওদিকে ভূতের গল্প পড়ে আছে। কাজেই কেবলই মনে হয় কী যেন হারাচ্ছি, কী যেন হারাচ্ছি!

পাঁউরুটি মাসি বলে তোমার ছেলে মেয়ে এবার বদলে গেছে রাঙাদি! সে জেল্লা নেই, সে হাসি নেই।

পটকাকাকুর বলে তোমার ছেলে মেয়ে এবার বদলে গেছে নতুনদা, সে উৎসাহ নেই, সে স্ফূর্তি নেই।

পিঙ্কি আর নানকু মনের দুঃখে মনে মনে বলে, তোমরাই করেছ এটি। তোমরাই ঘুচিয়েছ আমাদের জেল্লা, হাস, স্ফূর্তি, উৎসাহ! না বলে কয়ে একই ছুটিতে দু'জন এসে ইহকাল পরকাল খেয়েছ আমাদের!

এর একটা প্রতিকার করতে হবে। বলল পিঙ্কি।

নানকু হতাশ গলায় বলল, এবারে আর উপায় কোথা? ছুটিতো শেষ হয়ে এল! দু'জনকেই এবার মা সত্যপীরের দিব্যি দিয়ে পায়ে ধরতে হবে, যেন আর কিবনে নোটিশে দু'জনে একদিনে এসে হাজির না হয়!

পিঙ্কি আরো হতাশ গলায় বলে, সে তো পরে! এবারে আর তাহলে কোনো আশাই নেই?

না!

বেশ চল্, তবে বলিগে। পটকাকাকু যদি পুজোর ছুটিতে, তো পাঁউরুটি মাসি গরমের ছুটিতে আর পাঁউরুটির মাসি যদি পুজোর ছুটিতে তো পটকাকাকু গরমের ছুটিতে! তিনসত্যি করিয়ে নিইগে।

হঠাৎ চমকে ওঠে নানকু, তা'হলে তো এটাও করা যেত যে পিঙ্কি, দুপুরে যদি পাঁউরুটি মাসির গল্প, তো সন্ধ্যের পটকাকুর, আর পটকাকুর যদি—

আহা ভারী তো বললি, পিঙ্কি ঝামরে ওঠে দুজনকেই যে আমাদের সকাল সন্ধ্যে দুপুর সর্বদা পেতে ইচ্ছে করে!

তা হলে?

তা হলে একটা কাজ করলে হয়—

কি হয় তা আর শোনা হল না নানকুর।

শুনতে পেল শুরু হয়ে গেছে ওদিকনে নারদ নারদ।

মা বলছেন, তুমিই বল পটকা ঠাকুরপো, তোমাকে আমি অগ্রাহ্য করছি? অবহেলা করছি? খুব সুবিধে দেখছি না?

বাবা বলছেন, তুইই একবার বল পাঁউরুটি, আমি তোকে অগ্রাহ্য করি, অবহেলা করি? কষ্ট অকষ্ট দেখিনা।

কে কি বলত কে জানে, মা বলে উঠলেন, আগে পটকা ঠাকুরপো বলবে!

বাবা বলে উঠলেন, আগে পাঁউরুটি বলবে!

না, আগে পটকা ঠাকুরপো —

না, আগে ঠাকুরপো —

কক্ষণো না! আগে ঠাকুরপো —

আলবাৎ না, আগে পাঁউরুটি —

আগে পট —

আগে পাঁউ —

ভাল হবে না বাপু —

ভাল হবে না বলছি —

হঠাৎ পাঁউরুটি মাসি আর পটকা কাকু দুঁজনেই ওঁদের বাঙাদি আর নতুনদা, বৌদি আর জামাই বাবুর গলার ওপরে গলা চড়িয়ে উদাত্ত স্বরে বলে ওঠেন, নতুনদা তোমাদের এই ঝগড়া কস্মিনকালেও থামবে বলে মনে হয় না। তার কারণ ঝগড়াতেই তোমাদের আহ্লাদ, ঝগড়াতেই তোমাদের ক্ষিদে বৃদ্ধি। কিন্তু যেহেতু আমরা দু'জনেই এই ঝগড়ার উপলক্ষ্য তখন তোমরা যতই আমাদের লজ্জিত হতে বারণ করো, হবোই লজ্জিত! হচ্ছিও। অতএব—

পাঁউরুটি মাসির মিহি গলা আর এককাঠি চড়লো, অতএব আমরাই এটা মিটিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করবো ঠিক করেছি। আর বেশি দেরীও করবো না। সামনের এই পূর্ণিমাতেই —

পিঙ্কি চুপিচুপি বলে, পূর্ণিমার দিন ঝগড়া থামলে, আর কখনো বুঝি ঝগড়া হয় না দাদা?

নিশ্চয়ই! তাও জানিসনে বোকা? নানকু ও চুপিচুপি বলে, পূর্ণিমা মানে তো পুরোপুরি? তার মানেই পুরোপুরি মিটে যাবে!

কিন্তু পিঙ্কির বাবাও পিঙ্কির মতই বোকাটে গলায় বলে ওঠেন ঝগড়া থামানোর জন্যে আবার দিনস্থির করতে হয়? তা তো জানিনা। পূর্ণিমার দিন বুঝি —

হ্যাঁ শুভদিন — পটকা কাকু লজ্জা লজ্জা গলায় বলে ওঠে, ওই দিনটাই আমরা বিয়ের জন্যে ঠিক করেছি!

মা চেঁচিয়ে ওঠেন, বিয়ের ঠিক করেছ? কার বিয়ের দিন ঠিক করেছ?

পাঁউরুটি মাসি আঁচলটা টেনে মুখ ঢাকে, আর পটকা কাকু রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলে, এই আমার আর পাঁউরুটির?

অ্যাঁ।

অ্যাঁ।

সত্যি।

সত্যি।

কি আর করা। এ ছাড়া তো তোমাদের ঝগড়া থামাবার উপায় দেখছি না —

মা পটকা কাকুকে কথা শেষ করতে দেন না, বিষম উল্লাসে বলে ওঠেন, আমার বোনের বিয়েতে বেশি ঘটা করতে হবে তা বলে দিচ্ছি?

বাবা প্রবল প্রতাপে বলে ওঠেন আমার ভাইয়ের বিয়েতে এক ইঞ্চি কম হবে না তা বলে দিচ্ছি!

তোমার শাসন চলবে না —

তোমার আবদার কমাতে হবে —

সব মার্কেটিং আমি করবো —

তার মানে নিজের বোনের কোলে ঝোল টানবে —

ওরা আর শোনে না!

ওরা কে ঘরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে।

একই দুঃখে দুঃখী দুই ভাইবোন!

নানকু একসময় নিশ্বাস ফেলে বলে, ও সব পূর্ণিমা ফূর্ণিমা বাজে! প্রেম চিরকাল চলবে! ...... তার মানে প্রতিকারের কোনো আশা নেই। তার মানে এরপর থেকে সব ছুটিই গুব্‌লেট! যখনি আসবে, দুজনে একই সঙ্গে আস্‌বে।.....

দাদা!

পিঙ্কি ডুকরে উঠে বলে, তা হলে কী হবে?

হবে আবার কী! কিচ্ছু হবে না। সব্‌বোনাশের পর নতুন আর কিছু হয় নাকি।

গোষ্ঠমাসী ও কেটলিসাহেব

আশা দেবী

আমরা, শিকারীর বংশ বুঝলি কেষ্টা! — কম্বলমামা কেষ্টার দিকে সগৌরবে তাকিয়ে বললেন। স্বীকার করতেই হলো কেষ্টাকে ঃ তা তো বটেই।

বটেই মানে? — কম্বলমামা খেঁকিয়ে উঠলেন, অবিশ্বাস — আমার কথায় অবিশ্বাস? রে—রে দুরাচার, কুলের আচার, তবে এশোন — তোর মত তালিপত্র সৈনিক অর্থাৎ শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে তালপাতার সেপাই — সেম আমার কথার মর্ম বুঝবে কি? বুঝতো যদি চকা সমাদ্দার থাকতো ; তা হলে তোকে এক কথায় সমঝিয়ে দিতো বীরত্ব কাকে বলে। আমার পিসতুতো কাকী এক লাফে এক উড়ন্ত কাক ধরে তার নাকে কৌটোর খাপ পরিয়ে দিয়েছিলেন। আমার কাকা বাড়ীর ঘুমন্ত কুকুরকে মারবার জন্য তিনটে গুলি ছুঁড়েছিলেন, শেষে বাঁশ দিয়ে সেটাকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। আর আমার শ্যামনগরের পিসীমা? — বলবো কি কেষ্টা, ঝাঁটা দিয়ে পিসী একটা খ্যাঁকশেয়ালী ঘায়েল করলেন। এখন তুই চিন্তা কর আমাদের কথা — তোকে আধ ঘন্টা সময় দিলাম।

কম্বলমামা হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে রইলেন।

শিকারে খুব সাহস দরকার। — খুব গম্ভীরভাবে বললে কেষ্টা।

সাহসের কথা যদি বলিস কেষ্টা, তবে শুনে নে আমার মেজ মাসী গোষ্ঠমোহিনীর কথা। কথায় বলে — যার দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটেব জল খায়। গোষ্ঠমাসী তাই করাতেন। তিনি থাকতেন চুটিয়াপাড়ার গভীর জঙ্গলে।

চুটিয়াপাড়া? সেটা আবার কোথা? আফ্রিকায় বুঝি?

কোথায় তা দিয়ে তোর দরকার কী? গল্পটা হচ্ছে সাহসের, তার মধ্যে কেবল ঘ্যান্-ঘ্যান করছে — কোথায়? কোথায় আবার, — তোর মাথায়!

কেষ্টা নিজের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে ঃ বলো — বলো, আর জিজ্ঞাসা করবো না।

সেখানে ছিল গভীর জঙ্গল। অসংখ্য বুনো জন্তু— এই ধর বাঘ, সিংহ, হাতী ঘোড়া, উট সব—

অত জঙ্গলে মিছিমিছি উনি কষ্ট করে যেতে গেলেন কেন? — কেষ্টা আবার জিজ্ঞাসা করলো।

গেছে তো গেছে, বেশ করেছে। তোর তাতে কি রে? — কম্বলমামা বেশ চটে উঠলেন, গেছে আমার মাসী গেছে — তোর মাসী তো যায় নি।

সত্যিই কেষ্টার মাসী কোথাও যান নি। এমন কি গঙ্গা নাইতে কাশীতেও না! শুধু একবার গোবর আনতে আমবাগানের মাঠে গিয়ে সেই যে একটা গুতোনো গরুর ভয়ে পালিয়ে এসেছেন সেই থেকে গোবরের পবিত্র কাজ ঘুঁটেতেই সারেন ; কাজেই তাঁর

সাহসের কথা কেষ্টার আপাততঃ কিছুই মনে না পড়াতে সে চুপ করে গেল।

আমার গোষ্ঠমাসীকে একবার শুঁটকো সাহেব বলেছিলেন খুশী হয়ে — গোস্‌ট আন্‌টি, তোমাকেই প্রকৃতপক্ষে বীরাঙ্গনা বলা উচিত। আমি যখন আবার চুটিয়াপাড়ায় আসবো তখন তোমাকে আমার চাই-ই। তোমার সঙ্গে আমি শিকারে যাবো।

মাসীও স্বীকার করেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা।

একদিন দুপুরবেলা মাসী লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে ছারপোকা মারছেন, দরজায় সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল — গোস্‌ট আন্‌টি — আমি কেটলী সাহেব।

ওমা, এস বাবা এস। — মাসী স্বাগত জানালেন।

আন্‌টি, তৈরী হয়ে নাও। আমরা ওই বনে শিকারে যাবো, তাঁবু ফেলেছি।

গোষ্ঠমাসী হাতের লাঠি খাটিয়ার ওপর রেখে খানিকটা গালে হাত দিয়ে ভাবলেন। তারপর বললেন — তা ভালোই। এলিনর রুজভেল্ট ছিলেন কতবড় শিকারী — আমিই বা কম কিসের? বেশ, যাবো।

সাহেব বিকেলবেলা মাসীর উঠোনে এসে চমকে গেলেন। এ কি রণসজ্জা?

পায়ে সুপুরীর ডোঙার চটি — সে আবার খুব শক্ত করে নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা; পরণে গেরুয়া ধুতি, গায়ে নামাবলী। টিকিতে একটা জবাফুল বাঁধা আর হাত একগাছা মুড়ো ঝাঁটা। বাঁ হাতখানা কোমরে রেখে মাসী তিলের নাড়ুর মত দুর্ভেদ্য মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে প্রথম দেখেই কেটলী সাহবে আমড়ার আঁটির মত ছটকে গেলেন। কিন্তু বলতে হবে সাহেব — ওদের গোঁ-ই আলাদা। তখনি বেশ একটি ভিরমি হাসিমুখে সামলে নিয়ে কুলের আচারের মত মিষ্টি মুখ করে বললেন — বাঃ গোস্‌ট আন্‌টিকে তো বেশ লাগছে। — শুঁটকো সাহেব চি-চি খক-খক হুয়া-হুয়া করে হেসে উঠলেন।

গোষ্ঠমাসী চিড়েভাজার মোয়ার মত আরো কঠিন হয়ে গিয়ে বললেন — আর হিঁ হিঁ করতে হবে না চিংড়ী অবতার, এখন চল তো দেখি।

গভীর বন। শাল, তাল-তমাল, পিয়াল এসব ভালো ভালো কবিদের ভালো লাগবার মত গাছের সঙ্গে সঙ্গে পিণ্ডিখেজুরের মত লেপটে রয়েছে জিকে, আম, জাম, কাঁঠাল, বিছুটি ইত্যাদি। অরণ্যের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ — পাশে পাশে গিরিমালা।

পাহাড়ও বুঝি ছিল সেখানে — কেষ্টা বিস্ময় প্রকাশ করে।

ছিল বৈ কি! গিরি ছিল, গিরিমালা ছিল, রুদ্রাক্ষের মালার মত জড়িয়ে ; তার মধ্যে ছিল প্রস্রবণ —

উঃ রে—বাবাঃ—

বাবা কিরে! এরপর যখন গল্প আরম্ভ হবে তখন বলিব 'ঠাকুরদাদা'! গোষ্ঠমাসী তো চলেছে। পিঠে একটা প্রকাণ্ড বস্তা।

ওটা কী গোস্‌ট আন্‌টি — এটা আবার কোথা থেকে জোটালে? — সাহেব বললে।

চুপ কর তো বাছা! সব কথা কী তোমার ওই বাদুড়-চোষা শুঁটকো মগজে ঢোকে? শুধু দেখ কী করে গণ্ডার শিকার করতে হয়। দেখে তাজ্জব হবি। তোর ও কচুগাছের মত

বন্দুকের কাজ নয়, এ বুদ্ধির দরকার! — বলেই গোষ্ঠমাসী টিকিসুদ্ধ জবাফুলটাকে পটাস্ করে দুলিয়ে দিলেন আর ওটা সশব্দে কপালে এসে লাগলো। সাহেপ উচ্চিংড়ের মত লাফিয়ে সরে গেলেন।

সন্ধ্যেবেলায় ওরা ক্যাম্পে এসে খানিকটা বিশ্রাম করে নিলো। চারদিকে নিবিড় অন্ধকার কালো কালো হয়ে রয়েছে, টিপ্-টিপ্ করে জোনাকী জ্বলছে, — ঝিঁঝিঁটা একটানা ঝন্‌ঝানি বাজিয়ে অরণ্য-সঙ্গীত গাইছে।

গোষ্ঠমাসী ক্যাম্পের খাটিয়ার ওপর বসে বললেন— কি রে ছারপোকা-টোকা নেই তো?

না মাসী, নুতন খাট দেখছো না! — সাহেব বললেন।

তবে একটু গড়িয়ে নিই। আজ আবার একাদশী কি না! — বলেই ট্যাক থেকে প্রকাণ্ড তামাকপাতা-পোড়ার গুঁড়ো দাঁতে ঘসে বস্তাটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

শিকারে যাবে না মাসী? — শুঁটকো সাহেব চিঁ চিঁ করে বললেন।

তোরাই আজ যা ; পরে তো আমি যাবোই। — মাসীর আদেশ শোনা গেল।

কিন্তু সাহেব জেদ ধরেছে — যাবেই যাবে এই রাতেই যাবে যুদ্ধে। সাহেবদের এইসা গোঁ কী বলবো! অনেক করে বুঝিয়েও কিছু করা যায় না। শেষে দুটো কুলি, এক ফ্লাস্ক চা, খানিকটা বিস্কুট — এসব নিয়ে তামাটে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে সাহেব বনে রওনা হলেন।

খানিকটা দূর এগোতেই একটা মস্ত কোলাব্যাঙ তার ছেলেপুলেদের নিয়ে জলার ধারে বসে জোনাকীর প্রদীপ জ্বেলে কচ্ছপের টেবিলের ওপর বই রেখে পিঁপড়ে আর পিঁপড়ীর গল্প পড়ে শোনাচ্ছিল। শুঁটকো সাহেপ পাশ দিয়ে যেতে সে চোখের চশমা নাকে চড়িয়ে বললে — ওটা আবার কে যায়। — সাপ- টাপ তো নয়? — আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙের তিন ছেলে ছড়া কেটে বললে —

শুঁটকী চামচুটকি সিঙ্গী মাছের ঝোল
শুঁটকীর টিকি ধরে তোল।

ভারি বেয়াদব ছেলেদের একটা ধমক দিয়ে ব্যাঙ বললে — এই রাতে চলছে শিকার করতে! ছোঃ—

সাহেব বললেন — কী বলে রে ওরা?

ও সব বাজে কথায় কান দেবেন না সার, চলুন।

বনবেড়ালের দল, হায়েনা, ইঁদুর ছুটে পালালো। ওদের দেখে কিন্তু সাহেব কিছুতেই ভয় পেলেন না, বন্দুকটাকে শক্ত করে ধরে হেঁটে চললেন।

দুটো জলা পেরিয়ে ওরা একটা বড় গাছের ওপর চড়ে বসলো। এখানেই জন্তু-জানোয়ারের প্রধান আড্ডা কিনা, তাই।

একটা কিছু ঘটবে বা ঘটতে যাচ্ছে ভেবে কেষ্টার চোখের তারা দুটো রাজভোগের মত আকার নিলো, বললে ঃ তারপর?

তারপর সব জন্তুদের মিটিং বসবে। একটা খেঁকশেয়াল হোয়া হোয়া করে তা প্রচার করে দিয়ে গেল। সভা বসবে, তাই ছোট ছোট বাচ্চার দল ভিড় করেছে — খরগোসরা ছুটোছুটি করছে। দূরে জলার পাড়ে হরিণরা লক্ষ্য করছে ব্যাপারটা কী ঘটতে যাচ্ছে।

মাইক বসেছে। কচুফুলের মালা গেঁথেছে হনুমানের দল। সভাপতি সিংহ আর উদ্যোক্তা জিরাফ। সবাই এসেছে। হাতী, বাঘ, সিংহ, হায়েনা — কেউ বাদ নেই। হায়েনারা ফচ্‌কের মত হি-হি করছে এমন সময় সভাপতি বললেন — একটা বেশ গন্ধ পাচ্ছি — বেশ চপ-কাটলেটের মত।

সাহেবের তো মুখ শুকিয়ে গেছে! গলা দিয়ে হেঁচকি উঠছে — হিক -হিক-হিক!

গুপ্তচর — গুপ্তচর! জিরাফ অমনি তার আঁকশির মত গলাটা গাছের দিকে প্রসারিত করতে লাগলো।

সাহেব যতই ওপরে ওঠেন — জিরাফ ততই গলা লম্বা করে। সভার মধ্যে হাসির বন্যা বলে গেল — হি, হি — হে, হে — হেউ — হেউ। হায়েনারা এ ওর গায়ে চিমটি কেটে হাসতে লাগলো। সে কি হাসি!

শেষে আর উপায় নেই দেখে সাহেব বললেন — আমার কুলিরা পালিয়েছে, আমায় মেরো না। আমার বন্দুক পড়ে গেছে — পোটলা-পুটলী হারিয়ে গেছে —

বাজে বকিস নি — বলেই সিংহমশাই একটা হুঙ্কার দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ভালুকের দলের সে কি উৎসাহ! তারা শালুক খায় আর বলে — টেনে নামা — টেনে নামা।

জিরাফ আঁকশির মত গলায় দিয়ে পাকা আমটির মত কেটলী সাহেবকে পেড়ে ফেললে।

তারপর — তারপর? — কেষ্টা বললে।

তারপর আর কী একেবারে হুম্বা হুম্বা নাচ শুরু হয়ে গেল চারদিকে।

সকালে আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই সেই কুলি দুটো লাফিয়ে উঠলো এঁদো পুকুর থেকে। তারপর নাক-কান থেকে ব্যাঙাচিগুলো ঝেড়ে ফেলে ছুটে খবর দিলো — নিদারুণ সংবাদ, যুদ্ধে কেটলী সাহেব বন্দী।

শুনে গোষ্ঠমাসির টিকি রাগে অপমানে তরমুজের বোঁটার মত খাড়া হয়ে উঠলো। তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন — হরি — হরি! এসব শুকনো লঙ্কা নিয়ে গণ্ডার শিকারে আসা? ছি—ধিক্ ওর জীবনে। ওরা ওকে শুক্‌তনী বানিয়ে খাক—আমি কিছু বলবো না।

কিন্তু কুলি দুটো কেঁদে পড়ালা — মাইজী—

তোমার গোষ্ঠমাসী তবে কি শিকারী? — কেষ্টা বললে।

আরে তাই তো বলছি — শোন না। মাসী সন্ধ্যের আগেই সবাইকে ঠিক করে নিলেন। তারপর নিজে সেজেগুজে তৈরী হয়ে চললেন বনের ভেতরে। পেছনে চলেছে মুটের মাথায় সেই বস্তা — আর মাসীর পায়ে সেই সুপুরীর খোলার চটি নারকোল দড়ি দিয়ে বাঁধা। পরণে গেরুয়া ধুতি আর নামাবলী আর হাতে বন্দুকের মত করে ধরা ঝাঁটা।

বনের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতেই অন্ধকার হয়ে এলো। কিন্তু একটু সাড়া-শব্দ নেই। মাসী

বললেন — ওরা এখন বসেছে কেটলী সাহেবকে সায়েস্তা করতে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল।

বনের ভেতর আবার সেই জায়গা। মাসী একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে শুনলেন।

সভা বসেছে। ঢোঁড়া সাপের দড়ি দিয়ে উটের সঙ্গে সাহেবকে শক্ত করে বেঁধেছে আর মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে — তোরা আমাদের চিড়িয়াখানায় বন্ধ করে রাখিস কেন? তোদের আমরা কী করেছি?

কেটলী সাহেব যেন কী বলতে গেলেন, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না।

ডোরা বাঘের দিকে আঙুল দেখিয়ে সিংহ বললে — ওকে তিন মাস আগে খাঁচায় বন্ধ করে কলা দেখিয়েছিস আর ছোলা ভিজে খেতে দিয়েছিস?

আমি না স্যর— ওটা বিল্টুর কাকা।

হোক বিল্টুর কাকা — তাকে তো আর পাওয়া যাচ্ছে না!

এর মধ্যে গোষ্ঠমাসীর ইসারায় কী যেন কাজ চলছে নিঃশব্দে। কেউ জানতে পারছেন না কিন্তু। ধীরে ধীরে ওরা কি যেন করছে।

তোরা এই নিরীহ ছেলেমানুষ বাঁদরগুলোকে ফ্রক পরিয়ে ফুলনণি আর গোপালবাবু সাজিয়ে দরজায় দরজায় নাচাস। আর তোদের বকাটে ছেলেগুলো ছড়া কাটে — বাঁদর, কলা খাবি? আজ আমরা তোদের সমস্ত দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নেবো। আমরা তোকে তেঁতুলগোলা, কাঁচা লঙ্কা, নুন আর লেবুর রস দিয়ে ছোলা ভিজার সঙ্গে মিশিয়ে খাবো। দেখি তোকে কে বাঁচায়? — বললে সিংহ।

বলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বনের ভেতরে আগুন জ্বলে উঠলো শুকনো পাতায় আর সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাঁচ— ফ্যাঁচ — ফ্যাঁচ্‌চো — আওয়াজে সমস্ত বনভূমি কম্পিত হয়ে উঠলো। সবাই যে যার প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। সজারু এতক্ষণ এক কোণায় বসে গায়ের কাঁটা দিয়ে ছেলের গায়ের সোয়েটার বুনছিল, সে হঠাৎ দু'হাত দিয়ে খুচ-খুচ করে নাক ঘসে হাঁচলো— হ্যাঁচ্‌চো-হ্যাঁচ্‌চো—

গোষ্ঠমাসী বস্তা ভরে তামাকপাতা এনেছিলেন, সমস্ত বনে তাই ছড়িয়ে তাতে আগুন দিয়েছেন — আর রক্ষে আছে?

কেটলী সাহেব চারদিকে তাকিয়ে দেখলে সে মুক্ত, সবাই পালাচ্ছে যে যার মত। আর দূরে একটা পাথরের ওপর হিটলারের মত গোঁফহীন গোষ্ঠমাসী বসে বসে মালা জপ করছেন। আর কুলির দল আনন্দে নাড়ুগোপালের মত গদ-গদ হয়ে বসে বসে গান ধরেছে— মৌসীকী হিম্মত দেখো—

কেটলী সাহেব পড়ি কি মরি মাসীর কাছে ছুটে এসে প্রণাম করে বললেন — ধন্যি মেয়ে তুমি মাসী। তোমায় গড় করি।

হরি — হরি! — মাসী কপালে হরিনামের ঝোলা ঠেকালেন। সেই শুনে কুলিরা ছুটে এসে গোষ্ঠমাসীকে ঘিরে নাচতে লাগলে — হরিবোল — হরিবোল —

সাহেব বললেন — হরিবল্ — গোস্ট্ আন্‌টি — হিপ্ — হিপ্ — হুররে!

বিলি ব্যবস্থা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন আষাঢ় মাসে রথযাত্রার পরেই— এখন তো আর সে সাবেক শিবদুর্গা নাই, এখন সকলেই সভ্য ভব্য হ'য়েছেন— চুলোর মুখে, সন্ধ্যাবেলা সপরিবারে বসিয়া খোশগল্প হইতেছে। চুলোর মুখে বসা, সভ্যতার একটা বাঁধা ব্যবস্থা ; বিলেতে সবাই বসে। শিব, বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণ চরিত্র" পড়িতেছেন, মধ্যে মধ্যে বুদ্ধির বলিহারি দিতেছেন, ক্ষণে বা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেছেন। দুর্গা শিবের একপাটি ছেঁড়া মোজার মুড়ি সেলাই করিতেছেন। "গুরুমা" হার্ম্মোনিয়মে সুর দিয়ে কাশ্মীরি খেমটা তালে তালে 'মনে করো শেষে রো সে দিনো ভয়ঙ্কর" ধরিয়াছেন। গণেশ একপাশে জয়ার গালের কাছে শুঁড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুস ফুস করিয়া কি বল্‌তেছেন, আর জয়া মুখে রুমাল দিয়ে হাস্‌চে। কার্ত্তিক যেন বিজয়ার সঙ্গে একটু বেলেল্লাগিরি করিতেছেন বলিয়াই বোধ হয়। ফলে মজলিশ পুরা। সভ্য, নির্দ্দোষ, গার্হস্থ্য আমোদ যেমন হইতে পারে, তাহাই হইতেছে।

এমন সময় দুর্গা হঠাৎ মুখ তুলে ডাকলেন — 'নন্দী?"

দরজার বাহিরেই পর্দ্দার ঠিক ওপিঠেই বসিয়া নন্দী কি একটা সেলাই করিতেছিল। তলবমাত্র প্রবেশ করিয়া মাথাটি নোয়াইলা যোড় হাতে বলিল — "হুজুর!"

দুর্গা একটু হিন্দী করিয়া — কেন না, খানসামাদের সঙ্গে বাঙ্গলা কথাটা সভ্যতার রীতি-বিরুদ্ধ — নন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন — "হেঁ রে, এই সময় আমরা একবার বাঙ্গ লায় যেতাম না?"

হিন্দী আমাদের আসেনা, বাঙ্গালাতেই বলিয়া যাই।

"খোদাবন্দ! সে ত সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, এখন নয়।" দুর্গা বলিলেন— 'বহুৎ আচ্ছা।' নন্দী সেলাম করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার বাহিরে গিয়া সূচ সূতা লইয়া স্বচ্ছন্দে বসিল।

শিব একটু হাসিয়া বলিলেন — "সে যে পূজার ছুটিতে।"

দুর্গা। তাই বটে, সময়টা ঠিক আমার মনে আসছিল না। বর্ষার কাছাকাছি, তাই মনে হচ্ছিল। গুরুমা। পৌত্তলিক কাণ্ডে প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয়। এবার কোন মতেই যাওয়া হোতে পারে না।

দুর্গা। আমি প্রায় যাচ্ছি!

গণেশ। আমার ত যাবার ইচ্ছা থাকলেও ফুরসৎ নেই। সেই সময়েই আমাদের সোশ্যাল কন্‌ফারেন্স বোসবে।

কার্ত্তিক। আমি ত টেঁক্যে রেখেছি, কুবেরা অর্থদক্ষ হিন্দু টুরিষ্ট পার্টি অর্গেনাইজ কোচ্চে, আমি এবার ছুটিতে বিলেত বেড়িয়ে আসব।

শিব। ভাল কথা, তোমাদের কনফারেন্সে সহবাসের বয়সের কি কোচ্চো বলো দেখি?

গণেশ। আমিত বোধ করি যে, নিদেন এক ছেলের মা না হ'লে সহবাসে সম্মতি দিতে পার্ব্বোনা, এই নিয়ম হওয়া উচিত। বারো চোদ্দ কি ষোল বছরেও আমি নিরাপদ

মনে করিনা। তবে কিনা, ভোটের কাজ, ভোটে যা হবে, তাইত হবে।

শিব। তুমিই ত গণপতি হে। তোমার দলেই ত যারা মানুষের মতন, তারা সকলেই আছে?

গুরুমা। লেডীদের সামনে নয়, ও কথাটা এখন নাই হলো।

ঝাঁ করিয়া অমনিই গল্পটা ফিরিয়া গেল। আবার পূজার কথা ; পূজার কথা হইতে পথের কথা, যাতায়াতের অসুবিধার কথা, আলোচালের নৈবেদ্যের কথা, — নানান কথা আরম্ভ হয়ে গেল। স্থির হইল যে, সেপ্টেম্বর অক্টোবরে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, যাওয়া হইতেই পারে না! কার্ত্তিকমাসে যাওয়াই স্থির।

শিব যে এখন সওদাগর হইয়াছেন, সে কথাটা পূর্ব্বে বলা হয় নাই। বড় গোছের একটা ডিস্‌পেন্সারি করিয়াই শিবের কিছু সংস্থান হইয়াছে, ব্যবসাবুদ্ধিটাও খুব পাকিয়া উঠিয়াছে। শিব প্রস্তাব করিলেন যে, বুড়া ষাঁড়ে ত কোন কাজ হয় না, ওটাকে কসাইদের কাছে বেচিলে হয়না? দুর্গার তাহাতে আপত্তি নাই, তিনি এখন পাকা গৃহিণী। সিংহটা এখন কোথাও বিক্রী হয় কি না তাই ভাবিতে লাগিলেন। কার্ত্তিক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আমাদের ঘরে ঘরেই একটা 'জু' হইতে পারে, — এত জানোয়ার আমাদের আছে।'

কথোপকথন এইরূপ হইতেছে, ষাঁড়টা, কুঠির হাতাতেই চরিয়া বেড়াইতেছিল, পরামর্শটা শুনিতে পাইল। তবু শিবের ষাঁড়, বুদ্ধিশুদ্ধি এক রকম আছে। রাত্রিটা কোন রকমে কাটাইয়া পরদিন প্রাতঃকালেই মিউনিসিপ্যাল অফিসে গিয়া উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গেই ময়লার গাড়ীতে অনররী বহাল হইয়া গেল। ষাঁড় ঠিক ঠাওরাইয়াছিল যে, এক ত অনররী পদটা ভাল, তা যাই কেন হউক না। তাহার উপর নির্ব্বাচন প্রণালী যখন প্রচলিত আছে, কালে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান হইয়া অনরারী রাজাগিরির ভরসা পর্যন্ত থাকিতে পারে। শিবের পাল্লায় থেকে শেষে কসাইয়ের হাতে প্রাণটা কেন যায়?

ষাঁড়তো সটান সটকান দিল। সিংহও বুঝিল বেগতিক, সেও প্রস্থান করিল। কোথায় যাই ভাবিতে ভাবিতে মহিষাসুরের কাছে গিয়া উপস্থিত।

সিংহকে দেখিয়াই ত মহিষাসুরের চক্ষুস্থির। ভাবিল — "বেটা এবার এত সকাল সকাল ধরতে এল কেন?"

মনের কথা মনে চাপিয়া রাখিয়া মহিষাসুর সিংহকে সমাদর পূর্ব্বক বসিতে দিল। এ কথা সে কথা পাঁচ কথার পর মহিষ বলিল— "দেখুন সিংহ মশাই অনেকদিন থেকে একটি কথা আপনাকে বোল্‌বো বোল্‌বো মনে করি, তা বলবার সুযোগটা হয়েই ওঠে না।"

সিংহ অমনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন — "হানি-কি! বলই না!"

মহিষ। বলি, তাই বোলচি যে আপনার ত দেখা পাবার যো নাই। যা দেখা পূজোর কটা দিন।

সিংহ। তা বৈ কি? ফুরসুৎ ত নেই।

মহিষ। আপনারা বড় লোক, বড়লোকের কাছে থাকা। আপনাদের কি ফুরসুৎ হয়? তা সে পুজোর কদিনও না-দেখারই মধ্যে। আমায় কামড়ে আপনারও সে কদিন মুখ্ জোড়া থাকে, আর আমার ত কথাই নেই।

সিংহ। তা বটে হে! তোমার ত অসুখ বটেই, আমারও ত সুখ নেই।

মহিষ। আমরা আবার মানুষ, আমাদের আবার অসুখ! অসুখ যা তা আপনারই। দেখুন কত নৈবিদ্দি, ভোগ-রাগ, লুচি, সন্দেশ, পাঁটা, মোষ, — তা আপনার ত কিছু করবার যো নেই। সেই আমার হাতে কামড় মেরেই মুখ জুড়ে বসে থাক্‌তে হয়, গিলতেও পান না, ওগ্লাতেও পান না। সত্যি বলছি সিংহমশাই আপনার জন্যে আমার কান্না পায়।

সিংহ। হ্যাঁ হে, তুমি ত বড় ভাল লোক দেখছি। এমন তরো লোক তুমি জানলে যে তোমার একটা — তা আমায় দিয়ে তোমার কি উপকার হতে পারে বল দেখি?

মহিষ। দেখুন দেখি আপনি মনে কল্লে কি না হতে পারে? আপনাদের হাত ঝাড়লে পর্ব্বত।

সিংহ। বলই না, কি কত্তে হবে? তাই করা যাবে এখন।

মহিষ। তা কি কর্ব্বেন?

সিংহ। কর্ব্বো না কেন? বলো।

মহিষ। বোল্‌ছি কি, আপনি আমায় ছেড়ে যেতে পারেন!

সিংহ। তা কেমন করে হোতে পারে?

মহিষ। আজ্ঞে আমিও ত তাই বোলছিলাম, তা কেমন করে হবে? তা হবেনা কেন, হয় ; আপনি মনে কোল্লেই হয়।

সিংহ। মনের কথাটাই ছাই ভেঙে বলো না?

মহিষ। বোল্‌ছিলাম কি, বলি, ওদের কাকেও না যেতে দিয়ে আপনি আর আমি যদি পূজোর বাড়ীতে যাই, সে কেমন হয়?

সিংহ। তাঁরা তা শুন্‌বেন কেন?

মহিষ। তাঁদের শোনাশুনির ভার আমার। আপনি রাজি হলেই হলো।

সিংহ দেখিল সাপে বর। পরামর্শটা সর্ব্বাংশে ভাল। আরও একটু সুবিধার চেষ্টায় বলিল, — "ভাল যদি রাজী হই, পুজোর ব্যাপারটা কি রকম হবে?"

মহিষ। পুজো যা হবে, তা আপনারই ; আমি বসে বসে আপনার লেজে তেল দিতে থাক্‌ব তখন। ভোগ রাগ নৈবিদ্দি যা হয়, সবই আপনার, প্রসাদটা আস্‌টা দেন ভালই, না দেন, নেই। পুজোর কদিন কামড় খস্‌বে, সেই যে আমার পরম লাভ। তায় আবার অমনতরো করে আপনার কাছে ঘেঁসে বস্‌তে পাবো, আমার মান বৃদ্ধি হবে কত?

সিংহ। ভাল, দুর্গাকে যেন মানালে। লক্ষ্মী, সরস্বতী, তারা অন্য জায়গা হতে আসে, তারা ছাড়বে কেন?

মহিষ। আপনি মাত্র রাজি থাকুন, ছাড়বে সবাই। আমার আসুরী বুদ্ধিখানাই দেখুন না। আপনি যেখানে সহায়, সেখানে আমি লাগ্‌লে লক্ষ্মীকেও ছাড়াবো, সরস্বতীকেও তাড়াবো। সব ভার আমায় দিন, আপনি কেবল যথাকালে অনুগ্রহ কোরে লেজটি দিবেন, আর কিছুই ভাবতে হবে না।

সিংহ বলিল — "তথাস্তু!" সন্ধি হইয়া গেল। সিংহের পোয়াবারো যোল আনাই লাভ। লেজে তেল দিতে পাইয়াই অসুর পরিতুষ্ট।

সাতমার পালোয়ান

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এক রাজার দেশে এক কুমোর ছিল ; তার নাম ছিল কানাই।

কানাই কিছু একটা গড়িতে গেলেই তাহা বাঁকা হইয়া যাইত ; কাজেই তাহা কেহ কিনিত না। কিন্তু তাহার স্ত্রী খুব সুন্দর হাঁড়ি কলসী গড়িতে পারিত। ইহাতে কানাইয়ের বেশ সুবিধা হইবারই কথা ছিল। সে সকল মেহনত তাহার স্ত্রীর ঘাড়ে ফেলিয়া সুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত। কিন্তু তাহার স্ত্রী বড়ই রাগী ছিল, কানাইকে আলস্য করিতে দেখিলেই সে ঝাঁটা লইয়া আসিত। সুতরাং মোটের উপর বেচারার কষ্টই ছিল বলিতে হইবে।

একদিন কানাইয়ের স্ত্রী কতকগুলি হাঁড়ি রোদে দিয়া বলিল, 'দেখ যেন কিছুতে মাড়ায় না।'

কানাই কিছু চিড়ে আর ঝোলাগুড় এবং একটা লাঠি লইয়া হাঁড়ি পাহারা দিতে বসিল। এক-একবার চিড়ে খায় আর এক-একবার হাঁড়ির পানে তাকাইয়া দেখে, কিছুতে মাড়াইল কি না।

কানাইয়ের ঝোলাগুড়ের খানিকটা কেমন করিয়া হাঁড়ির উপর পড়িয়াছিল, অনেকগুলি মাছি আসিয়া তাহা খাইতে বসিয়া গেল। কানাই তাহা দেখিয়া বলিল, 'বটে! হাঁড়ি মাড়াচ্ছ? আচ্ছা, রোসো!' এই বলিয়া সে তাহার লাঠি দিয়া মাছিগুলোকে এমন এক ঘা লাগাইল যে তাহাতে মাছিও মরিয়া গেল হাঁড়িও গুঁড়া হইয়া গেল।

কানাই গনিয়া দেখিল যে, সাতটা মাছি মরিয়াছে। তাহাতে সে লাঠি বগলে করিয়া ভারি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। হাঁড়ি ভাঙার শব্দ শুনিয়া তাহার স্ত্রী ঝাঁটা হাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে?' কানাই কথা কয় না। তাহার স্ত্রী যতই জিজ্ঞাসা করে, সে খালি আরো গম্ভীর হইয়া যায়।

শেষটা যখন তাহার স্ত্রী বাড়াবাড়ি করিল, তখন সে চোখ লাল করিয়া বলিল, 'দেখ্, হিসেবে করে কথা কোস। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস?'

কানাই আর কাহারো সঙ্গে কথা কয় না। বেশি পীড়াপীড়ি করিলে খালি বলে, 'হিসেবে করে কথা কোস্। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস?'

শেষে একদিন কানাই এক থান মার্কিন দিয়া মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিল। বনের ভিতর হইতে বাঁশ কাটিয়া একটা ভয়ানক মোটা লাঠি তয়ের করিল। তারপর পিরান গায়ে দিয়া কোমর বাঁধিয়া, ঢাল হাতে করিয়া, জুতা পায় দিয়া, রাজার বাড়িতে পালোয়ান-গিরি করিতে চলিল। যাইবার সময় তাহার স্ত্রীকে বলিয়া গেল— 'আমি আর তোদের এখানে থাকব না। আমি এক ঘায় সাতটা মারতে পারি।'

পথের লোক জিজ্ঞাসা করে, 'কানাই, কোথায় যাও?' কানাই সে কথার কোন উত্তর দেয় না। সে মনে করিয়াছে যে এখন হইতে আর কানাই বলিয়া ডাকিলে উত্তর দিবে না। সে এক ঘায় সাতটা মারিয়া ফেলিয়াছে! এখন কি আর তাহাকে কানাই ডাকা সাজে? এখন তাহাকে বলিতে হইবে, 'সাতমার পালোয়ান।'

রাজার নিকট গিয়া কানাই জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহার সেই এক থান মার্কিনের পাগড়ি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি হে?' কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমার নাম সাতমার পালোয়ান। আমি এক ঘায়ে সাতটাকে মারতে পারি।'

পথের লোক জিজ্ঞাসা করে, 'কানাই, কোথায় যাও?' কানাই সে কথার কোন উত্তর দেয় না। সে মনে করিয়াছে যে এখন হইতে আর কানাই বলিয়া ডাকিলে উত্তর দিবে না। সে এক ঘায় সাতটা মারিয়া ফেলিয়াছে! এখন কি আর তাহাকে কানাই ডাকা সাজে? এখন তাহাকে বলিতে হইবে, 'সাতমার পালোয়ান।'

রাজার নিকট গিয়া কানাই জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহার সেই এক থান মার্কিনের পাগড়ি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি হে?' কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমার নাম সাতমার পালোয়ান। আমি এক ঘায়ে সাতটাকে মারতে পারি।'

কানাই রাজার বাড়িতে পালোয়ান নিযুক্ত হইল। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। এখন তার দিন সুখেই যায়। ইহার মধ্যে একদিন সেই রাজার দেশে এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত। সে মানুষ মারিয়া, গরু বাছুর খাইয়া, দৌরাত্ম্য করিয়া দেশ ছারখার করিবার জোগাড় করিল। যত শিকারী তাহাকে মারিতে গেল, সব কটাকে সে জলযোগ করিয়া ফেলিল। রাজামহাশয় অবধি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'দেশ আর থাকে না।'

এমন সময় কোথাকার এক দুষ্ট লোক আসিয়া রাজার কানে কানে বলিল, 'রাজামশায়, এত যে ভাবছেন, তবে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে পালোয়ান রেখেছেন কি করতে? তাকে ডেকে বাঘ মেরে দিতে হুকুম করুন না।'

রাজা বলিলেন, 'আরে তাই ত! ডাক্ পালোয়ানকে!'

রাজার তলব পাইয়া কানাই আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। রাজা বলিলেন, 'সাতমার পালোয়ান, তোমাকে ঐ বাঘ মেরে দিতে হবে। নইলে তোমার মাথা কাটব।'

কানাই লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, 'বহুত আচ্ছা মহারাজ, এখনি যাচ্ছি।'

ঘরে আসিয়া কানাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হায়, হায়! এমন সুখের চাকরিটা আর রহিল না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝি প্রাণটাও যায়! কানাই বলিল, 'এখন আর কি? বাঘ মারতে গেলে বাঘে খাবে, না গেলে রাজা মারবে। দূর হোক গে, আমি আর এদেশে থাকব না।'

সেদিন সন্ধ্যার পর কানাই তাহার পাগড়িটা মাথায় জড়াইয়া, কোমরটা আঁটিয়া

বাঁধিল। এক হাতে ঢাল, আর এক হাতে ডাণ্ডা, পিঠে পুঁটুলি, পায়ে নাগরা জুতো। সকলে মনে করিল, সাতমার পালোয়ান বাঘ মারিতে চলিয়াছে। কানাই মনে করিল, এ রাজার দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভাল। একটা ঘোড়া হইলে আরো শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া হইত।

ততক্ষণে বাঘ করিয়াছে কি, এক বুড়ির ঘরের পিছনে চুপ মারিয়া বসিয়া আছে। ইচ্ছাটা, বুড়ি কিংবা তাহার নাতনী একটিবার বাহিরে আসিলেই ধরিয়া খাইবে। বুড়ি ঘরের ভিতরে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছে। তাহার বাহিরে আসিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। এতক্ষণে সে কখন ঘুমাইয়া পড়িত, খালি নাতনীটার জ্বালায় পারিতেছে না। বুড়ি অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পারে নাই। শেষে রাগিয়া বলিল, তোকে বাঘে ধরে নেবে। নাতনী বলিল, আমি বাঘে ভয় করি না। বুড়ি বলিল, তবে তোকে ট্যাঁপায় নেবে।

বাস্তবিক ট্যাঁপা বলিতে একটা কিছু নাই, বুড়ি তাহার নাতনীকে ভয় দেখাইবার জন্যই ঐ নামটা তয়ের করিয়াছিল। কিন্তু বাঘ ঘরের পিছন হইতে ট্যাঁপার নাম শুনিয়া ভারি ভয় পাইয়া গেল! সে মনে মনে বলিল, 'বাস রে! আমাকে ভয় করে না, কিন্তু ট্যাঁপাকে ভয় করবে! সেটা জানি কেমন ভয়ংকর জানোয়ার। যদি একবার সেই জানোয়ারটা এই দিক দিয়ে আসে, তা হইলে ত মুশকিল দেখছি।'

অন্ধকারে বসিয়া বাঘ এইরূপ ভাবিতেছে, আর ঠিক এমনি সময় কানাই সেই পথে পলায়ন করিতেছে। বাঘকে দেখিয়া কানাই মনে মনে ভাবিল, 'বাঃ, এই ত একটা ঘোড়া বসে আছে!' এই বলিয়াই সে কোমরের কাপড়টা খুলিয়া বাঘের গলায় বাঁধিল।

অন্ধকারে বাঘকে কানাই ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। বাঘও কানাইকে তাহার পাগড়ি-টাগড়ি সুদ্ধ একটা নিতান্তই অদ্ভুত জন্তুর মতন দেখিল। একটা মানুষ হঠাৎ আসিয়া যে তার মতন জন্তুর সামনে এতটা বেয়াদবি করিয়া বসিবে, এ কথা তাহার মাথায় ঢুকে নাই। সে বেচারা নেহাত ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল — 'এই রে, মাটি করেছে। আমাকে ট্যাঁপায় ধরেছে!'

কানাই ভাবিল, ঘোড়া যখন পেয়েছি, তখন আর তাড়াতাড়ি কিসের? ঘরে একটু ঘুমুই, তারপর শেষরাত্রে ঘোড়ায় চড়ে ছুট দেব। এই ভাবিয়া সে বাঘকে তাহার বাড়ির পানে টানিয়া লইয়া চলিল। বাঘ বেচারা আর কি করে! সে মনে করিল, 'এখন ট্যাঁপার হাতে পড়েছি, এর কথামতনই চলতে হবে।'

বাড়ি আসিয়া কানাই বাঘকে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া দরজা আঁটিয়া দিল। তারপর বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, শেষ রাত্রেই উঠে পালাব।

কানাইয়ের ঘুম ভাঙিতে ভাঙিতে ফরসা হইয়া গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘোড়া আনিতে গিয়া দেখে - সর্বনাশ! বাঘ সে ঘরে বন্ধ আছে! বাহিরে আসিয়া তাহাকে খাইতে পারিবে না, সে কথা তখন তাহার মনেই হইল না। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে

দিয়া দরজায় হুড়কা আঁটিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এদিকে সকালবেলা সকলে সাতমার পালোয়ানের বাড়িতে খবর লইতে আসিয়াছে, বাঘ মারা হইল কি না। তাহারা আসিয়া দেখিল যে, বাঘ ঘরে বাঁধা রহিয়াছে। তখন সকলে ছুটিয়া গিয়া রাজাকে বলিল, 'রাজামশাই, দেখুন এসে, সাতমার পালোয়ান বাঘকে ধরে এনে ঘরে বেঁধে রেখেছে!'

রাজামহাশয় আশ্চর্য হইয়া সাতমার পালোয়ানের বাড়ি চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে সত্যই বাঘ ঘরে বাঁধা। ততক্ষণে কানাই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আসিয়া রাজামহাশয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজা বলিলেন, 'সাতমার, ওটাকে মার নি কেন?'

কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমি এক ঘায় সাতটাকে মারি, ও যে শুধু একটা!'

এখন হইতে সাতমার পালোয়ানের নাম দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল। রাজমহাশয় যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মাইনে পাঁচ শত টাকা করিয়া দিলেন। কানাইয়ের দিন খুব সুখেই কাটিতে লাগিল।

কিন্তু সুখের দিন কি চিরকাল থাকে? দেখিতে দেখিতে কানাইয়ের আর এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

এবারে বাঘ নয় আর-একটা রাজা। সে অনেক হাজার সৈন্য লইয়া এই রাজার দেশ লুটিতে আসিয়াছে। এ রাজাটা নাকি বড়ই ভয়ানক লোক, তাহার সঙ্গে কিছুতেই আঁটা যায় না।

রাজামহাশয় বলিলেন, 'সাতমার, এখন উপায়? তুমি না বাঁচালে আমার আর রক্ষে নেই। তোমাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দেব, যদি এবার বাঁচিয়ে দিতে পার।'

কানাই বলিল, 'রাজামশাই, কোন চিন্তা করবেন না, এই আমি যাচ্ছি! আমাকে একটা ভাল ঘোড়া দিন।'

রাজার হুকুমে সরকারি অস্তাবলের সকলের চাইতে ভাল যুদ্ধের ঘোড়াটি আনিয়া কানাইকে দেওয়া হইল।

কানাই আজ দুই থান মার্কিন দিয়া পাগড়ি বাঁধিল। পোশাকটাও দস্তুর মতন করিল। মনে মনে কিন্তু তাহার মতলব এই যে, যুদ্ধে যাইবার ভান করিয়া এইবার ঘোড়ার পিঠে চড়িতে পারিলেই পলায়নের সুবিধা হয়।

কিন্তু হায়, সেটা যে যুদ্ধের ঘোড়া কানাই তাহা জানিত না। সে বেচারা যতই ঘোড়াটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে চায়, ঘোড়া কিছুতে রাজি হয় না। যুদ্ধের বাজনা শুনিয়া ঘোড়া যখন নাচিতে লাগিল, কানাইয়ের তখন পিঠে টিকিয়া থাকা ভার হইল। শেষে ঘোড়া তাহার কোন কথা না শুনিয়া একেবারে যুদ্ধের জায়গায় গিয়া উপস্থিত। পথে কানাই লতাপাতা গাছপালা খড়ের গাদা যাহা কিছু পাইয়াছে, তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই সে ঘোড়া থামিল না। সেই

গাছপালা আর খড়ের গাদা সবসুদ্ধই সে কানাইকে লইয়া ছুটিল।

এদিকে সেই বিদেশী রাজার সৈন্যরা শুনিতে পাইয়াছে যে এদেশে একটা সাতমার পালোয়ান আছে, সে এক ঘায় সাতটাকে মারে — বাঘকে ধরিয়া আনিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখে! এ কথা শুনিয়াই তাহারা বলাবলি করিতেছে, 'ভাই, ওটা আসিলে আর যুদ্ধ-টুদ্ধ করা হইবে না। বাপরে, এক ঘায় সাতটাকে মারিবে।'

এমন সময় সাতমারের ঘোড়া সেই দুই থান মার্কিনের পাগড়ি আর সেই সব গাছপালা আর খড়ের গাদা সুদ্ধ সাতমারকে লইয়া আসিয়া দেখা দিল! দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, যেন একটা পাহাড়-পর্বত ছুটিয়া আসিতেছে। বিদেশী রাজার সৈন্যরা তাহা একবার দেখিয়া আর দুবার দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না। একজন যেই চ্যাঁচাইয়া বলিল, 'ঐ রে আসছে। এবারে গাছ পাথর ছুড়ে মারবে।' অমনি মুহূর্তের মধ্যে সেই হাজার হাজার সৈন্য চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে কোথায় ছুটিয়া পলাইল তাহার ঠিকানা নাই।

কানাই দেখিল যে, বিদেশী সৈন্য সব পলাইয়াছে, খালি তাহাদের রাজাটা ছুটিতে পারে নাই বলিয়া ভ্যাবাচাকা লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কানাই মনে মনে ভাবিল, 'এ ত মন্দ নয়! পালাতে চেয়েছিলুম, মাঝখান থেকে কেমন করে যুদ্ধ জিতে গেলুম! এখন রাজাটাকে বেঁধে নিলেই হয়!'

আর কি! এখন ত সাতমার পালোয়ানের জয়জয়কার! অর্ধেক রাজ্য পাইয়া এখন সে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

সরস্বতী পুজোর চাঁদা

কুমারেশ ঘোষ

সেদিন দাদু বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

দুষ্টু স্কুলের পোষাকেই ঘরে ঢুকে দাদুকে টিপ করে একটা প্রণাম করলো।

— কী ব্যাপার? দাদু খবরের কাগজখানা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে হেসে জিগ্যেস করলেন।

দুষ্টু বললো, প্রমোশন পেয়েছি।

— কোন ক্লাস হলো?

— কেন, তোমার নাতি কোন ক্লাসে পড়ত, তা তুমি জানো না?

ইস। তাই তো। দাদুর মাথায় আজকাল আর কিছুই থাকে না। সব ভুলে যান। দুষ্টুর মাকেই মনে করে খাওয়াতে হয়। আর দিদা তো ঠাকুরঘর নিয়েই ব্যস্ত। বলেই দিয়েছেন, ছেলে বৌকে, আমি এখন ওপারের চিন্তায় ব্যস্ত, তোমরা এপারের যা করবার করো।

দুষ্টুও জানে, দাদু কত ভুলো হয়ে গেছেন। বাইরে বেরুলে তার জন্যে যে একটু লজেন্স ট্রফি বা চকোলেট আনবে, তা প্রায়ই ভুলে যান।

কাজেই দুষ্টু আর কথা না বাড়িয়ে বললো, ক্লাস ফোরে উঠলাম।

দাদু বললেন, ও, তা স্ট্যাণ্ড করেছ নিশ্চয়ই।

মাথা চুলকে দুষ্টু বললো, এই, মানে ফোর্থ হয়েছি।

— ফোর্থ? দাদু বললেন, আমি ভাবলাম ফার্স্ট হয়েছ। তোমার নাম দুষ্টু হলেও, অবশ্য নামটা আমিই রেখেছিলাম, পড়াশুনোতে তো ভালই জানি।

দুষ্টু বললো, তুমি তো জানো, অংকতেই ছাঁকা নম্বর ওঠে, সেই অংকই ভুল হয়ে গেল — দু দুটো!

শুনে দাদু বললেন, এ তো খুব ভাববার কথা!

— কেন? কেন? দুষ্টু জানবার জন্য দাদুর কাছ ঘেঁষে বসলো!

দাদু দুষ্টুর গায়ে হাত বুলিয়ে হেসে বললেন, আমরা সবাই অংক কষছি। অংক কষে কষে কাজ করছি। অংক মানে হিসেবে ভুল হলেই কাজটা ঠিক হয় না।

দাদু দেখলেন, দুস্টু চুপ করে শুনছে। বুঝলেন সে কথাটা নিয়ে ভাবছে। তাই দাদু আরো একটু পরিষ্কার করে বললেন, এই দ্যাখো না, যখন আমরা বড় রাস্তা পার হতে যাই, তখন কি করি? অংক কষতে থাকি। রাস্তার মাঝামাঝি যাওয়া পর্যন্ত ডান দিকটা দেখি, কোনো গাড়ি এসে পড়ছে কিনা। তারপর বাঁ দিকটায় লক্ষ্য রেখে রাস্তার ওপারে যাই।

আরো বললেন দাদু, তাছাড়া দুরে কোনো গাড়ি আসতে দেখলেই তখন মনেমনে অংক কষতে হয়— ঐ গাড়িটা কাছাকাছি আসার আগেই আমি রাস্তাটি পার হতে পারবো

কিনা! আর এই অংক কষতে যদি ভুল হয়ে যায়, তা হলেই যাঃ—

— অ্যাকসিডেন্ট! তাই না দাদু?

— ঠিক তাই!

দুষ্টু জানে, দাদু খুব ভীতু। তার সঙ্গে ফুটবল খেলতে, ক্রিকেট খেলতে, স্কিপিং করতে সব কিছুই ভয়। তাই দুষ্টু তাড়াতাড়ি দাদুকে সাহস দিলো, তবে দাদু, পরীক্ষায় অংক ভুল হয়ে গেলে অ্যাকসিডেন্টের ভয় নেই, হাসপাতালে যেতে হবে না।

— হ্যাঁ, সেটা অবশ্য ঠিক। স্বীকার করলেন দাদু। তাছাড়া দুষ্টু আরো বোঝাল। আর একটা জিনিস ভেবে দেখেছ, আমি ফোর্থ হয়ে ক্লাস ফোরে উঠলাম। আর ফার্স্ট হলে ক্লাস ওয়ানে নেমে যেতে হতো!

দাদু আড়চোখে দেখলেন, দুষ্টু কথাটা বলে মুখ টিপে হাসছে।

দাদুও তখন মাথা নেড়ে বললেন, ঠিকই তো, এই অংকটা তো কষে দেখিনি কখনো। আজকাল এইরকম অংক বুঝি স্কুলে শেখানো হয়?

এর উত্তর কী দেবে দুষ্টু? ভাবছে, এমন সময় রক্ষা করলেন দুষ্টুরই মা। তিনি ঢুকলেন, দুষ্টুকে জিগ্যেস করলেন, কী খবর পরীক্ষার?

দুষ্টু বললো, চলো ভেতরে, বলছি — বলে মাকে প্রায় ঠেলে নিয়ে ভেতরে গেল দুষ্টু!

সেই দাদুকে একদিন দেখা গেল, দরজা জানলা বন্ধ করে, দিনের বেলায় আলো জ্বালিয়ে নাকের কাছে খবরের কাগজখানা এনে পড়ছেন!

কী ব্যাপার?

একটু পরেই বাইরের দরজায় ধাক্কা ঃ দরজা খোলো, দরজা খোলো—

ইস্! যেন লাটসাহেব!

দাদু ভেতর থেকে বিরক্ত হয়ে জিগ্যেস করলেন, তুমি কে?

— আমি! আমি!

— আরে, আমিটা কে? নাম বলো।

— আমি দুষ্টু।

— অ, দুষ্টু! দাদু উঠে আস্তে দরজাটি একটু ফাঁক করেই বললেন, এসো, তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ো।

দুষ্টু তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকতেই দাদু দরজার খিলটা আবার লাগিয়ে দিলেন।

দুষ্টু স্কুল থেকে ফিরলো। পিঠে ব্যাগ বাঁধা। তাতে ক্লাস ফোরের নতুন নতুন বই। মনটা আনন্দে বেশ ফুরফুরে। কিন্তু বাড়িতে কী এমন হলো? দাদুর এত কিসের ভয়? চোর? ডাকাত?

দুষ্টুর মুখ শুকিয়ে গেল। জিগ্যেস করলো, কী ব্যাপার দাদু? দরজা জানলা এমন বন্ধ করে আছ কেন?

— ভয়ে?

— কিসের ভয়ে?

— চাঁদা!

— কিসের চাঁদা?

— সরস্বতী পুজোর চাঁদা!

ও ঠিকই তো! সরস্বতী পুজোর আর বেশি দেরি নেই। স্কুলেও তোড়জোড় হচ্ছে সরস্বতী পুজোর।

দুষ্টু জিগ্যেস করলো, তা তুমি দাদু, অমন লুকিয়ে আছ কেন?

— ঐ কুচোচিংড়িদের ভয়ে। দাদু হাসলেন।

— ও, বাচ্চা ছেলেদের কথা বলছ? যারা চাঁদা চাইতে আসছে?

— হ্যাঁ। দাদু বললেন, আমাকে বিরক্ত করে খেল। সময় নেই অসময় নেই। রসিদ বই হাতে নিয়ে কেবলই — দাদু চাঁদা, দাদু চাঁদা! তাই-

দুষ্টু বললো, তা বলে দরজা জানলাগুলো এমন করে এঁটে বন্ধ করে রাখলে দম বন্ধ হয়ে যাবে যে! আর লোডশেডিংয়ের দিনে, দিনে আ [illegible] জ্বালিয়ে রাখতে দেখলে লোকে হাসবে কিন্তু —

— কিন্তু কী আর করা যায়। দাদু হতাশ হয়েই বললেন, মা দুগ্‌গা আসার সময় থেকেই এই চাঁদা শুরু হয়েছে, এখনও চলছে। দুর্গা পুজোর সময় পাড়ার পুজোয় আর দু'একটা বাইরের পুজোয় দিতে হয়। একটু বেশি করে দিতে হয় বটে, তবে এত ঝামেলা নেই। কাজেই ভক্তি করেই দিই। মানে বড়দের বড় পুজো তো—

দুষ্টু বললো, বুঝেছি দাদু, তোমার ভাষায় রুই-কাতলাদের পুজো।

— ঠিক বলেছিস! — দাদু হাসলেন।

— তা হলে কালীপুজোটা কি? — দুষ্টু জিগ্যেস করলো।

দাদু বললেন, ওটা মস্তানদের পূজো। ভয়ে ভয়ে দিতে হয়।

— ও বুঝেছি, ওটা তাহলে কৈ, সিঙ্গী, মাগুরদের পুজো?

— তা যা বলেছিস! — বলেই দাদু আদর করে দুষ্টুর চুলের মুঠিটা ধরে একটু ঝাঁকিয়ে দিলেন। বললেন, আর জানিস, এই কুচোচিংড়িদের পুজোয় বিরক্ত হয়ে চাঁদা দিতে হয়। কত যে পূজা তার ঠিক নেই। মিলে-মিশে একটি কি দুটো পুজো কর, তা নয়।

দুষ্টু বললো, কিন্তু মনে রেখো দাদু, আমিও কুচোচিংড়ি। তাই না?

— হ্যাঁ, তাই তো! দাদু আঁতকে উঠলেন, শেষে তুমিও? চাঁদা?

— হ্যাঁ, চাঁদা! — দুষ্টু বললো, আমি আসছি জামটামা ছেড়ে, জলটল খেয়ে। তুমি এখন দরজা জানলা সব খুলে দাও।

দুষ্টু গটগট করে ভেতরে চলে গেল।

দুষ্টু চলে গেলে দাদু ভাবতে লাগলেন, তাই তো। বাড়ির ভেতরেই কুচোচিংড়ি, বাইরের কুচোচিংড়িকে ভয় করে কী লাভ?

দাদু হতাশ হয়ে দরজা জানলা সব খুলে দিলেন। যা থাকে কপালে।

তা ঐসব বাইরের কুচোচিংড়িদের হটাবার জন্যে তো দাদু কম চেষ্টা করেন নি! কোনো কোনো দলকে জিগ্যেস করেছে 'সরস্বতী' বানান করো। কেউ বলেছে 'স্বরসতী', কেউ বলেছে, 'শরস্যতি' — নানারকম বানান। বানানটা ঠিকমত বলিয়ে তাদের চাঁদা দিয়েছেন দাদু। কাউকে জিগ্যেস করেছেন 'বন্দেমাতরম্' গানটা কে লিখেছেন, উত্তর পেয়েছেন, রবি ঠাকুর। দাদু তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, গানটা লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, আর বলতে হয় রবি ঠাকুর। দাদু তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, গানটা লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, আর বলতে হয়, রবি ঠাকুর নয়, রবীন্দ্রনাথ। এবং চাঁদাও দিয়েছেন।

দাদু আরোও বুঝিয়েছেন, তোমরা এমন বাড়ি বাড়ি চাঁদা চেয়ে বেড়াও কেন? এইভাবে চাইতে চাইতে চক্ষুলজ্জা চলে যায়, পরে বড় হয়ে পরের কাজে হাত পাততেও লজ্জা হয় না আর!

তবু দাদু তাদের চাঁদা দেন। আহা, কচি কচি মুখগুলো দেখলে তাঁর মায়া হয়। আর অল্পতেই খুশি। যা হয় দিন দাদু, দু টাকা, এক টাকা। অথচ আটআনাতেও আহ্লাদে আটখানা!

তবে ঐ যে, মাস খানেক ধরে সব সময়ে বিরক্ত করে মারে!

পরদিন রবিবার। দাদু ভয়ে ভয়েই আছেন, এক্ষুণি কুচোচিংড়িদের শুরু হবে আগমন, হাতে চাঁদার রসিদ বই নিয়ে।

একটু পরেই দেখা গেল চাঁদার রসিদ বই। বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকে। বাইরের ঘরে ঢুকলো দুষ্টু। হাতে একখানা ছোট্ট রসিদ বই। বললো, দাদু, এই যে আমার রসিদ বই।

শুনেই দাদু আঁতকে উঠলেন, কী? চাঁদা?

— হ্যাঁ।

— তা কত দিতে হবে?

— সেটা তোমার ইচ্ছে! পাঁচ টাকা দশ টাকা। আরো বেশি দিতে চাও, আমার কোন আপত্তি নেই।

দাদু বললেন, হুঁ, তোমার আপত্তি না থাকতে পারে, আমার তো থাকতে পারে?

দুষ্টু বললো, তার আগে দেখো, রসিদ বইটি কেমন সুন্দর বানিয়েছি। তা হলে বেশি চাঁদা দিতে আপত্তি হবে না—

বলেই দুষ্টু দাদুর হাতে রসিদ বইখানা ধরিয়ে দিলো। দাদু দেখলেন, কতকগুলো একপিঠ লেখা আর একপিঠ সাদা কাগজকে পোস্টকার্ড সাইজে কেটে সুতো দিয়ে সেলাই করা। তার ওপরে নীল মোটা কাগজের মলাট দেওয়া। আর পাতায় পাতায় মাথার ওপরে লেখা ঃ 'ভারতী-আরতি' ঘরোয়া ক্লাব পরিচালিত। লাল কালি দিয়ে হাতে লেখা।

দেখে দাদু ঠোঁট উল্টে বললেন, হাতে লেখা রসিদ বই! ফুঃ!

দুষ্টু রসিদ বইটা কেড়ে নিয়ে বললো, ফুঃ নয়, উঃ!

— তার মানে? দাদুর প্রশ্ন।

— একটু পরেই বুঝতে পারবে। — দুষ্টুর উত্তর!

হ্যাঁ, একটু পরেই বোঝা গেল।

কুচোচিংড়িদের একটা দল এলো ঃ দাদু সরস্বতী পুজোর চাঁদাটা।

একজন বললো, একটু বেশি করে দেবেন দাদু!

দাদু বিরক্ত হয়ে বললেন, এই শুরু হলো।

দুষ্টু বললো, তোমাকে কিছু করতে হবে না দাদু। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি—

বলেই দুষ্টু ওদের জিগ্যেস করলো। গতবারে দিয়েছিলাম আমরা চাঁদা?

—হ্যাঁ। একটা ছেলে গতবছরের রসিদ বইয়ের নিজের অংশটা খুঁজে বার করে দেখালো, এই যে দু'টাকা!

দুষ্টু বললো, ঠিক আছে, কাটো রসিদ।

একটি ছেলে বললো, এবার একটু বেশি দিতে হবে, তিন টাকা। জিনিসের দাম বেড়ে গেছে তো!

দুষ্টু বললো, বেশ, তিন টাকা নয়, আড়াই টাকা কাটো।

ছেলেটি খুশি হয়েই আড়াই টাকার রসিদ কেটে দিলো। দুষ্টু সেটা নিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। একটু পরেই সে বাইরে এসে ছেলেটার হাতে তার রসিদ বইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে দিয়ে বললো, এই নাও। ছেলেটা চমকে উঠলো, একি? টাকা কই? এটা তো একটা রসিদ!

দুষ্টু বললো, এটাই টাকা। চাঁদা, তোমরাও আড়াই টাকার চাঁদা দিলে রসিদ দিয়ে, আমিও আড়াই টাকা চাঁদা নিলাম রসিদ দিয়ে। মানে আমাদের বাড়িতেও ঘরোয়া সরস্বতী পুজো হচ্ছে কিনা, অথচ দাদু আমাকে বাইরে যেতে দেন না চাঁদা আদায় করতে, তাই এই—

দুষ্টু আরো বললো, তবুও তো তিনটাকার রসিদ লিখলাম না। তাহলে আরো আটআনা বেশি দিতে হতো তোমাদের। তা তোমাদের তো এখন বউনিই হয়নি। তাই নয়?

শুনেই আর একটি ছেলে আগের ছেলেটার হাত ধরে টেনে নিয়ে বললো, ওরে, পাইলে আয়, পাইলে আয়—

গুরুদেব

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

পরদিন ঘনশ্যাম পুনরায় গল্প আরম্ভ করিলেন। গড়গড়ি মহাশয় বলিতেছেন ঃ—

যদিও আমি নিজে এ পর্য্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করি নাই, তথাপি শ্রীযুক্ত শ্রীল। গোলোক চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের বংশের গুরুদেব। ঠাকুর মহাশয়ের বাটী আমাদেরই গ্রামে। কিন্তু তিনি বার মাস কলিকাতাতেই থাকিবেন, কেবল প্রতি বৎসর পূজার সময় এক মাসের জন্য দেশে গমন করিতেন। আমি মনে করিলাম যে, কনিষ্ঠকে বুঝাইবার নিমিত্ত ঠাকুর মহাশয়কে অনুরোধ করি। ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বে একটি হোটেল করিয়াছিলেন। হোটেলের কাজে তাঁহার লাভ হয় নাই। এক্ষণে তিনি পাঁঠার দোকান করিয়াছেন। সন্ধান করিয়া আমি সেই পাঁঠার দোকানে গিয়ে উপস্থিত হইলাম। রাস্তার ধারেই দোকান। সেই দোকানে দুইটি ছাড়ানো ছাগল ঝুলিতেছিল। ঠাকুর মহাশয় তখন ব্যস্ত ছিলেন। একজন খরিদ্দারকে তখন তিনি আধ সের মাংস বিক্রয় করিতেছিলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিতেছিলেন যে, সে মাংস টাট্‌কা। খরিদ্দার বলিতেছিল যে, সে মাংস বাসি। খরিদ্দার বলিল যে, সে খাসি ; ঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে, সে পাঁঠা। খরিদার বলিল যে, পিঠের দাঁড়ার মাংস ভাল, সেই মাংস আমি লইব। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে, পাঁজরার মাংস ভাল, তাহাই লইয়া যাও।

মাংস লইয়া খরিদদার প্রস্থান করিলে, ঠাকুর মহাশয়কে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। ঠাকুর মহাশয়ের দক্ষিণ পদ কিছু স্থূল ছিল, অর্থাৎ সে পায়ে গোদ ছিল। সেই স্থূল পাদপদ্মটি তিনি আমাকে মস্তকে তুলিয়া দিলেন। গোদের গ্যাঁজ হইতে রস প্রবাহিত হইয়া আমার মস্তক সিক্ত হইল, দুই চারি ফোঁটা আমার চক্ষুর উপর দিয়া বহিয়া গেল। নানারূপ আশিস্ বচনে সম্ভাষণ করিয়া ঠাকুর মহাশয় আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইলেন। একখানি খোলার বাটীতে ঠাকুর মহাশয়ের দোকান ছিল। পথের ধারেই দোকান। তাহার পশ্চাতেই ভিতর দিকে খোঁয়াড়। সেই খোঁয়াড়ের ভিতর অনেকগুলি ছাগল ছিল। খোঁয়াড়টি দিন দুই প্রহরেও অন্ধকারে পরিপূর্ণ থাকে। সে নিমিত্ত কিরূপ ছাগল ও কতগুলি ছাগল তাহার ভিতর ছিল, প্রথম তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। খোঁয়াড়ের পশ্চাতে বাটীর সর্ব্বশেষে, আর একখানি ঘর। সেই ঘরে ঠাকুর মহাশয় রন্ধন ও শয়ন করেন। এই ঘরখানির সম্মুখে একটি বারেণ্ডা ও তাহার পর একটু উঠান ছিল। সেজন্য খোঁয়াড়ের ন্যায় এ স্থানে অন্ধকার ছিল না। ঠাকুর মহাশয় সেই বারেণ্ডায় আমাকে বসাইলেন। কলিকাতার ও দেশের নানারূপ কথার পর, আমার ভ্রাতার কথা গুরুদেবকে আমি বলিলাম। কিন্তু গুরুদেব আমার সে কথায় বড় কান দিলেন না। এই সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু বলিলেন, আমার ভ্রাতার পক্ষেই তাহা তিনি বলিলেন। "সে বিশেষ কোন মন্দ কাজ করে নাই, বয়সকালে এইরূপ সকলেই করিয়া থাকে, বড় হইলে তাহার চরিত্র সংশোধিত হইয়া

যাইবে," এইরূপ ভ্রাতার পক্ষ হইয়াই তিনি আমাকে বুঝাইলেন। লোকপরম্পরায় আমি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার ভ্রাতার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক ; আমার ভ্রাতার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক ; আমার ভ্রাতার ইয়ার তিনি নহেন।

কিন্তু অনেকগুলি খোলার বাটী-নিবাসিনীদিগের সহিত ঠাকুর মহাশয়ের আলাপ পরিচয় ছিল ; কারণ, তাহাদের বাটী ফলাহার করিয়া তিনি বাসা-খরচ বাঁচাইতেন ও দক্ষিণা গ্রহণে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতেন। আমি শুনিয়াছিলাম যে, ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগে দুই একজন খোলার বাটী-নিবাসিনীর সহিত আমার ভ্রাতার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু এ সকল কথা আমি বিশ্বাস করি নাই। এক্ষণে মনে সন্দেহ হইল যে, ওক্কুর যেভাবে চলিতেছে, সেইভাবে চলিলে গুরুদেবের লাভ আছে, নিতান্ত অলাভ নেই। কথোপকথন করিতে করিতে খোঁয়াড়ের ভিতর হইতে ছাগলদিগের কাতরসূচক চীৎকার আমি বার বার শুনিতে পাইলাম। অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া এখন আর আমার ততটা অন্ধকার বোধ হইল না। আমি দেখিলাম যে, ছাগলগুলি অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় ও পিপাসায় তাহারা ছট্‌ফট্ করিতেছে। খোঁয়াড়ে স্থান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। তাহার ভিতর দশটি ছাগল ধরে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঠেশা-ঠেশি করিয়া ঠাকুর মহাশয় পঁচিশটির অধিক ছাগলে তাহা পূর্ন করিয়াছিলেন। অতি কষ্ঠে গায়ে গায়ে ঠেশা-ঠেশি করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়াছিল, শয়ন করিবার স্থান একেবারেই ছিল না।

আমি বলিলাম, "ঠাকুর মহাশয়! আপনার ছাগলগুলির বোধহয় বড় জল পিপাসা পাইয়াছে।"

আমি বলিলাম— "উহাদের ক্ষুধাও বোধহয় পাইয়াছে।"

গুরুদেব বলিলেন,— "ক্ষুধা নিশ্চয় পাইয়াছে। আজ তিন দিন উহাদিগকে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "উহাদিগকে কি খাইতে দেন?"

গুরুদেব উত্তর করিলেন, "খাইতে! খাইতে আবার কি দিব! খাইতে দিলে আর ব্যবসা চলে না।"

আমি বলিলাম, "এরূপ কয় দিন ইহারা অনাহারে থাকে?"

গুরুদেব বলিলেন, "সাত আট নের অধিক ইহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হয় না। সাত আট দিনের মধ্যেই এক এক খেপ শেষ হইয়া যায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটু একটু জল পান করিতে দেন না কেন?"

গুরুদেব উত্তর করিলেন, "উহারা গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। পিপাসায় উহাদের জ্ঞান নাই। জল দিলে বড়ই গোলমাল করে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে এ সাত আট দিন একটু জল পর্য্যন্ত উহারা পায় না?"

গুরুদেব বলিলেন, "পূর্বে দুই এক দিন অন্তর আধ কলসী জল দিতাম। কিন্তু জল দেখিলে তাহা পান করিবার নিমিত্ত বড়ই হুড়ামুড়ি করে। সে জন্য আর দিই না।"

খোঁয়াড়ের দিকে একটু নিরীক্ষণ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি কি খাসি?"

গুরুদেব উত্তর করিলেন, "খাসি! খাসি কোথায় পাইব! খাসির দাম কিবে কে? দুই পয়সা উপার্জ্জন হইবে বলিয়া ব্যবসা করিতেছি। খাসির মাংস দিলে কি আর চলে!"

আমি বলিলাম, "পাঁঠাও তো নয়!"

গুরুদেব বলিলেন, "পাঁঠা! তুমি পাগল! পাঁঠার দাম কত! লোককে দেখাইবার নিমিত্ত কেবল তিন চারিটা পাঁঠা রাখিয়েছি। বাকিগুলি পাঁঠী!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পাঁঠী! স্ত্রী পশু না খাইতে নাই?"

গুরুদেব উত্তর করিলেন, "আমি নিজে খাই না, আমি বিক্রয় করি। আমার শিষ্য যজমান আছে। মাছ-মাংস একেবারেই আমি খাই না। সকলেই জানে যে, গোলোক চক্রবর্ত্তী নিষ্ঠাবান্ সদ্‌ব্রাহ্মণ। লেখা-পড়া জানি না, নিজের নামটিও সই করিতে পারি না, ঢেরা দিয়া সারি। তবুও দেখ, এই নিষ্ঠার জন্য তোমার বাপ-মায়ের কল্যাণে সকলেই আমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।"

আমাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় বাহিরে একজন খরিদ্দার আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর মহাশয় তাড়াতাড়ি বাহিরে গমন করিলেন। খরিদারদের সহিত তাঁহার কথা-বার্ত্তায় আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে পাঁঠার মাংস ভিন্ন অন্য মাংস লইবে না ; পাঁঠা তাহাকে দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ কাটিয়া দিতে হইবে। তাহার জন্য সে অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে। খোঁয়াড়ের ভিতর যে তিন চারিটা পাঁঠা ছিল, তাহার একটিকে ঠাকুর মহাশয় অনেক কষ্টে বাহির করিয়া খরিদারকে দেখাইলেন। ক্রেতার তাহা মনোনীত হইল। তাহার পর ঠাকুর মহাশয় সেই পাঁঠাকে বাটীর ভিতর আনিলেন। সে স্থানে আমি বসিয়াছিলাম, তাহার নিকটে দুইটি খোঁটা ভূমিকে প্রোথিত ছিল। পাঁঠাকে ফেলিয়া ঠাকুর মহাশয় তাহাকে সেই খোঁটায় বাঁধিলেন। তাহার পর, তাহার মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়া জীয়ন্ত অবস্থাতেই মুণ্ডদিক হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাসূচক কাতরধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা! আহা! সে চক্ষু দুইটির দুঃখ আক্ষেপ ও ভর্ৎসনাসূচক ভাব দেখিয়া আমি যেন জ্ঞান-গোচরশূন্য হইয়া পড়িলাম। সে চক্ষু দুইটির ভাব এখনও মনে হইলে আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিয়া উঠিলাম, "ঠাকুর মহাশয়! ঠাকুর মহাশয়! করেন কি? উহার গলাটা প্রথমে কাটিয়া ফেলুন। প্রথম উহাকে বধ করিয়া তাহার পর উহার চর্ম্ম উত্তোলন করুন।"

ঠাকুর মহাশয় উত্তর করিলেন, "চুপ! চুপ! বাহিরের লোক শুনিতে পাইবে। জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প কাঁপিতে

থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্ম্মে এক প্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। প্রথম বধ করিয়া তাহার পর ছাল ছড়াইলে সে চামড়া দুই আনা কমমূল্যে বিক্রীত হয়। জীয়ন্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল-ছাড়াইলে আমার দুই আনা পয়সা লাভ হয়। ব্যবসা করিতে আসিয়াছি, বাবা! দয়া-মায়া করিতে গেলে আর ব্যবসা চলে না।"

ঠাকুর মহাশয় এইরূপ বলিতে লাগিলেন, আর ও দিকে তাঁহার হাত চলিতে লাগিল। সিদ্ধহস্ত! শীঘ্রই অনেক চর্ম্ম তিনি তুলিয়া ফেলিলেন। আর একবার আমি পাঁঠার চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সেই চক্ষু দুইটি যেন আমাকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "আমি দুর্ব্বল, আমি নিঃসহায়, এ ঘোর যাতনা তোমরা আমাকে দিলে, মাথার উপর ভগবান কি নাই!"

আমি এ নিষ্ঠুর দৃশ্য আর দেখিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া ভ্রাতাকে পুনর্ব্বার আমি অনেক বুঝাইলাম ও তাহাকে দেশে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কিছুতেই সে আমার সহিত দেশে গমন করিল না। নিরাশ হইয়া পরদিন আমি একেলাই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। দেশে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিন পরে শুনিলাম যে, যে দিন ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, ঠিক তাহার পরদিন পুনরায় যখন তিনি ঐরূপ চর্ম্মোত্তোলন কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই সময় পুলিশের লোকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে এই কাজের নিমিত্ত তাঁহার আরও তিনবার জরিমানা হইয়াছিল। সেজন্য এবার তাঁহার কিছু অধিক অর্থ দণ্ড হইল।

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন পর গুরুদেব দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেশে আসিয়া তিনি সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, জীবন্ত ছাগলের চর্ম্ম উত্তোলন বিষয়ে আমিই কলিকাতার পুলিশের নিকট সংবাদ দিয়াছিলাম, আমা হইতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। লোকের নিকট এইরূপ বলিয়া তিনি আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছিলাম। কিন্তু কেহই আমার কথা বিশ্বাস করিল না। সকলেই আমাকে ছি ছি করিতে লাগিল। সকলেই বলিল যে, সে লোক গুরু সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহার মত পাষণ্ড আর জগতে নাই।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ঘনশ্যাম সে রাত্রি গল্প বন্ধ করিলেন।

রচনার রহস্য

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ট্যাক্সিটা যেই বড় রাস্তায় পড়েছে, অমনি দেখি সামনে ভোম্বলদা। হাত বাড়িয়ে বললে, এই দাঁড়া, দাঁড়া একটু। আমিও তোর সঙ্গে যাব।

বলতে যেটুকু দেরি। তারপরেই টুক্ করে উঠে এল গাড়িতে। ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, তুমি আবার কোথায় যাবে।

কেন, তুই যেখানে যাচ্ছিস। মানে, দেওঘরে।

আরও আশ্চর্য হয়ে গেলুম আমি। রাঙা মাসীর বিয়েতে আমি যে দেওঘরে যাচ্ছি সে খবরটা পাড়ায় কারুর অজানা নেই, সাতদিন ধরে ঢাক-ঢোল পিটিয়েই বলে বেড়াচ্ছি সকলকে। এমনকি ভোম্বলদাকেও। কিন্তু সেও যে আজকেই, এই ট্রেনেই দেওঘরে যাব — মাত্র এই মুহূর্তেই আমি সেটা জানতে পারলুম।

বললুম, তুমিও কি রাঙা মাসীর বিয়েতে যাচ্ছ নাকি?

তোর রাঙা মাসীর বিয়েতে আমি কেন যাব? আমার বুঝি ফুলু পিসী থাকতে নেই।

তোমার ফুলু পিসীর বিয়ে? দেওঘরেই?

ভোম্বলদা নাক কুঁচকে বললে, কেন, তোর রাঙা মাসী ছাড়া দেওঘরে আর বুঝি কারুর বিয়ে হতে নেই? আবদার তো দেখছি মন্দ না।

শুনে আমি একটু দমে গেলুম। তারপর খানিকটা ভেবেচিন্তে বললুম, কিন্তু কই, আগে থাকতে তুমি তো কিছু বলনি।

আমি কি তোর মতো হাঁদারাম যে একমাস ধরে পাড়ায় পাড়ায় ফিরিওলার মতো চেঁচিয়ে বেড়াব? স্রেফ চেপে রেখেছিলুম। দ্যাখ না — কেমন সারাপ্রাইজ দিলুম তোকে।

আমি আবার মাথা চুলকোতে লাগলুম।

কিন্তু ভোম্বলদা —

থামলি কেন, বলে যা।

বিয়েবাড়ি যাচ্ছ — সঙ্গে তো জিনিসপত্র কিচ্ছু দেখছি না।

আমার পিসীবাড়ি তোর মাসীবাড়ির মতো নাকি? — খুব অহংকার করে, নাকটাকে কপালে তুলে দিয়ে ভোম্বলদা বললে, সেখানে কিছু নিয়ে যেতে হয় না। জামা-কাপড় বাক্স—স্রেফ কিচ্ছু না।

সব রেডি থাকে?

সব—সব। বলতে বলতে ভোম্বলদা টক করে পকেট থেকে একটা লেবেনচুস বের করে খেলো।

আমি জুলজুল করে চেয়ে দেখলুন। কিন্তু আমাকে দিলে না।

একটু পরে ভোম্বলদা বললে, তুই আগে কখনো দেওঘরে গেছিস?

বললুম, নিশ্চয় — আরও তিনবার। তুমি?

সাতবার।

কই, কখনো তো যেতে দেখিনি।

তোকেই কি যেতে দেখেছি এর আগে? তুই যে চালিয়াতি করে মিথ্যে করে বলছিস না—কেমন করে তা জানব?

ভীষণ রাগ হলে আমার। আমি মিথ্যে কথা বলছি? বেশ জিজ্ঞেস করো আমাকে।

ভোম্বলদা গম্ভীর হলো।

আচ্ছা, বেশ যাচাই করে নিচ্ছি তোকে। আচ্ছা, বল দেখি কি কি পাড়া আছে দেওঘরে?

আমি বললুম, এ আর শক্তটা কি; বমপাস টাউন, উইলিয়ামস টাউন, কাস্টোয়ার্স টাউন, বিলাসী টাউন —

থাক থাক, এতেই যথেষ্ট হবে। — ভোম্বলদা একবার যেন নিজে নিজে আউড়ে নিলে ঃ বমপাস টাউন, উইলিয়ামস টাউন, কাস্ট — মরুক গে, বিলাসী টাউন — হ্যাঁ, ঠিক আছে।

আমি খুব খুশি হয়ে বললুম, বিশ্বাস হলো এবারে?

কী করে বিশ্বাস হবে? ও তো লোকের মুখে মুখেই শোনা যায়।

চটে বললুম, কক্ষনো না। তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করো না।

আচ্ছা বলতো, দেওঘর জায়গাটা কি রকম?

খুব ভালো। খাসা জায়গা। বাড়িগুলি সব ফাঁকা ফাঁকা, কত গাছপালা, কত পাখি। কেবল বাজারটা একটু ঘিঞ্জি, আর মন্দিরটা।

দেওঘরে কিসের মন্দির আছে বল্‌তো?

আমি হেসে উঠলুম।

এ আর কে না জানে? বাবা বদ্যিনাথের মন্দির।

মন্দিরটা দেখতে কেমন?

কেমন আবার? ছোটমতন শিবের মন্দির। ভেতরটা বেশ অন্ধকার, ভীষণ ভিজে ভিজে আর খুব ভীড় হয়। একবার তো মেজমামা ধুম করে একটা আছাড়ই খেয়ে গেলেন।

হুঁ, বদ্যিনাথের মন্দির। শিবের মন্দির। অন্ধকার — ভিজে ভিজে, লোকে ধুম করে আছাড় খায়। কারেক্ট, ঠিক বলেছিস।

আমি আরও খুশি হলুম।

কেমন, বিশ্বাস হলো এবারে?

কী করে হবে? মাসী-পিসীমাদের মুখেও তো এসব গল্প শোনা যায়। আচ্ছা, আর একটুখানি বাজিয়ে নিই তোকে।

আমার ভীষণ অপমান বোধ হলো। বেশ, আরও জিজ্ঞেস করো। যত ইচ্ছে তোমার।

আচ্ছা — বল দিকি? লোকে মন্দিরে কেন যায়?

কেন যায় আবার? বদ্যিনাথ নাকি সকলের অসুখ-বিসুখ ভালো করে দেন। তাছাড়া মন্দিরের গলিতে খুব ভালো ক্ষীরের প্যাঁড়া পাওয়া যায়। তাই কিনতেও যায় অনেকে।

তুই বদ্যিনাথের প্যাঁড়া খাস?

পেলেই খাই — বলতে বলতে আমার জিভে জল এসে গেল — না পেলেও খেতে ইচ্ছে করে। যেমন বড় বড়, তেমনি খেতে খাসা।

হুঁ বদ্যিনাথের প্যাঁড়া। খেতে খাসা। না পেলেও খেতে ইচ্ছে করে। — ভোম্বলদা আবার কথাগুলো আউড়ে নিলে — বল দিকি, আর কী খেতে ভালো লাগে ওখানে?

কেন, আতা? যেন রাবড়ি। তাই দিয়ে আবার ফার্স্টকেলাস পায়েস হয়? বলতে গিয়ে আবার আমার জিভে জল এল। ভোম্বলদা লেবেনচুসটা গালে নিয়ে খানিকক্ষণ ভাম হয়ে বসে রইল। — যেন আমারই মতো সে মনে মনে আতার পায়েস খাচ্ছিল। একটু সামলে-টামলে নিয়ে ভোম্বলদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

থাকগে, খাওয়ার কথা ছেড়ে দে। মন উদাস হয়ে যাচ্ছে।

মন আমারও উদাস হচ্ছিল। বড় মামীমার তৈরি পায়েসের গন্ধ যেন এই চলতি ট্যাক্সিতেই নাকে ভেসে আসছিল আমার।

ভোম্বলদা লেবেনচুসটার শেষ অংশটুকু কুড়মুড় করে চিবোতে লাগল। তারপর বললে, আচ্ছা এবারে বরং একটু প্রকৃতি-ট্রকৃতির কথা জিজ্ঞেস করা যাক। বল্ তো, দেওঘরে নদী আছে কিনা?

আলবাৎ আছে। ধারোয়া।

কী নাম বললি?

কেন, ধারোয়া— ভোম্বলদার অবিশ্বাসে আমার রাগ হয়ে গেল— কক্ষনো আমার ভুল হয়নি. আরও তিনবার আমি গেছি না ওখানে? কত বেড়িয়েছি ধারোয়ার বালির ওপর দিয়ে। এই তো একটুখানি জল— হেঁটে পার হওয়া যায়, ছোট ছোট মাছ চিকচিক করছে। তার ব্রীজের উপর দিয়েই তো জসিডি যাওয়ার রাস্তা।

কোথায় যাবার?

কেন? জসিডি।

হুঁ, ঠিক বলেছিল। — ভোম্বলদা তেমনি আউড়ে যেতে লাগল — নদীর নাম ধারোয়া। বালির উপর দিয়ে বেড়ানো যায়। অল্প জল, মাঝ চিকচিক করে। তার ব্রীজের ওপর দিয়ে জসিডি যাওয়ার রাস্তা। হুঁ।

হুঁ কি আবার? ঠিক বলিনি?

তাই তো মনে হচ্ছে। — ভোম্বলদা বললে, তুই যে সত্যিই দেওঘরে গেছিস তাতে আর সন্দেহ নেই। — বলেই ধাঁই করে বেমক্কা আমার পিঠে একটা চাঁটি বসিয়ে দিলে। বেশ জোরেই লাগল, কিন্তু এতক্ষণে ভোম্বলদাকে বিশ্বাস করাতে পেরেছি ভেবে আমি ওটুকু সহ্য করে গেলুম।

ভোম্বলদা বললে, তুই দেখছি বাহাদুর ছেলে। খুব ভালো মেমারি তোর। আচ্ছা, ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন— মানে আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। বল্ দেখি, দেওঘরে পাহাড় আছে কিনা?

বা — রে, পাহাড়েরই তো জায়গা।

হুম, দুটো একটা পাহাড়ের নাম কর।

কেন, নন্দন পাহাড়? সে তো শহরের ভেতরেই। সেখানেই তো জলের ট্যাঙ্ক, আর ক'টা মন্দির। তারপরে তপোবনের পাহাড় আছে, ছোট্ট, খুব সুন্দর। আর সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ত্রিকুট— তেরো মাইল দূরে।

ঠিক। — ভোম্বলদা মাথা নাড়ল ঃ নন্দন পাহাড়, ক'টামন্দির আর জলের ট্যাঙ্ক। তপোবনের পাহাড় — ছোট্ট, খুব সুন্দর। আর কী বললি?

বাঃ। ত্রিকূট।

হুঁ ত্রিকূট। কত বড়!

বিরাট। তাতে ত্রিকুটেশ্বর শিবের মন্দির, সেখান থেকে একেবারে ওপরে উঠতে প্রায় দু'ঘন্টা লাগে। — সবজান্তার মেজাজ নিয়ে আমি বক্ বক্ করতে লাগলুম— তবে তার প্রায় সবটাই ঘন জঙ্গল— ভালুক-টালুকও নাকি আছে। তবে মন্দিরের দিকটা ও-সব কিছু নেই, খালি বাঁদর আছে বিস্তর।

হুঁ, বাঁদর। তোরই দলের, কী বলিস? ভোম্বলদা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল।

আমার বিরক্ত লাগল এবার। চুপ করে রইলুম।

ট্যাক্সি এতক্ষণে হাওড়া স্টেশনে এসে গিয়েছিল। দুজনেই নেমে পড়লুম, ট্যাক্সির ভাড়াটাও মিটিয়ে দিলুম আমি। তখন হঠাৎ ভোম্বলদা বললে, চলি তা হলে প্যালা, টা-টা—

আমি বললুম, টা-টা আবার কেন? এক ট্রেনে তো যাব; একসঙ্গেই যাচ্ছি।

ভোম্বলদা মুখ ব্যাজার করে বললে, ট্রেনে যেতে বয়ে গেছে আমার। পরশু টেস্ট পরীক্ষা না? আমি বাড়ি ফিরছি।

সেকি! তোমার ফুলু পিসীর বিয়েতে যাবে না?

কে ফুলু পিসী? — যেন মুখের সামনে থেকে মাছি তাড়াচ্ছে, এই ভাবেই কথাটা উড়িয়ে দিলে ভোম্বলদা— কোনও পিসীই নেই আমার। এক মাসী আছে, সে তো থাকে শ্যামবাজারে।

তা হলে তুমি দেওঘরে —

কে যেতে যাচ্ছে দেওঘরে। এদিকে চুঁচড়ো, ওদিকে কাঁচরাপাড়া, এরবাইরে কোথাও আমি পা-ই বাড়াইনি।

আমার কিরকম ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল। কিচ্ছু বুঝতে পারলুম না। সুটকেস হাতে আর বিছানা বগলে নিয়ে আমি ভোম্বলদার দিকে চেয়ে রইলুম।

ভোম্বলদা বললে অমন ড্যাব করে চেয়ে আছিস কেন গরুর মতো? এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছিস না? পরশু থেকে টেস্ট পরীক্ষা আরম্ভ— ক্লাসের ছেলেরা বলছিল, বাংলায় নির্ঘাৎ এবার 'এসে' আসবে ভ্রমণকাহিনী। আমার ভ্রমণ তো চুঁচড়ো পর্যন্ত— সে কাহিনী লিখলে কুড়ির মধ্যে ঠিক পাঁচ দেবে, তিন-টিনও দিতে পারে।

আমি ঠিক তেমনি তাকিয়ে রইলুম। বেশ বুঝতে পারছিলুম মুখটা হাঁ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। মুচকে হেসে ভোম্বলদা বললে তাই কায়দা করে তোর কাছ থেকে দেওঘর ভ্রমণ শুনে নিলুম। বেশ মজা করে ট্যাক্সিতে বেড়ানোও গেল খানিকটা। তুই দেখিস প্যালা— 'এসে'-তে এবার অন্তত বারো মেরে দেবে। বামপাস টাউন, বিলাসী টাউন, আতার পায়েস, ক্ষীরের প্যাঁড়া, ধারোয়া নদীর জল, চিকচিকে মাছ, নন্দন পাহাড়, ত্রিকূটের বানর— কিচ্ছুটি বাদ যাবে না। থ্যাংক ইউ ভেরি ম্যাচ— আর এই নে তোর রিওয়ার্ড—

এই বলে, আমার হাঁ করা মুখের ভেতরে একটা লেবেনচুস গুঁজে দিয়ে ছিট্‌কে চলে গেল সামনে থেকে আর তিড়িং করে নীল রঙের দোতলা বাসটায় লাফিয়ে উঠল।

সিনেমা-নায়কের আত্মকথা

পরিমল গোস্বামী

চেহারাটা ভাল ছিল, তাহারই জোরে সিনেমায় ঢুকিয়া পড়িলাম। সিনেমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, এবং শুনিলাম অভিজ্ঞতার কোন প্রয়োজনই নাই। পরিচালক আমার চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিলেন, এই একটি ব্যবসা যাতে অভিজ্ঞতা লাগে না ; আমি পরিচালক, আমি শপথ করে বলছি, আমিও সিনেমার কিছুই জানি না ; অথচ ত্রিশখানা ছবি আমি তৈরি করেছি!

দ্বিতীয় দিন হইতেই লাগিয়া গেলাম। শুনিলাম, তিন দিন পরেই ছবি তোলা আরম্ভ হইবে। গল্পের নাম তখনও ঠিক হয় নাই, এবং আরও জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, গল্পই ঠিক হয় নাই। তাহারও পরে শুনিলাম, এ সব কিছুরই প্রয়োজন হয় না, কোনওরকমে আরম্ভ করিতে পারলেই হইল।

পরিচালক আমাকে বলিয়া দিলেন, মনে কর, তোমার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু তোমার শ্বশুর বিয়ের সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা না দিতে পারায় তোমার পিতা তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু তুমি তোমার স্ত্রীর প্রতি অবিচার করতে চাও না, অথচ পিতার ভয়ে স্ত্রীকে ঘরেও আনতে পার না। এই অবস্থায় তুমি দার্জিলিঙে বসে বিরহ উপভোগ করছ। প্রথম দৃশ্যে এই ঘটনাটা দেখাতে হবে। এইটে আজ রাত্রে বাড়ি বসে চিন্তা করে কাল আসবে, ঠিক হয়ে গেলে কাল থেকেই শুটিং আরম্ভ করা যাবে।

বাড়ি আসিয়া একটি দিন ভাবিলাম। আর সবই ঠিক হইল, কিন্তু বিরহ হইয়াছে কি করিয়া বুঝাইব? যত সহজ মনে করিয়াছিলাম, ব্যাপারটি তত সহজ নয়। বৈশাখ মাস, কলিকাতায় বসিয়া দার্জিলিঙের পোশাক পরিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল পরিত্যক্ত স্ত্রীর কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। দশ মিনিটের মধ্যেই চোখে এবং সর্বাঙ্গে জল দেখা দিল, কিন্তু দর্শক ইহাকে ঠিক বিরহ বলিয়া বুঝিতে পারিবে কি?

পরিচালককে টেলিফোন করিয়া সব বলিলাম। তিনি চোখে জল দেখা দিয়াছে শুনিয়া বলিলেন, এক্সলেন্ট! বারো আনা হয়েছে, আর চার আনা বাকি ; একটা কিছু অ্যাক্‌শন দেখাও, তা হ'লেই ঠিক হবে।

কি অ্যাক্‌শন দেখাব?

অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে ছটফট কর, চেয়ার কাত করে ফেল, বিছানা ছেঁড়ো, টেবিল ভাঙো, বিরহের কবিতা আবৃত্তি কর।

খুব উৎসাহিত হইয়া পরিচালকের নির্দেশমত সবই করিলাম। টেবিল ইত্যাদি ভাঙিয়া গলদঘর্ম হইয়া বিরহের কবিতা আবৃত্তি করিতেছি, এমন সময় স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীকে দেখিয়া সিনেমা-ভূতও ঘাড় হইতে যেন হঠাৎ

নামিয়া গেল। সেই অবসরে চাহিয়া দেখি, যাহা কিছু ভাঙিয়াছি এবং ছিঁড়িয়াছি সমস্তই আমার নিজের। চেয়ার টেবিল বিছানা— সব। স্ত্রীকে এরকম জোর করিয়াই ঘর হইতে বাহির করিয় দিলাম।

শুধু বলিলাম, আমি পাগল হই নি, যা করেছি ঘন্টাখানেক পরে সব বুঝিয়ে দেব।

কিন্তু স্ত্রী বাহির হইয়াই আবার ফিরিয়া আসিল এবং বলিল, আমি ঘর থেকে যাব না। — বলিয়াই সে আমাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং আমার চোখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে চাহিয়া গা হইতে ওভারকোটটা খুলিয়া ঘাম মুছাইতে লাগিল।

এমন সময় টেলিফোন —

হ্যালো কে? পরিচালক মশাই? কবিতা নয় গান গাইতে হবে? গানের সুর ওখানে তৈরি হচ্ছে? এখনই আসব? তবে কি করব? আমি টেবিল চেয়ার এবং আলমারির মাথায় আমার কল্পিত স্ত্রীর ধরতে চেষ্টা করবে? পরে কৌশল আমার স্ত্রী ছায়ামূর্তি ঐখানে বসিয়ে দেবেন? আপাতত কিন্তু ছায়ামূর্তি নয় স্বয়ং স্ত্রীর আমার পাশে, এবং তিনিই আমাকে ধরে বসে আছেন। কিন্তু আপনাকে জানানো দরকার যে আমার টেবিল নেই, চেয়ার নেই, বিছানা নেই, আলমারিও নেই। কি হল জিজ্ঞাসা করছেন? এইমাত্র আপনার নির্দেশমত চেয়ার ভেঙেছি, টেবিল ভেঙেছি, বিছানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছি। হ্যাঁ, দুঃখের বিষয় তা আমিও স্বীকার করছি। আচ্ছা, স্টুডিওতেই যাচ্ছি ; এখুনি।'

স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি খানিকটা বুঝাইয়া শান্ত করিলাম, তা ছাড়া টেলিফোনের আলাপ শুনিয়া আমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কাজেই সহজেই নিষ্কৃতি পাইলাম।

স্টুডিওতে গেলাম। কিছুক্ষণ পরেই রিহার্সাল এবং ছবি-তোলা একসঙ্গে আরম্ভ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সমস্ত গল্পটা আগে জানতে পারলে ভাল হয় না? বিরহ সিনটা তো হয়ে গেল।

পরিচালক বলিলেন, সে সময় নেই। আর গল্পটা কি আমিই জানি? এক একটা সিন তুলছি আর ভেবে নিচ্ছি এর পর কি হওয়া উচিত। একেই অভিজ্ঞতা বসে সার্।

তা এর পরের সিনটা ভেবেছেন?

ভেবেছি বইকি। এর পর নায়ক বিরহ সহ্য করতে না পেরে নিজের উপর প্রতিশোধ নিতে থাকবে, শুধু নিজের উপর নয়, গোষ্ঠীর উপর!

কি করে নেবে?

প্রথমেই নায়ক তার বাবার ক্যাশ ভাঙতে, এবং টাকা নিয়ে সোজা যাবে মদের দোকানে। সেখানে বসে বসে মদ খাবে। তারপর একখানা ট্যাক্সিতে যাবে রামবাগানে। সেখানে সে পটলী নামক এক নর্তকীর গৃহে উঠবে ; এখানেও বসে বসে মদ খাবে। পাশে পটলীর দল নাচবে, এবং নাচতে নাচতে নায়কের গায়ে মাঝে মাঝে ঢলে পড়বে ; কিন্তু নায়ক তা গ্রাহ্য করবে না। প্রথম দিন তার এইভাবে কাটবে। দ্বিতীয় দিন থেকেই সে নিজে

নর্তকীর সঙ্গে নাচতে শুরু করবে। এইভাবে ধীরে ধীরে তিন চার দিনের মধ্যে তার অধঃপতন প্রায় পুরো হবে।

আচ্ছা, মদ না খেয়ে, রামবাগানে না যেয়ে অন্য উপায়ে অধঃপতন হতে পারে না?

পারে, তাড়ি খেয়ে এবং সোনাগাছি যেয়ে।

তা হলে খাওয়া এবং যাওয়াটা ঠিক রাখতেই হবে?

পরিচালক খুব খানিকটা হাসিয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, ছোকরা, চরিত্র বাঁচিয়ে অধঃপতন দেখাবার আর কোনও উপায় নেই।

পরিচালক ইতিপূর্বেই আমাকে 'সার্' বলিয়াছিলেন, এইভার ছোকরা বলিলেন। তাহাতে আপত্তি নেই, কিন্তু চরিত্র বাঁচানো সম্বন্ধে এই উক্তিটি আমার ভাল লাগিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু দর্শক রামবাগানের দৃশ্য দেখবে কেন?

দেখবে কেন! পরিচালক বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এদেশে সিনেমা যদি চলে তবে ঐ জন্যেই চলবে।

ইহার পর আর কোনও কথা চলে না। রিহার্সাল শুরু হইল। আমি ক্যাশ ভাঙিয়া প্রথমত মদের দোকানে এবং পরে রামবাগানে পটলীর বাড়ি বসিয়া মদ খাইলাম। তারপর নর্তকীদের সঙ্গে নাচিতে লাগিলাম।

এ দৃশ্যও তোলা শেষ হইল। তারপর গল্পটা এইভাবে অগ্রসর হইয়া চলিল।

টাকা যত ফুরায়, আমার মদ খাইবার প্রবৃত্তি দিন দিন ততই বাড়িতে থাকে। শেষে যখন হাতে একটি পয়সাও নাই, তখন নেশা ছুটিয়া যায়। ইতিমধ্যে পটলী তাহার মনপ্রাণ আমাকে সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। সে আমাকে কিছুতে ছাড়িবে না। আমি বলি, আমার হাতে টাকা নেই। সে বলে, তা হোক, তোমায় আমি ছাড়ব না। আমি বলি, তা হয় না, আমার পৌরুষে বাধে, তা ছাড়া খাব কি? পটলী বলে, আমি খাওয়াব, আমার টাকা আছে। আমি বলি, সে আমি কিছুতে নেব না, আমাকে যেতেই হবে। নিরুপায় পটলী মুখ-খিস্তী করিয়া বলে, শালা ছোটলোক! — আমি পথে বাহির হইয়া পড়ি।

উত্তেজিত অবস্থায় পথ চলিতে যাহার সঙ্গে ধাক্কা লাগে, সেই বলে, শালা ছোটলোক! আমার বিকৃত চেহারা যে দেখে সেই মন্তব্য করে, শালা ছোটলোক!

হাতে টাকা নাই, বাড়ি ফিরিয়া ক্যাশ ভাঙিবার উপায় নাই, সুতরাং যেখানে সেখানে চুরি করিতে আরম্ভ করিলাম। চুরি করিতে করিতে হাত পাকিল। দুই চারি টাকা যাহা পাই তাহাই লইয়া পটলীর কাছে ফিরিয়া যাই। এখন সেই আমার সব। আগে মাঝে মাঝে স্ত্রীর কথা মনে পড়িত এখন আর পড়ে না। এখন একমাত্র চিন্তা কি করিয়া টাকা সংগ্রহ করি। শেষ পর্যন্ত খুন করিতে আরম্ভ করিলাম। এইভাবের ছবির প্রায় দশটি দৃশ্য তোলা শেষ হইল। তখন পরিচালককে বলিলাম, গল্পের শেষ হবে কোথায়?

পরিচালক বলিলেন, তা কি করে বলি? যা আরম্ভ করেছ এর চূড়ান্ত কর, তারপর একটা 'স্টান্ট' পেরে সব ঠিক করে নেব।

কিন্তু গল্পের খেই হারিয়ে যাচ্ছে। খুনজখম বোধহয় এখন থামানো উচিত।

পরিচালক রুষ্ট হইয়া বলিলেন, সে তোমাকে ভাবতে হবে না ; কিন্তু এ পর্যন্ত যা হয়েছে তার মধ্যে তিনটে সীন রি-টেক করতে হবে।

কেন?

ভুল হয়ে গেছে। তিনটে সীনে তোমার গান গাওয়া উচিত ছিল। সব সীনে গান আছে, কেবল শেষ তিনটেয় নেই।

গান গাইবার অবসর কোথায়?

সে ভাবতে হবে না। ঘরে বসে একটা, পথে যেতে যেতে একটা, আর একটা খুন করবার আগে।

গান ঠিক হয়েছে?

হ্যাঁ, একটা ভাটিয়ালী, একটা গজল, আর একটা কীর্তন। গান না থাকায় তিনটে সীন হেভি হয়ে গেছে। তিন-তিনটে মার্ডার, একটাও গান নেই — এ হতে পারে না, রিলীফ চাই।

সীন তিনটি পুনরায় তোলা হইল। তারপর একাদশ দৃশ্যে আমি একটি বাড়িতে গভীর রাত্রে চুরি করতে ঢুকিলাম। চুপে চুপে প্রাচীর টপকাইয়া খোলা জানালা দিয়া একটা ঘরে লাফাইয়া পড়িতেই দেখি, একটি মহিলা সেই ঘরে একা ঘুমাইয়া আছেন। পাশে টেব্‌ল-ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, তাহারই আলো দেখিলাম, তাঁহার গলায় সোনার চেন, হাতে সোনার চুড়ি।

অতি সাবধানে তাঁহার কাছে গেলাম। কাছে গিয়া গলা টিপিয়া ধরিব, এমন সময় মহিলাটি হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া আমাকে উক্ত অবস্থায় দেখিয়াই বলিলেন, শালা ছোটলোক! আমি চমকিয়া উঠিলাম। মহিলাটি উঠিয়াই বসিয়া বলিল, চুরি করতে এসেছ, লজ্জা করে না?

আমি কাতরভাবে বলিলাম, আমাকে মাপ করুন।

মহিলা বলিলেন, বুঝেছি, তুমি আমারই মত হতভাগ্য। মাপ চাইতে হবে না, ব'স।

বসিলাম। তখন মহিলাটি চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার জন্যে?

আমি মাথাটা নীচু করিয়া লজ্জিতভাবে বলিলাম, পটলীর জন্যে।

কারু জন্যে কিছু করতে হবে না, তুমি আমার কাছে থাক।

তা হলে পটলী বাঁচবে না।

মরুক গে, আমি তো আছি।

না না, সে হয় না, আমাকে যেতেই হবে, আমাকে কিছু টাকা দাও।

টাকা? এই নাও — বলিয়া বালিশের নীচে হইতে দশখানা একশো টাকার নোট বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। তারপর বলিলেন, নিতান্তই যাবে?

নিতান্তই যাব।

তবে একখানা গান গেয়ে যাও, বেশ ভাল একখানা আধুনিক গান।

গান করিলাম। তারপর বিদায়। যাইবার সময় মহিলা চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, শালা ছোটলোক।

একটা সীন এইখানে শেষ হইল। পরিচালককে তখন বলিলাম, এক কাজ করুন, এই মহিলাটি হোক আমার পরিত্যক্ত স্ত্রী ; তা হলে বেশ গল্প বেশ জমবে।

পরিচালক বলিলেন, ওসব শস্তা ব্যাপারে আমি নেই। গল্প এমনিতেই বেশ জমে উঠেছে।

পরের দৃশ্যে সোজা পটলীর বাড়ি গিয়া উঠিলাম। পটলী আমাকে পাইয়া আনন্দে গান ধরিয়া দিল। আমি বলিলাম, পটলী আমাদের দুঃখ ঘুচল, নে তোর কত টাকা চাই। — বলিয়া এক হাজার টাকা তাহার পায়ের কাছে রাখিলাম। পটলী টাকা দেখিয়া প্রথমত অবাক হইল, তারপর কাঁদিতে লাগিল।

তারপর, আমার কপাল পুড়েছে রে — আমার কপাল পুড়েছে, যেন আমি টাকাই চাই যে — টাকাই চাই। — বলিতে বলিতে নোটগুলি লইয়া উনুনে নিক্ষেপ করিল। আমি বলিলাম, ও কর কি? পটলী বলিল, চাই না টাকা, আমি তোকে চাই।

এই অসম্ভব ব্যাপারটির প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু পরিচালক বলিলেন, এই সীনটাই হবে গিয়ে হিট্-সীন, দর্শকের হাততালিতে ঘর ফাটবে।

কিছুক্ষণ পরেই, অর্থাৎ পরবর্তী দৃশ্যে আমাকে যিনি হাজার টাকা দিয়াছিলেন, সেই মহিলা হঠাৎ ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ধরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, পারলাম না থাকতে, তাই এলাম।

আমাকে তিনি লইয়া যাইতে চান। পটলী তাহা শুনিয়া মহিলাকে মারিতে আরম্ভ করিল। মহিলাও পটলীর চুল ধরিয়া চিৎ করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, হয় ওঁকে দে, না হয় আমার টাকা দে।

পটলীর পক্ষে দুইটির একটিও দেওয়া সম্ভব নহে। অগত্যা মহিলাটি পটলীর বাড়িতে অনশনব্রত গ্রহণ করিলেন।

ইতিমধ্যে আমি হঠাৎ সংবাদ পাইলাম, আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে এবং আমার স্ত্রী আমার বাড়িতে আসিয়া তাহার অধিকার বিস্তার করিয়াছে।

এই অবস্থায় পরিচালককে বলিলাম, আমার কি করা উচিত সে তো ভেবেই পাচ্ছি না ; গল্প কি আরও চলবে?

না প্রায় শেষ হয়ে এল। এইবার তুমি সর্বাঙ্গে প্রবল ব্যথা অনুভব করতে থাক, ছটফট কর, আর্তনাদ করতে থাকে। তারপর —

আমি প্রবল ব্যথায় আর্তনাদ করিতে করিতে পটলী ও মহিলাকে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলাম। কোথায় যাইতেছি কিছু ঠিক নেই। ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আমি চিৎকার করিতেছি, কাঁদিতেছি, আর মাঝে মাঝে পরিচালকের দিকে

তাকাইতেছি। পরিচালক ক্রমাগত অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারা সম্মুখে চলিতে বলিতেছেন। চলিতে চলিতে একটা বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। তখন পরিচালক নিজে সেই মাঠে শুইয়া কিভাবে ব্যথায় হাত পা খিঁচাইতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিলেন, আমি তাহাই অনুকরণ করিতে লাগিলাম। প্রায় দশ মিনিট এইভাবে আর্তনাদ করিবার পর হঠাৎই আমার মুখ হইতে বন্দুকের টোটার মত কি একটা বাহির হইয়া আসিল, তৎক্ষণাৎ আমার ব্যথা কমিয়া গেল। অত্যন্ত আরাম অনুভব করিয়া উঠিয়া সে আমার বিবেক। নাম, বিবেকানন্দ। চেহারাও অনেকটা স্বামী বিবেকানন্দই মতই।

সে প্রথমেই বলিল, শালা ছোটলোক, তুই তোর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিল। তুই পটলীর প্রতি আসক্ত, তুই আর একটি মহিলার সর্বনাশ করতে যাচ্ছিস, তা ছাড়া এতদিন চুরি জোচ্চরি যা করেছিস, তা আর উল্লেখ করতে চাই না।

স্বামীজি, পটলী আমাকে ভালবাসে, স্ত্রীকে আমি চিনি না। তা ছাড়া, মহিলাটি আমার বন্ধু, এদের ছাড়ি কি করে?

স্বামীজি বলিল, সব ছেড়ে এখুনি বাড়ি চল।

আমি কহিলাম, এখুনি যাচ্ছি।

পরের দৃশ্য স্বামী-স্ত্রীর মিলনদৃশ্য। আমরা হাত ধরাধরি করিয়া সংসার-পথে চলিতেছি। এই দৃশ্যে কোনও অ্যাকশন না থাকাতে একটা ভিখারী একটা দেহতত্ত্বের গান গাহিতে গাহিতে আমাদের সঙ্গে চলিতেছে, সুতরাং সামান্য অ্যাকশন যাহা দেখানো যাইত দেহতত্ত্বের সুর মর্মে প্রবেশ করাতে তাহার আর সুযোগ পাওয়া গেল না।

এত বড় জটিল জাল সৃষ্টি করিয়া পরিচালক বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতায় তাহা এত সহজে কাটিয়া গল্পের যে আশ্চর্য পরিণতি দেখাইলেন, তাহাতে আমি পরিচালককে পরদিনই একটি সোনার মেডেল দিলাম। ইহার পর আর সিনেমায় অভিনয় করি নাই।

পূজা কনসেশন

প্রবোধকুমার সান্যাল

পূজার ছুটিতে হরিহরবাবু বিদেশে বেড়াতে যাবেন। আশি টাকার কেরানি, বিদেশে বড় একটা যাওয়া ঘটে না, — এত বড় সংসার, অতগুলি কাচ্চা বাচ্চা। তবু পূজো কনসেশন, সস্তায় টিকিট, হরিহরবাবু স্থির করলেন, বাবা বৈদ্যনাথ দর্শন করতে যাবেন। বড়বাবুকে ধরে, সাহেবকে ধরে পনের দিনের ছুটি পাওয়া গেল। যাবার অন্তত সাতদিন আগে থেকে তোড়জোড়। যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, পরিচিত— সকলের কাছে চিঠি গেল। পাড়ার মুদির দোকান, কিনু স্যাকরা, কয়লাওয়ালা, ভৃগু পরামাণিক, নটবর ধোবা— ইত্যাদি সবাই জেনে গেল, হরিহরবাবু বিদেশে যাবেন। সাতদিন আগে থেকে হরিহরের ঘুম নেই, স্নানাহারের সময় নেই। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বচসা, বাড়ির লোকের সঙ্গে বিবাদ, গিন্নির সঙ্গে মনোমালিন্য— তার কারণ তারা নাকি এতবড় একটা কাণ্ড-কারখানার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না।

তিনি বললেন, কোন দিক সামলাই? আমি এত পেরে উঠব কেমন করে?

গিন্নি বললেন, কিসের এত হুড়োহুড়ি? এখনও ত অনেক দেরি!

দেরি! তোমার আর কি বল, আমার যে প্রাণ যায়। এত কেনাকাটা কে করবে?

কিসের কেনাকাটা?

শোনো কথা! — বলে হরিহরবাবু মেঝের উপর বসে পড়লেন। তিনি একে মোটা মানুষ, এতবড় ভুঁড়ি, গত বছরে অসুখ থেকে উঠেছেন, তার উপরে এই পরিশ্রম। মেয়েমানুষ, ওরা কি জানে, কতটুকু ওরা বোঝে, ওদের সাধ্য কতটুকু? যা করে সবই ত এই শর্মা! হরিহরবাবু বললেন, তোমার মতন কুড়ে হলে আর রেলগাড়িতে উঠতে হচ্ছে না। এই বলে আবার তিনি ছুটলেন।

পথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে চললেন। চীনাবাজার থেকে ছেলেমেয়ের জুতা, হাওড়ার হাট থেকে সস্তায় কাপড়, মুর্গিহাটা থেকে গায়ের জামা, চাঁদনি থেকে দু খানা বিলেতি কম্বল। মোট ঘাট, বাজার, চুপড়ি চ্যাঙারি— সবসুদ্ধ প্রকাণ্ড এক বস্তা তিনি এনে হাজির করলেন। বিদেশে বিভুঁয়ে যাবেন, সেখানে হয়ত ডাক্তার বৈদ্য নেই, হয়ত রাত-বিরাতে কোনও বিপদ ঘটতে পারে, এজন্য তিনি ঔষধপত্র কিনতে সুরু করলেন। জ্বরের জন্য কুইনিন, আমাশয়ে ক্লোরোডাইন, কলেরায় ক্যাম্ফর, সর্দির ইউক্যালিপ্টস-অয়েল, কাসির তালের মিছরি, কাটা-ছড়ার টিনচার-আইডিন, ঘায়ের বোরোফ্যাক্স, জামবাক ইত্যাদি। রাত্রে পথে বেরোবার জন্য একটা টর্চ-লাইট।

সেখানে গিয়ে একটা সংসার পাততে হবে তা মনে আছে? — হরিহর বললেন।

গিন্নি বললেন— সে তা হবেই।

তবে চুপ করে আছ কেন? আচ্ছা, তোমার কি একটুও দুশ্চিন্তা হচ্ছে না? জানো, সেই অজানা দেশে হয়ত কিছু পাওয়া যাবে না?

সে তখন দেখা যাবে। — বলে গিন্নি চলে গেলেন।

পরিশ্রমে হরিহর ঘর্মাক্ত, তবু তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না।

ঠনঠনে থেকে তিনি এক প্রকাণ্ড চট কিনে আনলেন, তার সঙ্গে আনলেন একটা আমকাঠের বাক্স। তার মধ্যে থালা, বাটি, ঘটি, গেলাস, কড়া খুন্তি, হাতা, বেড়ি, চাটু, হাঁড়ি, গামলা, ডেকচি— সব পুরলেন। সাহায্য করবার কেউ নেই, একাই সব করতে হল। এদিকে তেলের বাটি, নুনের কেঁড়ে, মশলার কৌটা, ঘিয়ের শিশি, শিল-নোড়া, চাকী-বেলুন, বঁটি-কাটারি— সব ঢোকালেন। অতদূর—বিদেশে চাল ভাল পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, সুতরাং তেল-ঘি-নুন-চাল-ডাল-হলুদ প্রভৃতি সমস্তই তিনি কিনে আনলেন। কারও কথা তিনি শুনতে রাজি নন, বিদেশের অভিজ্ঞতা বাড়ির কারও নেই। এখন সবাই মুখটিপে হাসছে বটে, কিন্তু সেই দুর্দিনে এইসব বড়ই মিষ্ঠি লাগবে, একসময় তিনি গলা বাড়িয়ে বললেন, বলি শুনছ, ছোট ছেলেটার জন্যে কিছু দুধ নিতে হবে, সে দেশে হয়ত গরু নেই।

গিন্নি বললেন, গরু একটা এখান থেকে নিয়ে গেলে হয় না?

বলেছ ঠিক। — হরিহরবাবু মাথা নাড়ালেন। যাই স্টেশনে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করে আসি। বলেছ তুমি ঠিক। — তিনি গভীর চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পাড়ার লোক ডেকে বললে, হরিহরবাবু আপনার যাওয়া কি তবে ঠিক?

হরিহর বললেন, বাবা বদ্যিনাথের ইচ্ছে, আমার ত চেষ্টার ত্রুটি নেই।

কাল রাতে আপনার বাড়িতে অত গোলামাল হচ্ছিল কেন!

আরে ভাই এতবড় ব্যাপার কারও গা নেই। রাতজেগে আমি জিনিসপত্তর গোছাচ্ছিলুম।

আপনার বাড়িতে কারা এসেছিল?

হরিহর বললেন, ওঃ তা বটে। এসেছিল আমার দুই শালা, বড় ভায়রাভাই, আর আমার ভাগ্নে। তাদের ডেকেছিলুম চিঠি লিখে, ওরা সবাই সামনে এসে না দাঁড়ালে আমি এত পেরে উঠব কেন।

পাড়ার লোক বললে, আপনারা কজন যাবেন?

আমি, আমার স্ত্রী আর তিনটি ছেলেমেয়ে। আচ্ছা দেখুন বিনয়বাবু আপনি একবার আসুন তো আমার ঘরে। আমার মাথা আর ঠিক নেই, দেখে যান তো আর কিছু দরকার লাগতে পারে কিনা?

বিনয়বাবু এসে দাঁড়ালেন। বললেন, সবই হয়েছে, বিছানা কিছু কম।

ওই শোনো, ওগো, কোথা গেলে? আমি তখনই বললুম। ঠিক ঠিক, সামনে অক্টোবর মাস, বটেই ত!

সেদিন সমস্তদিন হরিহর বিছানাপত্র গোছালেন। লেপ চারটে, বালিশ এগারোটা, কাঁথা ছ খানা, মাদুর তিনটে, তোষক পাঁচখানা, চাদর সাতখানা, সতরঞ্চি তিনখানা। এত বিছানা তাঁর নিজের ছিল না। শালা শালী, বড়বোন, মাসতুতো ভাই, মামা, পাশের বাড়ির বড় বৌ, বিনয়বাবুর স্ত্রী — সকলের কাছে পনেরো দিনের কড়ারে বিছানাগুলি ধার করে এনে তিনি এক জায়গায় স্তূপাকার করলেন। জিনিসপত্র, মোট-ঘাট, পোঁটলা-পুঁটলি, চুপড়ি-চ্যাঙারি প্রভৃতিতে তাঁর শোবার ঘর বোঝাই হয়ে উঠল। রাত্রে ছেলেমেয়ে, স্ত্রীও নিজে ঘরে আর শোবার জায়গায় পেলেন না, সকলকে বাইরে শুইয়ে দু দিন রাত কাটাতে হল। প্রথম শরৎকালের গুমোট, সুতরাং ঘরের ভিতরকার ঠাসাঠাসি জিনিসপত্রে আরশোলা, পিঁপড়ে, মাকড়সা, বিছে ইত্যাদির উৎপাতে দুদিন আগে থেকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা কঠিন হয়ে উঠল। নীচের দালান থেকে উপরের ঘর পর্যন্ত অসংখ্য পুঁটলি, বস্তা, বাক্স, তোরঙ্গ, ব্যাগ, বিছানা মোটঘাট— ইত্যাদিতেই আর পা বাড়াবার ঠাঁই রইল না। গরুর গাড়ি না হলে এত জিনিসপত্র স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে না। অবশেষে হরিহরবাবু দুখানা গরুর গাড়ি বন্দোবস্ত করবার জন্য বেরুলেন।

ফিরে যখন এলেন দেখা গেল, আবার তাঁর সঙ্গে একগাড়ি জিনিসপত্র। সেই অজানা দেশে হয় ত খাবার জল পাওয়া যায় না, সুতরাং প্রকাণ্ড দুটো ট্যাঙ্ক এল। বড় একটিন কেরোসিন তেল, চোর ডাকাত তাড়াবার চারটে বড় বড় লাঠি, ছটা হারিকেন লণ্ঠন, তিনটে আলিগড়ের তালাচাবি, পাঁচটা বালতি, একরাশ খাম, পোস্টকার্ড-ডাকটিকিট, হিসাবের বড় একখানা জাবেদা খাতা, গোটাকয়েক হুঁকো-কলকে-তামাক-টিকে, একরাশি দড়ি,— এমনি আরও কত কি। ধামা, চ্যাঙারি, থলে, বাক্স, ব্যাগ সমস্তই একে একে বোঝাই হয়ে উঠল।

পাড়ার বড় বৌ হরিহরের স্ত্রীকে ডেকে বললেন, এত জিনিসপত্র নিয়ে আপনারা কত দূরে যাবেন বৌদিদি?

হরিহরের স্ত্রী হেসে বললেন, বিলেত!

অবশেষে যাবার দিন এল। বেলা বারোটায় ট্রেন, কিন্তু আগের রাত্রে হরিহর ঘুমালেন না। কেবল তাই নয়, পরদিন ভোরে জিনিসপত্র বাঁধা ছাঁদা করার ভয় দেখিয়ে তিনি স্ত্রীকে জেগে থাকতে বললেন। ছেলেমেয়েদের চিমটি কেটে তিন শেষরাত্রে ওঠালেন। গোলমাল ও চিৎকারে পাড়ার লোক সে রাত্রে জেগে কাটাল। ভোরবেলায় একদল মুটে দুখানা গরুর গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। সকালবেলা নানাদিক থেকে আত্মীয়-স্বজন তাঁর দরজায় উপস্থিত। পাড়ার লোক দল বেঁধে সারি সারি উপরের জানালায় ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেল।

সকালবেলা আহারাদির ব্যবস্থা যেমন-তেমন। ছেলেমেয়েদের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ার অভাবে তারা দু দিন থেকে অযত্নে ও অনাহারে কাহিল হয়ে পড়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর বিবাদ, — বিদেশে যাওয়ার এইসব হাস্যকর আয়োজনে সাহায্য না করার

জন্য হরিহর স্ত্রীর মুখ দেখছেন না। যাই হোক, কোন রকমে ভাতে-ভাত খেয়ে সেদিনের মত কাজ সারা হল।

কুলিদের সাহায্যে বেলা নয়টা নাগাদ হরিহর দু খানা গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে কপালে দইয়ের ফোঁটা এঁকে, সিদ্ধিদাতা গণেশের চরণ সেবা করে জয় দুর্গা শ্রীহরি বলে যাত্রা করলেন। যাবার সময় তাঁর ছোট শালাকে বললেন, আমি স্টেশনে গিয়ে জিনিসপত্র বুক করব, তুমি ভাই গিয়ে সকলের টিকিট কাটবে। দেখ, এগারোটার মধ্যে অবশ্য পৌঁছানো চাই, পূজা কনসেশনের ভিড়, দেরি হলে আর জায়গা পাবে না।

কালীপদ বললেন, কোনও ভয় নেই, আমি ঠিক নিয়ে যাব, আপনি যান।

সমস্ত পাড়া সচকিতে ক'রে, সকলকে হাসিয়ে, সকলের বিস্মিত দৃষ্টির উপর দিয়ে বাবা বৈদ্যনাথ যাত্রী হরিহর চৌধুরী মশায় আর-একবাব দুর্গা বলে যাত্রা করলেন। গাড়ি দু খানা পাড়ার ভিতর দিয়ে ঘটর-ঘটর করে চলতে লাগল, আর আমাদের হরিহরবাবু সেই সকল জিনিসপত্রের উপরে বসে তাঁর নতুন-কেনা গরুর গলার দড়িটা ধরে বসে রইলেন। গরুটা চলল গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে।

স্টেশনে এসে দেখা গেল গাড়ির দু ঘন্টা দেরি। জিনিসপত্রের যথারীতি বিধি ব্যবস্থা করে হরিহর এক জায়গায় তাঁর স্তূপাকার মালপত্রের পাশে এসে বসলেন। ক দিন থেকে পরিশ্রমের শেষ নেই, রাত কাটে জেগে, তার ওপর মোটা মানুষ, এদিকে উপবাস চলেছে— ক্লান্তিতে হরিহরের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। তিনি একটা বড় মোটের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। গাড়ির তখনও অনেক দেরি।

মাত্র কয়েক মিনিট আগে তাঁর ঘুম ভাঙল। তখন ঘন্টা দিয়েছে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে হাঁকাহাঁকি করতেই কুলি এল। দশজন কুলি। সেই দশজন মিলে তাঁর মালপত্র নিয়ে প্লাটফরম পেরিয়ে গাড়িতে তুললো! গাড়ি ছাড়তে আর বিলম্ব নেই। কিন্তু কই তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, তাঁর শ্যালকরা— তারা সব কোথায়? হরিহর আকুল হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। হে নারায়ণ মধুসূদন, তুমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

দুই এক মিনিট মাত্র বাকি, এমন সময় তাঁর শালা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। চিৎকার করে বললে, আপনি করেছেন কি নামুন, নামুন, এটা যে তারকেশ্বরের গাড়ি— শিগগীর, আর সময় নেই, দেওঘরের গাড়ি আর তিনমিনিট, আসুন, শিগগীর আসুন।

পাগলের মত হরিহর প্লাটফরমে ঝাঁপ দিলেন। কুলি কুলি! শিগগীর মাল নামাও,— এই কুলি, কুলি!

আবার জিনিস-পত্র নামাতে এল।

পনের জন কুলি, পনের টাকা বকশিস। অনেক ভাঙল, মচকাল, নষ্ট হল। চালের বস্তা ফাটল, তেলের টিন ফুটো হল জলের কলসি ভেঙে ছত্রখান হল।

দেওঘরের ট্রেন ছাড়তে তখন এক মিনিট বাকি। ছুটতে গিয়ে বেচারি হরিহরের

কাঁছা খুলে গেল। সেই অবস্থায় উদভ্রান্ত হয়ে উন্মত্ত হয়ে তিনি গাড়ি পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন। কুলিরা তখনও জিনিসপত্র এনে পৌঁছতে পারেনি। শ্যালক কেবল একটা বিছানা ও একটা কাপড়ের সুটকেস হিঁচড়ে এনে গাড়িতে তুলে দিল। স্ত্রী স্বামীর হাত ধরে গাড়িতে তাঁকে তুলে নিয়ে বললেন, মরণ তোমার, থাক সব, তুমি উঠে এস।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

হরিহর ফ্যাল ফ্যাল করে গলা বাড়িয়ে চেয়ে রইলেন। শ্যালকের হেপাজতে সমস্ত মালপত্র প্লাটফরমে পড়ে রইল।

মাস্টার মহাশয়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে, বর্ধমান শহর হইতে ষোল ক্রোশ দূর, দামোদর নদের অপর পারে, নন্দীপুর ও গোঁসাইগঞ্জ নামক পাশাপাশি দুইটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল ; এবং উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর একটি প্রাচীন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। এখন সে গ্রাম দু'খানিও নাই, বটবৃক্ষটিও অদৃশ্য— দামোদরের বন্যা সে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

ফাল্গুন মাস ; এক প্রহর বেলা হইয়াছে। গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর প্রজা এবং গ্রামের অভিভাবক-স্থানীয় কায়স্থ সন্তান শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস মহাশয় হুঁকা হাতে করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। প্রতিবেশী শ্যামাপদ মুখুজ্যে ও কেনারাম মল্লিক (ইহাঁরাও বড় প্রজা) নিকটে আসিয়া, এ বৎসর চৈত্র মাসে বারোয়ারী অন্নপূর্ণা পূজা কিরূপে নির্বাহ করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্তী নন্দীগ্রামেও প্রতি বৎসর চাঁদা করিয়া ধূমধামের সহিত অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে।

তিন পুরুষ ধরিয়া গোঁসাইগঞ্জ কোনও বিষয়েই নন্দীপুরের নিকট হটে নাই এবং আজিও হটিবে না। তিনজন প্রধান ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত প্রকার গভীর ও গূঢ় আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় রামচরণ মণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং হাতের লাঠিটা আছড়াইয়া ফেলিয়া ধপাস্ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হীরু দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে মোড়লের পো, বসে পড়লে কেন? কি হয়েছে?'

রামচরণ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন দত্তদা, কি হতে আর বাকী আছে? হায় হায় হায়— কার্তিক মাসে যখন আমার জ্বরবিকার হয়েছিল, তখনই আমি গেলাম না কেন? এই দেখার জন্যে কি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলে, হারে বিধেতা তোর পোড়া কপাল!'

শ্যামাপদ ও কেনারামও ঘোর দুশ্চিন্তায় রামচরণের পানে চাহিয়া রহিলেন, দত্তদা বলিলেন, 'কি হয়েছে? সব কথা খুলে বল। এখন আসছ কোথা থেকে?'

দীর্ঘশ্বাস জড়িত স্বরে রামচরণ উত্তর করিল, 'নন্দীপুর থেকে। হায় হায়, শেষকালে নন্দীপুরের কাছে মাথা হেঁট হয়ে গেল। হা— রে কপাল!' — বলিয়া রাচমরণ সজোরে নিজ ললাটে করাঘাত করিল।

দত্তদা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, কেন? নন্দীপুরওয়ালারা কি করেছে?'

'বলছি। বলবার জন্যেই এসেছি। এই রোদ্দুরে মশাই, এক ক্রোশ পথ ছুটতে ছুটতে এসেছি। গলাটা শুকিয়ে গেছে, এক ঘটি জল —'

দত্তদার আদেশে অবিলম্বে এক ঘড়া জল এবং একটি ঘটি আসিল। রামচরণ উঠিয়া

রোয়াকের প্রান্তে বসিয়া, জলে হাত পা মুখ ধুইয়া ফেলিল ; কিঞ্চিৎ পানও করিল। তারপর হাত মুখ মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া বসিয়া, গভীর বিষাদে মাথাটি ঝুঁকাইয়া রহিল।

হীরুদত্ত বলিলেন, 'এবার বল কি হয়েছে, আর দগ্ধে মেরো না বাপু!'

রামচরণ বলিল, 'কি হয়েছে, যা হবার নয় তাই হয়েছে। বড় বড় শহরে যা হয় না নন্দীপুরে তাই হয়েছে। এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনও যা স্বপ্নেও ভাবেনি, তাই হয়েছে। তারা হুস্কুল বসিয়েছে।'

তিনজনেই সমবেত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে আবার কি? হুস্কুল কি?'

রামচরণ বলিল, 'আরে ছাই আমিই কি জানতাম আগে হুস্কুল কার নাম? আজ না শুনলাম! ইঞ্জিরি পড়ার পাঠশালাকে হুস্কুল বলে।'

দত্তদা বলিলেন, 'ওঃ — ইস্কুল খুলেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ— তাই খুলেছে। একজন মাস্টার নিয়ে এসেছে। ইঞ্জিরি পাঠশালের গুরু মশায়কে নাকি মাস্টার বলে। দাশু ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে হুস্কুল বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম, 'মাস্টার বসে দশ বারোজন ছেলেকে ইঞ্জিরি পড়াচ্চে।'

হীরুদত্ত একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাস্টার কোথা থেকে এনেছে — তা কিছু শুনলে?'

'সব খবরই নিয়ে এসেছি। বর্ধমান থেকে এনেছে। বামুনের ছেলে—হারাণ চক্রবর্তী। পনরো টাকা মাইনে, বাসা, খোরাক। সব খবরই নিয়ে এসেছি।'

বাহিরে এই সময়ে একটা কোলাহল শুনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, পিলপিল করিয়া লোক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। রামচরণ পথে আসিতে, নন্দীপুরের হস্তে গোঁসাইগঞ্জের এই অভূতপূর্ব পরাভাব সংবাদ প্রচার করিয়া আসিয়াছিল। সকলে আসিয়া চীৎকার করিয়া নানা ছন্দে বলিতে লাগিল, 'এ কি সর্বনাশ হল! নন্দীপুরের হাতে এই অপমান! আমাদের ইস্কুল খোলবার এখন কি উপায় হবে?'

হীরুদত্ত সেই রোয়াকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—

'ভাই সকল! তোমরা কি মনে করেছ, তিন পুরুষ পরে আজ গোঁসাইগঞ্জ নন্দীপুরের কাছে হটে যাবে? কখনই না। এ দেশে প্রাণ থাকতে নয়। আমরাও ইস্কুল খুলবো। তোমরা শান্ত হয়ে ঘরে যাও। আজই খাওয়া দাওয়া করে আমি বেরুচ্চি। কলকাতা যাবার রেল খুলেছে— আর তো কোনও ভাবনা নেই। আমি কলকাতায় গিয়ে ওদের চেয়েও ভাল মাস্টার নিয়ে আসবো। ওরা ১৫ টাকা দিয়ে মাস্টার এনেছে? আমরা ২৫ টাকা মাইনে দেবো। ওদের মাস্টারকে পড়াতে পারে এমন মাস্টার আমি নিয়ে আসবো। আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে, আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাবো— বসাবো— বসাবো, তিনসত্যি করলাম। এখন যাও, স্নানাহার করগে।'

'জয় গোঁসাইগঞ্জের জয়। জয় হীরুদত্তের জয়!' — সোল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে তখন সেই জনতা প্রস্থান করিল।

কলিকাতা হইতে মাস্টার নিযুক্ত করিয়া হীরুদত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মাস্টার মহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র। বয়স ত্রিশ বৎসর, খর্বাকায়, কৃষ্ণকায় ব্যক্তি, বড় মিষ্টভাষী। ইংরাজি বলিতে কহিতে লিখিতে পড়িতে তিনি ভারি ওস্তাদ। ইংরেজিটা তাঁর এতই বেশী অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে ইংরাজি কথা মিশাইয়া ফেলেন— অজ্ঞ লোকের সুবিধার্থে আবার তাহা বাঙ্গলা করিয়া বুঝাইয়াও দেন। বলেন, পূর্বে পিতার জীবিতকালে, একদিন কলকাতার গঙ্গার ধারে মাস্টার নাকি বেড়াইতেছিলেন, তথায় এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। সাহেব তাঁহার ইংরাজি শুনিয়া, লাট সাহেবের নিকট সে গল্প করিয়াছিলেন। লাট সাহেব মাস্টার মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া, ডেপুটি কালেক্টারির পদ তাহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তিনি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা ছিল না। সেই প্রস্তাব তিনি বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আজ অভাবে পড়িয়া এই ২৫৲ টাকার চাকরি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। পুরুষস্য ভাগ্যং!— মাস্টার মহাশয়ের মুখে এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ইংরাজিয়ানা চাল-চলন দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

হীরদত্তর প্রতিজ্ঞা অনুসারে, পরদিনই স্কুল খুলিল। পনেরো যোলটি ছাত্র লইয়া মাস্টার মহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা হইতে (দত্তদার ব্যয়ে) তিনি প্রচুর পরিমাণে সেলেট, পেন্সিল ও মরে সাহেবের স্পেলিং বুক খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন, ছাত্রগণের উৎসাহ বর্ধনার্থে সেগুলি তাহাদিগকে বিনামূল্যেই দেওয়া হইতে লাগিল।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের লোকের পথে-ঘাটে দেখা হইলে উভয় গ্রামের মাস্টার সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোঁসাইগঞ্জ বলিত— 'বর্ধমানের মাস্টার, ও জানেই বা কি, আর পড়াবেই বা কি! নন্দীপুর বলিত— 'হলেই বা আমাদের মাস্টারের বর্ধমানে বাড়ি, তিনিও ত কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। ওঁরা যখন পড়তেন, তখন কি বর্ধমানে ইংরাজি ইস্কুল ছিল? কলকাতায় গিয়ে ইংরাজি পড়তে হত।'

যথা সময়ে উভয় গ্রামের বারোয়ারী পূজার উৎসব আরম্ভ হইল। উভয় গ্রামেই উভয় গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা দর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ, যাত্রা ও টপসঙ্গীত শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল। এই উপলক্ষ্যে উভয় মাস্টারের দেখা সাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং সভাস্থলে প্রকাশ পাইল উভয়ে পূর্বাবধি পরিচিত। পূজান্তে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাস্টার নাকি বলিয়াছেন— 'ঐ বেটা বুঝি ওদের মাস্টার হয়ে এসেছেন, তা এদ্দিন জানতাম না! ওটা ত মহামূর্খ! ছেলেবেলায় কলকাতায় আমরা এক কেলাসে পড়তাম কিনা। আমরা যখন সেকেন বুক পড়ি, সেই সময়েই ও ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর আর তো ও ইংরাজি পড়েননি। বড়বাজারে এক মহাজনের আড়তে খাতা লিখত, মাইনে ছিল সাত টাকা। গেল বছরও তো কলকাতায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়; তখনও তো ঐ চাকরি করছে।'

গোঁসাইগঞ্জবাসীরা ব্রজ মাস্টারকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কি শুনছি?'

ব্রজ মাস্টার এ প্রশ্ন শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, — 'একেই বলে কলিকাতা। সেকেন বুক পড়ার সময় আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম, না ও-ই ছেড়ে দিয়েছিল? হয়েছিল কি জাননা বুঝি? মাস্টার কেলাসে রোজ পড়া জিজ্ঞেস করতো, ও একদিনও বলতে পারতো না। মাস্টার একদিন ওকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে, ও এন্সার করতে পারলে না। আমায় জিজ্ঞাসা করতেই আমি বললাম। মাস্টার আমায় বললে, দাও ওর কান মলে। আমি কান মলে দিতেই ওর মুখচোখ রাগে রাঙা হয়ে গেল। ও বলতে লাগলো ; আমি হলাম বামুনের ছেলে, ও কায়েত হয়ে কি না আমার কানে হাত দেয়। সেই অপমানে ওই-ত ইস্কুল ছেড়ে দিলে। আমি তারপর পাঁচ বছর সেই ইস্কুলে পড়ে, একেবারে লায়েক হয়ে তবে বেরুলাম।'

অতঃপর গোসাইগঞ্জের লোক, নন্দীপুর কর্তৃক ব্যক্ত ঐ অপবাদের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে হারাণ মাস্টার বলিল, 'আমরা ইস্কুলে যে মাস্টারের কাছে পড়তাম, তিনি আজও বেঁচে আছেন। গোসাইগঞ্জ থেকে তোমরা দু'জন মাতব্বর লোক আমার সঙ্গে চল তাঁর কাছে ; তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখ কার কথা সত্যি কার কথা মিথ্যে।'

একথা শুনিয়া ব্রজ মাস্টার হা হা করিয়া হাসিয়া বলি, 'অ্যা! এই কথা বলেছে? ও সব ত বিলকুল ফল্সো— মিথ্যে কথা। সেই মাস্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে ভজিয়ে দেবে? তিনি কি আর বেঁচে আছেন? গেল বছরের আগের বছর, তিনি যে হেভেন— স্বর্গে নেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে আমি ইনভাইট— নেমতন্ন খেয়ে এসেছি বেশ মনে আছে। আমাকে বড্ড ভালোবাসতেন যে! একেবারে সন্ ইকোয়েল— পুত্রতুল্য। তাঁর ছেলেরা আজও আমায় বেজো দাদা বলতে ইগ্নোরেণ্ট— অজ্ঞান।'

উভয় মাস্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ- প্রয়োগের ফল হইল, উভয় গ্রামই স্ব স্ব মাস্টারের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল, কোনও প্রকাশ্য স্থানে দুই জনের মধ্যে বিচার হউক, কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাউক।

উভয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন, উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহারই নিম্নে বিচার সভা বসিবে। কিন্তু উভয় গ্রামের লোকেই ইংরাজিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং যাহাতে জয় পরাজয় সম্বন্ধে কাহারও মনে কিছুমাত্র সংশয় না থাকে, এমন একটি সরল বিচার প্রণালী স্থির করা আবশ্যক। উভয় গ্রামের সম্মতি-ক্রমে স্থির হইল যে, মাস্টারেরা পরস্পরকে একটি ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিবে, অপরকে তাহার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন, তবে উভয়ে তুল্যমূল্য। একজন অন্যকে ঠকাইতে পারিলে, তিনিই জয়পত্র পাইবেন।

বিচারের দিন স্থির হইল— আগামী বৈশাখী-পূর্ণিমা ; স্থান—উপরিউক্ত বটবৃক্ষতল। সময়— সূর্যাস্ত।

গ্রামবাসীরা ব্রজ মাস্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া প্রভৃতি বাদ্যকরগণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটা

বৃহৎ রামশিঙ্গা লইয়া চলিয়াছে— ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাক ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পথে যাইতে যাইতে ব্রজ মাস্টারের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, 'কি হে মাস্টার, মুখ রাখতে পারবে তো? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু ঠিক করে রাখ, হারাণ মাস্টার যেন কিছুতেই তার মানে বলতে না পারে।' ব্রজবাবু বলিলেন, 'আপনারা ভাবছেন কেন? দেখুন না কি করি!'

এমন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করব যে তা শুনেই হারাণ মাস্টারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে— মানে বলা ত দূরের কথা! দত্তদা বলিলেন, 'দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পার, তবে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।' - কেহ স্পষ্ট না বলিলেও ব্রজ মাস্টার ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে, আজ যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে, তবে এ গ্রাম কল্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষতলে উপনীত হইল। শপ্, মাদুর, শতরঞ্জি প্রভৃতি বাহকেরা তৎপূর্বেই আসিয়া, নিজ গ্রামের সীমারেখার নিকট সেগুলি বিছাইয়া রাখিলেন। দূরে পঙ্গপালের মত নন্দীপুরবাসিগণ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সঙ্গেও শপ্ মাদুর প্রভৃতি ও ঢাক, ঢোল ইত্যাদি আসিতেছে।

ক্রমে নন্দীপুর আসিয়া নিজ সীমানার নিকট শপ্, মাদুর বিছাইয়া বসিয়া গেল। উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মুখে বসিয়াছেন, মধ্যে দুই তিন হাত মাত্র খালি জমি।

এখন প্রশ্ন উঠিল, কোন্ মাস্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবেন। উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার অধিকার দাবি করিল। কোনও পক্ষই নিজ দাবি ত্যাগ করিতে সম্মত নহে। অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন, হীরু দত্ত মহাশয় একটা ছড়ি ঘুরাইয়া ঊর্ধ্বে ছুঁড়িয়া দিউন, ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা করিয়া পড়িবে, সেই গ্রামের মাস্টার প্রথম মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন।

'আমার ছড়ি লউন— আমার ছড়ি লউন' বলিয়া উভয় গ্রামের অনেকেই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাছে যে ছড়িটি পাইলেন, তাহা লইয়া হীরু দত্ত সজোরে ঘুরাইয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিলেন।

ক্রমে ছড়ি আসিয়া পতিত হইল। সকলে দেখিল, তাহার মাথাটি নন্দীপুরের দিকে হোলয়া রাহুয়াছে।

নন্দীপুর ইহা দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিযা উঠিল ; গোঁসাইগঞ্জের মুখটি চুণ হইয়া গেল। সকলে সাগ্রহে বিচার ফলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রইল।

নন্দীপুরের হারাণ মাস্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন: ব্রজ মাস্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল ; কিন্তু মুখে সে ভাবকে তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না।

হারাণ মাস্টার তখন বলিলেন, বল দেখি এর মানে কি—

HORNS OF A DILEMMA

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাস্টার এই কূটপ্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, 'এর মানে— উভয়সঙ্কট— কেমন কি না?'

'পেরেছে— পেরেছে— আমাদের মাস্টার পেরেছে' বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন। এখন ব্রজ মাস্টারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা আসিল।

ব্রজ মাস্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'শোন হারাণবাবু, আমি তোমায় কোনও কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করব। এ অঞ্চলে, মনে কর, তুমি আর আমি এই দু'জন যা ইংরাজিনবীশ আছি। একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা করে তোমায় ঠকিয়ে দেবো, সেটা আমার মনঃপূত নয়। এতে হয়ত গোঁসাইগঞ্জ রাগ করতে পারেন— কিন্তু আমি নিজে একজন ইংরেজিনবীশ হয়ে, আর একজন ইংরেজিনবীশের প্রকাশ্য সভায় অপমান তো করতে পারিনে! আচ্ছা, খুব সহজ একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করি— বেশ হেঁকে উত্তর দাও, যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা এর মানে কি বল দেখি— I DON'T KNOW

হারাণ মাস্টার উচ্চস্বরে বলিলেন— 'আমি জানি না।'

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সেই মুহূর্তে গোঁসাইগঞ্জের দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিপুল বেগে নৃত্য ও চীৎকার করিতে লাগিল, 'হো হো জানে না— নন্দীপুর জানে না— হেরে গেল, দুও-দুও।'

হারাণ মাস্টার মহা বিপন্নভাবে সকলকে কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঠিক সময় গোঁসাইগঞ্জের ঢাক, ঢোল, কাড়া-নাকাড়াও রামশিঙ্গা সমবেত ভাবে গর্জন করিয়া উঠিল। তাঁহার কথা কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

গোঁসাইগঞ্জ-নিবাসী কয়েকজন বলশালী লোক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং তন্মধ্যে একজন ব্রজ মাস্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাদ্যভাণ্ডের সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন শুনা গেল হারান মাস্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তথায় ইস্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। গোঁসাইগঞ্জে ব্রজ মাস্টার অপ্রতিহত প্রভাবে মাস্টারি এবং গ্রামস্থ সকলের অপত্য নির্বিশেষে ক্ষীর ননী ছানা ভূঞ্জন করিতে লাগিলেন।

প্রগতিরহস্য

প্রমথ চৌধুরী

আজ যা পাঁচজনকে শোনাতে বসেছি তা একটা উড়ো গল্প নয় — আমাদের বর্তমান প্রগতির আংশিক ইতিহাস, অথবা দুটি ভদ্রলোকের আংশিক জীবনচরিত। এ দুই ব্যক্তির কেউ অবশ্য চিরস্মরণীয় নন। আমার স্মৃতিপটে এঁদের যে রূপ অঙ্কিত আছে, সেই ছবি ঈষৎ enlarge করে আপনাদের সুমুখে খাড়া করতে চাই ; যদিচ তাঁরা কেউ সুদৃশ্য ছিলেন না।

আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, একথা স্মরণ করিয়ে দেবার সার্থকতা কি। — আমার উত্তর হচ্ছে, আমাদের ভিতর কজন চিরস্মরণীয় হবেন? দু এক জনের বেশি নয়। তাই বলে আমরা যারা আছি, আমাদের মতামতের ও বিদ্যাবুদ্ধির কি কোনো মূল্য নেই? আমাদের মতো সাধারণ লোকের সঙ্গে অসাধারণ লোকের প্রধান তফাত এই যে, আমরা আছি, আর তাঁরা ছিলেন। যখন তাঁরা ছিলেন, তখন তাঁরা আমাদেরই মতো কাউকে হাসিয়েছেন, কাউকে কাঁদিয়েছেন, কাউকে ঘুঁসো দেখিয়েছেন, কারও কাছে জোড়হাত করেছেন। অর্থাৎ আমরা আজ যা করি, বছর পঞ্চাশ আগে তাঁরাও তাই করেছেন। আমরা কেউ কেউ সেকালের কথা শুনতে যে ভালোবাসি তার কারণ, একাল সেখালেরই পুনরুক্তি মাত্র। আমাদের প্রতি ব্যক্তির যেমন একটু-আধটু বিশেযত্ব আছে, তাঁদেরও তেমনি ছিল। সেই বিশেযত্বই আমার মনে আছে, আর সেই কথা আপনাদের নিবেদন করতে চাই। কি সূত্রে এঁদের কথা আজ মনে পড়ে গেল, তা বলছি।

২

প্রগতি যে অমাদের হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রগতির মানে কি? কোনো বড়ে জিনিসের কোনো ছোটো অর্থ নেই — যা দু কথায় বোঝানো যায় ; আর অনেক কথায় তার ব্যাখ্যা করতে গেলে, লোকে সে কথায় কর্ণপাত করবে না। প্রগতির প্রমাণ এই যে, আমি যদি বলি প্রগতির হয় নি, তবে লোকে বলবে — তুমি অন্ধ, আর না হয় তো তুমি সেকেলে কূপমণ্ডুক। দেখতে পাচ্ছ না যে, আমাদের কাব্যে ও চিত্রে, নৃত্যে ও গীতে কি পর্যন্ত প্রগতি হয়েছে ও হচ্ছে? তুমি, প্রমথ চৌধুরী, দেখছ যে আমরা আজও পরাধীন ও পরবাশ — কিন্তু ভুলে যাচ্ছ যে আমাদের পরাধীনতাই আমাদের সকল প্রগতির মূল, আর তুমিও ঐ প্রগতির জোয়ারে খড়কুটোর মতো ভেসে চলেছ।

আমি বলি — তথাস্তু। এখন জিজ্ঞাসা করি, দেশে প্রগতি আনলে কে? যদি বল ইংরেজ, তা হলে কথাটা ঠিক হবে না। ইংরেজ তো আমাদের প্রগতির পথ বন্ধ করে দিয়েছে ইন্ডিয়া অ্যাক্টের বেড় তুলে। এর পর আমাদের প্রগতির উল্টোরথ টানতে হবে।

তবে কি রামমোহন রায় এই প্রগতির রথ নূতন পথে চালিয়েছেন? অবশ্য এ পথ রামামোহন প্রথম আবিষ্কার করেন। তারপর বহু লোক এই রথের দড়ি টেনেছেন। এই

শ্রেণীর দুটি লোকের কথা তোমাদের শোনাব ; তার মধ্যে এক জন ছিলেন প্রগতির নীরব কর্মী, আর এক জন ভাবুক।

আমি ছেলেবেলায় একটা মফস্বলের শহরে বাস করতুম লেখাপড়া করবার জন্য। সেকালে উক্ত শহরে দুজন গণমান্য মুখুয্যে মশায় ছিলেন। একজনের ছিল অগাধ টাকা, আর এক জনের ছিল অগাধ বিদ্যে— দুইই স্বোপার্জিত ; কেননা উভয়েই ছিলেন দরিদ্র সন্তান, কিন্তু উভয়েই self-help এর মন্ত্র সাধন করে একজন হয়েছিলেন ধনী, অপরটি বিদ্বান।

কেনারাম মুখুজ্যে কোনও জমিদারের মেয়ে বিয়ে করে তাঁর শ্বশুরকুলের দত্ত মাসহারার টাকা বাঁচিয়ে, সে উদ্বৃত্ত টাকা সুদে খাটাতেন। আমি এ কথা জানতুম এই সূত্রে যে, আমাদের মতো লোকের অর্থাৎ যাদের আয়ের চাইতে ব্যয় বেশি তাদের, দরকার হলেই তিন চার হাজার টাকা অপব্যয় করবার জন্য ধার দিতেন শতকরা বারো টাকা সুদে।

সে শহরে আর-একটি ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি জাতে সুবর্ণবণিক ও ধর্মে খ্রীষ্টান। তাঁর স্ত্রী তাঁর ঘর আলো করে থাকত, আর তার নাম ছিল— 'মাই ডিয়ার'। তাঁর কোনও ostensible means of livelihood ছিল না, অথচ টাকার কোনও অভাব ছিল না। ছোটো ছেলের কৌতূহলের অন্ত নেই— তাই আমি মাই ডিয়ারের স্বামীকে একদিন জিজ্ঞেস করি যে, শ্রীযুক্ত কেনারাম মুখুজ্যে এত টাকা করলেন কি করে? — তিনি বললেন যে, টাকা করা একটা আলাদা বিদ্যে। যে জানে, সে বিনে পয়সায় দেদার পয়সা করতে পারে। পরে শুনেছি, তিনি আগে গভর্নমেন্টের চাকরি করতেন, কিন্তু অফিসে self-help এর বিদ্যের এতটা বেপরোয়াভাবে চর্চা করেছিলেন যে সরকার তাঁকে কর্মচ্যুত করতে বাধ্য হন ; জেলে দেননি পাদরি সাহেবের খাতিরে। তিনি ছিলেন প্রগতির একটি উপসর্গ। কি হিসেবে, তা পরে বলব।

৪

কেনারামবাবু বোধ হয় কখনো ইস্কুলে পড়েননি। তিনি ইংরেজি জানতেন না, বলতে পারি নে। যদিও জানতেন তো সে নামমাত্র। এ ধারণা আমার কোত্থেকে হল তা বলছি।

মুখুজ্যে-গৃহিণীর একটি ছোটোখাটো operation হবার কথা ছিল। ছুরি চালাবেন একটি লালমুখো গোরা ডাক্তার। operation এর ফলাফল জানতে আমরা তাঁর বাড়ি উপস্থিত হয়ে দেখি মুখুজ্যে মশায় বারান্দায় পাগলের মতো ছুটোছুটি করছেন ও বলছেন 'হরিবোল' 'হরিবোল'। আমরা এ কথা শুনে বুঝলুম যে, মুখুজ্যে গিন্নির কর্ম সাবাড় হয়েছে।

তারপর তাঁর একটি আশ্রিত আত্মীয় বললেন যে, operation খুব ভালোয় ভালোয় হয়ে গিয়েছে। আমরা সেই কথা শুনে জিজ্ঞেস করলুম যে, মুখুজ্যে মশায় তবে হরিবোল হরিবোল এই মারাত্মক ধ্বনি করছেন কেন? তিনি হেসে বললেন, ইংরেজি বলছেন। কাটাকুটি ব্যাপারটা যে horrible — তাই বলতে চেষ্টা করছেন।

এর থেকেই তাঁর ইংরেজি বিদ্যের বহর বুঝতে পারবেন। তিনি যে আমাদের প্রগতিকে মনে মনে গ্রাহ্য করেছিলেন, সে ইংরেজি পড়ে নয়, লোকচরিত্র দেখে-শুনে। তার মতামত এখন উল্লেখ করছি।

আমার যখন বয়েস বছর বারো তকন কেনারামবাবু আমাকে একদিন বলেন যে, "আমাদের এ দেশে উন্নতি কোন্ জিনিসে এসেছে জান?"

আমি বললুম "না।"

তিনি বললেন, 'ব্রাণ্ডি। ব্রাণ্ডি না খেলে মুরগি খাওয়া যায় না, আর মুরগির পিঠপিঠ আসে আর-সব প্রগতি। ব্রাণ্ডি পান করলে নেশা হয়, অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়। তখন মুরগি নির্ভয়ে খাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের জাতিভেদ থাকে না। মুরগি খেতে হলেই মুসলমানের হাত খেতে হয়। তারপরেই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কেননা অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা ওরূপ পান-ভোজনে মহা আপত্তি করে ; শিক্ষিত হলে করে না। আর স্ত্রী-শিক্ষার পিঠপিঠ আসে স্ত্রী-স্বাধীনতা। তারা লেখাপড়া শিখবে অথচ অন্দরমহলে আটক থাকবে— এ হতেই পারে না। এর থেকেই দেখতে পাচ্ছ, প্রগতির মূল হচ্ছে ব্রাণ্ডি, ইংরেজি শিক্ষা নয়। ইংরেজি শেখা শক্ত, কিন্তু ব্রাণ্ডি গেলা খুব সহজ। এ বিষয়ে অশিক্ষিত-পটুত্ব কি লোকের দেখ নি?— এই কারণে আমি ব্রাণ্ডি-খোরদের উৎসাহ দিই। ঐ নেশার পথই হচ্ছে যথার্থ প্রগতির পথ ; যদিও আমি নিজে মদও খাই নে, মাংসও খাই নে।'

খ্রীষ্টান ভদ্রলোকটির এঁর সাহায্য করতেন, কারণ তাঁর ওখানে গেলেই তিনি চায়ের সঙ্গে মুরগির ডিম অর্থাৎ প্রগতিব ডিম সকলকেই খাওয়াতেন।

৫

পূর্বে বলেছি, মুখুজ্যে মহাশদ্বয়ের ছবি আঁকবার যোগ্য নয়। এঁদের কেউই রূপে শ্রীকৃষ্ণ বা মহাদেব ছিলেন না। দুজনেই রঙ ও রূপে ছিলেন আমাদের মতোই সাধারণ বাঙালি। শুধু বাঞ্ছারামবাবুর কোনো অঙ্গ ছিল অসাধারণ সংকুচিত, কোনো অঙ্গ আবার তেমনি প্রসারিত। তাঁর চোখ দুটি ছিল অযথা সংকুচিত, আর নাসিকা বেজায় প্রসারিত। আর তাঁর চুল ছিল ঊর্ধ্বমুখী। সে চুলের ভিতর চিরুণী-ব্রুসের প্রবেশ নিষেধ, আর গুল্ম ঐ একই উপাদানে গঠিত। আর তাঁর উদয়ের আয়তন ছিল অসাধারণ প্রবৃদ্ধ। লোকে বলত তাঁর পেটের ভিতর একখানা গোটা Webster's Dictionary বাসা বেঁধেছে। এ রসিকতার অর্থ— তিনি নাকি থেকে পর্যন্ত সমস্ত ইংরেজি শব্দ উদরস্থ করেছেন। এক কথায়, তাঁর চেহারা ছিল ঈষৎ ভীতিপ্রদ।

কিন্তু আমরা ছেলের দল তাঁকে ভয় করতুম না, করতেন আমাদের মাস্টারমশায়রা। কেননা তিনি ছিলেন সেকালের একজন জবরদস্ত স্কুলইনস্পেক্টার। তিনি পরীক্ষা করতেন আমাদের, কিন্তু আমাদের ভুলভ্রান্তির জন্য শাস্তি দিতেন মাস্টার মশায়দের। কাউকে করতেন বরখাস্ত, কাউকে করতেন জরিমানা। কারণ তাঁর কথা ছিল— ছেলেরা যদি ভুল ইংরেজি লেখে তো জাতির প্রগতি হবে কোত্থেকে? — প্রগতি অর্থে তিনি বুঝতেন— ইংরেজি ভাষার যত্ব-ণত্বের জ্ঞান। তাঁর তুল্য ইংরেজি যে ইংরেজরাও জানে না, এই ছিল লোকমত।

৬

তাঁর ইংরেজি-জ্ঞানের একটা নমুনা দিই। আমাদের শহরে গভর্নমেন্টের একটি

বৃত্তিভোগী স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রদের তিনি মুখে পরীক্ষা করছিলেন। সে সময়ে পড়ানো হচ্ছিল Psalm of Life নামক একটি কবিতা। ছেলেদের মুখে Psalm. Pasalamaয় রূপান্তরিত হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন— এ উচ্চারণ তোমাদের কে শিখিয়েছে? ছেলেরা উত্তর করলে— মাস্টারমশায়। বহু ব্যঞ্জবর্ণ পাশাপাশি থাকলে উহ্য স্বরবর্ণগুলি উচ্চারণের সময় জুড়ে দিতে হবে। সেইজন্য আমরা তিনটি অলিখিত ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ছি। বাঙ্গারামবাবু বললেন, তিনটি না জুড়ে দুটি ব্যঞ্জবর্ণ ছেঁটে দিতে পারতে, তা হলেই তো উচ্চারণ ঠিক হত। এটি মনে রেখো যে, ইংরেজরা লেখে এক, বলে আলাদা, এবং করেও আলাদা। এই হচ্ছে তাদের অভ্যুদয়ের কারণ।

এরপর সেকেন্ড-মাস্টারকে তিনি থার্ড-মাস্টার করে দিলেন। লোকে বলে, সেকেন্ড-মাস্টার ব্রাহ্ম বলে তাঁর এই শাস্তি হল। মাস্টারমশায় যে ঘোর ব্রাহ্ম ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই — কেননা তিনি তাঁর মেয়ের বিয়েতে শালগ্রামের বদলে একটি তামাকের ডেলা সাক্ষী রেখে বিবাহকার্য সম্পন্ন করেছিলেন। অপরপক্ষে বাঙ্গারামবাবু ছিলেন একাধারে ঘোর নাস্তিক এবং হিন্দু। ব্রাহ্মদের তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না ; কেননা তাঁরা হিন্দুয়ানীর বিরোধী ও ভগবানের বিশ্বাস করেন। ব্রাহ্মধর্ম হচ্ছে ইংরেজি না জানার ফল। তাঁর এ ধর্ম হচ্ছে বৈষ্ণবধর্মের মাসতুতো ভাই।

৭

যাঁরা মনে করেন যে ইংরেজি না জানলে লোকে সভ্য হয় না, তাঁদের বলি যে, একথা যদি সত্য হয় তা হলে বাঙ্গারামবাবু ছিলেন আমাদের প্রগতির একটি অগ্রদূত।

তিনি মরবার সময়ও ইংরেজি বলতে বলতে মরছেন। ইংরেজি শিক্ষার ফলে তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন।; ডাক্তাররা বললে যে, রোগের একমাত্র ঔষধ ব্রাণ্ডি, ও পথ্য মুরগির মাংস। নিরামিষাশী বাঙ্গারামবাবু এ ওষুধপথ্য সেবনে কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি বললেন, "To be. or not to be . that is the question"। শেক্সপিয়ারের এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে-- "We are such stuff as dreams are made on. and our little life is rounded with a sleep."

তারপর তাঁর যখন আসন্নকাল উপস্থিত হল, তখন তাঁর ইংরেজিনবিশ উকিল ডাক্তার বন্ধুরা সব বাড়িতে উপস্থিত হন। বড়ো ডাক্তারবাবু এসে দেখলেন, সকলের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তিনি রোগীর নাড়ী টিপে বললেন, "My eyeballs burn and throb. but have no rtears" ; এ কথা শুনে মুমূর্ষু রোগী বললেন, "Long live Byron"।

এরপরেই তিনি চিরনিদ্রায় মগ্ন হলেন।

এখন আমরা যখন প্রগতির উল্টোরথ টানতে বাধ্য হব, তখন পূব-প্রগতির কোন্ ধারা বজায় থাকবে? কেনারামবাবুর অনুমত পানভোজন? না, বাঙ্গারামবাবুর অভিমত ইংরেজি ভাষা? — যে ভাষার লেখার সঙ্গে বলা মেলে না, আর বলার সঙ্গে করা মেলে না।

ঠিকুজির নিকুচি

প্রমথনাথ বিশী

এক ধনী গৃহস্থের প্রথম পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। পুত্রসন্তান সকলেরই কাম্য। পিতা যদি ধনী হয়। আর পুত্রসন্তান যদি প্রথম হয়, তবে তার আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। পিতা এই উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন করলো। বাড়িটি আলোতে আর ফুলে সুসজ্জিত করলো আর বন্ধুবান্ধবদের ভুরিভোজে আপ্যায়িত করলো। বলাবাহুল্য বাড়ির গৃহিণী ও দাসদাসী নুতন বস্ত্র অলঙ্কার লাভ করলো, সর্বোপরি পুত্রটি রত্ন অলঙ্কারে ভূষিত হ'ল। এই উৎসব বেশ কিছুদিন ধরে চললো। এইভাবে উৎসব শেষ হ'লে একজন পারিষদ প্রস্তাব করলো, বাবুজি সমস্তই তো আশানুরূপ হ'ল, কেবল একটি অবশ্য-কর্তব্য বাকী রইলো। পিতা আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো কি সেই অবশ্য-কর্তব্য শীঘ্র বলো। পারিষদটি বলল, এই নগরে একজন বিচক্ষণ জ্যোতিষী আছে, তার গণনা কখনো মিথ্যা হয় না, সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি তার নখাগ্রে। তাকে দিয়ে আপনার পুত্রের একটি ঠিকুজি তৈরি করে নিন। এ নগরের বহু লোকের ঠিকুজি সে রচনা করেছে, তার গণনা কোন ক্ষেত্রেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নি। এই বলে অনেকগুলি সার্থক গণনার উদাহারণ বিবৃত করলো। এই কথা শুনে পুত্রের পিতা বললো, এখনি তাকে তলব করো। আহ্বান পেয়ে বৃদ্ধ জ্যোতিষী তখনি পুঁথিপত্তর ও খড়ি নিয়ে উপস্থিত হ'লে পিতা আপনার অভিলাস ব্যক্ত করলো। পিতার অভিলাস শুনে জ্যোতিষী বললো, এ আপনার মতোই কথা। আমি এখনই ওই শিশুর ঠিকুজি তৈরি করে দিতেছি। আপনি শিশুটিকে এখানে আনবার আদেশ দিন। শিশুটি আনীত হ'লে অনেকক্ষণ ধরে তাকে নিরীক্ষণ করে জ্যোতিষী বললো, এমন সর্বলক্ষণ যুক্ত শিশু আগে আর কখনো আমার চোখে পড়েনি। এ জাতক শতায়ু, বলবান, বিদ্যা, বিনয়সম্পন্ন হবে, আর এর খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। জ্যোতিষীর বাক্যে পিতা সবিশেষ আহ্লাদিত হ'ল। তথাপি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা জ্যোতিষী যথোচিত পরিমাণে নস্য গ্রহন করে বললো, চন্দ্রেও কলঙ্ক থাকে, সর্বগুণোপেত শিশুতেও অরিষ্ট সম্ভব, তবে সে অরিষ্ট না থাকবারই সামিল। পিতা সভয়ে বললো, কি সেই অরিষ্ট?

জ্যোতিষী বললো, শিশুর সিংহারিষ্ট আছে।

সিংহারিষ্ট কি?

সিংহ থেকে এর ক্ষতি হ'তে পারে।

পিতা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বলল, আপনার কথাই সত্য, ও অরিষ্ট না থাকবারই শামিল।

সংবাদ পত্রে পড়েছি, এই দেশের পশ্চিম প্রান্তে গির নামক অরণ্যে ছাপ্পান্নটি মাত্র সিংহ আছে। আমরা থাকি দেশের পূর্বপ্রান্তে— মাছখানের হাজার যোজনের ব্যবধান। সেখানে আমার পুত্রের যাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? কাজেই সিংহারিষ্ট সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত

হ'লাম। তখন পিতা প্রচুর পারিতোষিক দিয়ে জ্যোতিষীকে বিদায় দিল। জ্যোতিষী যাওয়ার সময়ে বলে গেল, আমি অচিরে শিশুটির লিখিত ঠিকুজি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। নিশ্চিন্ত নির্ভয় পিতা পারিষদ দলের মধ্যে বললো, হ্যাঁ, আমার পুত্রের যোগ্য জ্যোতিষী বটে। পারিষদদল একযোগে বলে উঠলো, হ্যাঁ বাবুজি, এঁর গণনা কখনো নিষ্ফল হয় না। এদিকে পুত্রটি শনৈঃ শনৈঃ চন্দ্রকলার মতো বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

ইতিমধ্যে শিশুটির পিতামহ তীর্থযাত্রা অসমাপ্ত রেখে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে, পৌত্র মুখ দেখার আশায়। পৌত্রকে কোলে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো আর তার সিংহারিষ্ট আছে শুনে পৌত্রের নাম রাখলো 'সিংহদমন'। বুড়ো ঐ শব্দটা উচ্চারণ করে আর হাসে, বলে, সিংহগুলোকে জব্দ করবার জন্যেই এর জন্ম, দেখে নিয়ো তোমরা। একদিন শিশুটিকে কোলে নিয়ে বৃদ্ধ গেল জ্যোতিষীর বাড়িতে, বলল, চমৎকার গণনা করেছ, আমি নাম রেখেছি সিংহদমন। জ্যোতিষী বললো, ঠাকুর আমার গণনা কখনো মিথ্যা হয় না ; অন্ততঃ এ পর্যন্ত তো হয় নি।

বৃদ্ধ বললো, জ্যোতিষী আমার একখানা ঠিকুজি করে দাওনা কেন, যদিও জীবনের বারো আনা কাটিয়ে দিয়েছি।

বাধা দিয়ে জ্যোতিষী বললো, শেষের চার আনাই তো আসল। কিছু ভাববেন না কালকেই আপনার ঠিকুজি দিয়ে আস্‌বো। পরদিন ঠিকুজি হাতে নিয়ে এসে জ্যোতিষী জানালো, আপনার সমস্তই ভালো কেবল একটি 'ইষ্টকারিষ্ঠ' আছে।

বৃদ্ধ শুধালো, সেটা আবার কি?

মাথায় ইঁটের আঘাত লাগতে পারে।

বৃদ্ধ মাথার প্রমাণ সাইজ টাকটির উপর হাত বুলোতে বুলোতে বললো — এটা কি কও জ্যোতিষী. মাথায় ইঁটের আঘাত লাগবে কেমন করে। আমি তো শয়ন করি নবনির্মিত বাড়িতে।

সে যা বলেছেন ঠাকুরমশাই, প্রচণ্ড ভূমিকম্প না হ'লে ও বাড়ি টলবে না। তবে শাস্ত্রে লেখা আছে তাই বললাম।

বুড়ো আশ্বস্ত হ'ল। তবে যতই আশ্বস্ত হোক, নবনির্মিত ইষ্টকালয়ের মধ্যে আর ঘুমোত না। ঘুমোতে ফাঁকা মাঠের মধ্যে। প্রথমটা অস্বস্তি বোধ হ'ত, কিন্তু ক্রমে সয়ে গেল।

এদিকে পৌত্রের বয়স পাঁচ সাত বছর হ'য়েছে। জানতে পেরেছে যে সিংহ তার শত্রু। তাই বইয়ের পাতায় বা অন্যত্র সিংহের ছবি দেখলেই সরোষে ছিঁড়ে ফেলে দেয়— বলে বেটা আমাকে মারবি, এখন তোকে রক্ষা করে কে?

একদিন রথের মেলায় গিয়ে একটা কাঠের সিংহ দেখে ভাঙতে উদ্যত হ'লে দোকানী বলল, কি করো?

শিশুটি বললো ভাঙবো, সিংহ আমার শত্রু।

দোকানী হেসে বলল, দাম দিয়ে কিনে নাও, তারপরে বধ করো। দেখো কর্তা ওর মধ্যে পেরেক আছে।

ছেলেটি কাঠের সিংহটি বাড়িতে নিয়ে এসে আছাড় দিয়ে ভাঙলো। সিংহটি কাঠের বিধায় সহজেই ভেঙে গেল, সিংহদমনের হাতে বিঁধে গেল একটা পেরেক, ঐ পেরেকটি দিয়ে সিংহের দুটো অংশ জোড়া দেওয়া ছিল। ছেলেটির হাতে রক্তপাত হ'ল। পেরেকটি ছিল মরচে ধরা। রাতে শিশুর জ্বর হ'ল।

এদিকে বৃদ্ধ মাঠের মধ্যে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। আকাশে উড়ে যাচ্ছিল একটা ঈগল পাখি, মুখে ছিল একটা কচ্ছপ। কচ্ছপের ছটফটানিতে হঠাৎ সেটি মুখভ্রষ্ট হ'ল আর পড়বি তো পড়, পড়লো সুখশায়িত বৃদ্ধের প্রশস্ত টাকের উপরে। ভোর রাত্রে এক সঙ্গে পৌত্রের ও পিতার মৃত্যু। শোকাকুল পিতা দুই ঠিকুজি হাতে করে সগর্জনে ছুটে গেল জ্যোতিষীর বাড়িতে। জ্যোতিষী শান্তভাবে বলল—- বাবুজি এরকম ক্ষেত্রে শোক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভেবে দেখুন— আমার গণনা তো নিস্ফল হয়নি. সিংহারিষ্ঠ ও ইষ্টকারিষ্টই তো এদের মৃত্যুর কারণ।

ক্রুদ্ধ পিতা বলে উঠলো, তোর ঠিকুজির নিকুচি করি। এই বলে ঠিকুজি দুখানা ছিঁড়ে ফেলে দিল।

গুল-ই-ঘনাদা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হ্যাঁ, সত্যিই অবিশ্বাস্য অঘটন।

ঘনাদা রাজী। কষ্টে সৃষ্টে অনেক সাধাসাধির পর নয়, রাজী এক কথায়। মুখ থেকে কথাটা পড়বামাত্র ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়েছেন ঘনাদা। আর সেইটেই অবিশ্বাস্য অঘটন।

সত্যি কথা বলতে গেলে এরকম অঘটনের জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

আমাদের সব প্যাঁচ তাই কেটে গেছে, সব চাল বানচাল, সব বুদ্ধি গুলিয়ে গিয়ে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি।

তা হতবুদ্ধি হওয়া আর আশ্চর্য কী!

আমরা আটঘাট বেঁধে কিস্তিমাতের জন্যে যেভাবে সব ঘুঁটি সাজিয়ে ছিলাম, ঘনাদা একটি চালে তা ভেস্তে দিয়েছেন।

ঘনাদা রাজী হবেন না কিছুতেই, এই নিশ্চিত বিশ্বাসের ওপরই আমাদের সব চাল ছকে রাখা ছিল।

তিনি অস্থির হয়ে উঠবেন আমাদের বায়না এড়াবার জন্যে, আর আমরা তাঁর নিজের হামবড়াইয়ের প্যাঁচেই তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে জব্দ করব, এই ছিল মতলব।

সেই মতলবেই সবাই মিলে সেদিন একেবারে চোখে মুখে যেন আগুনের হল্‌কা নিয়েই ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে টঙের ঘরে ঢুকেছিলাম।

"না, এ অপমান আর সহ্য করা যায় না।"

— এর একটা বিহিত না করলেই নয়!

— আমাদের একেবারে জাত তুলে যা তা বলা!

ঘনাদা কি একেবারে নির্বিকার নির্লিপ্ত?

না। তা ঠিক নয়। চোয়ালের-হাড়-ঠেলা-কুড়ুল-মার্কা মুখে ভাবান্তর কিছু অবশ্য দেখা যায়নি। কিন্তু গড়গড়ায় টান দেওয়ার মাত্রাটা বেশ একটু বেড়ে যাওয়াতেই আশ্বস্ত হয়েছি। ওষুধটা প্রথম দাগ পড়তেই কাজ হচ্ছে বোঝা গিয়েছে।

হুঁকোয় ঘন ঘন টান দেওয়াটা তাঁর হুশিয়ারিরই লক্ষণ। আমরা কোন দিক দিয়ে কীরকম হানা দিতে যাচ্ছি তা আঁচ করে তার মওকা নেবার ফিকিরই তিনি ভাবছেন নিশ্চয়।

খুশী হয়ে আমরা আমাদের পরের চাল এবার চেলেছি।

— কোন হাটে যে ছুট বেচতে এসেছে, বাছাধন এখনো জানে না। নাক বেঁকিয়ে বলেছে এবার শিশির।

— থোতা মুখ কেমন করে ভোঁদা করতে হয়, এবার দেখাচ্ছি। গৌর দাঁতে দাঁত

ঘষে বলেছে।

এরপর শিবু আমাদের সাজানো ছক মাফিক একটু উল্টো সুর ধরেছে, "কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঘনাদাকে জ্বালাতন করা কি ঠিক হচ্ছে?"

— তুচ্ছ ব্যাপার! আমি ক্ষেপে উঠেছে শিবুর ওপর, আমরা বন্দুক ধরতেই জানি না বলে টিটকিরি দেওয়াটা তুচ্ছ ব্যাপার হল?

বেশ, তুচ্ছ ব্যাপারই সই, গৌর শিবুর কথাটার পেঁচিয়ে ধরে বলেছে, কত যে তুচ্ছ, ঘনাটা তাই শুধু দেখিয়ে দেবেন! ডান হাতটাও লাগাতে হবে না ওঁকে। বাঁ হাতেই বুল্‌স আই শতকরা নিরানব্বই বার।

ঘনাদার নীরব সম্মতিটা যেন পেয়েই গেছি এমনি উৎসাহে সবাই এবার ব্যাপারটা নিয়ে মেতে উঠেছি।

ঘনাদাকে ত আর চেনে না। শিশির শুরু করেছে, ওঁকে নিয়ে আজ বিকেলে হাজির হলে সেই রকম টিটকিরিই নিশ্চয় দেবে। বলবে, কী! বন্দুক ছোঁড়ার শখ এখনো মেটেনি বুঝি? বুকে হাতে এমব্রোকেশন মালিশ করে আবার তাই এসেছে। সঙ্গে এ মূর্তিমানটি আবার কে?

উনি মানে উনি, আমরা যেন আমতা আমতা করে বলব, আমি এবার কল্পনার সুতো ছেড়েছি, উনি একটু চেষ্টা করে দেখতে চাইছেন।

চেষ্টা শুনেই ভুরু দুটো কোঁচকাবে নিশ্চয়, আর সেই সঙ্গে টিপ্পনি শোনা যাবে। চেষ্টা করবেন উনি? বন্দুকটা তুলতে পারবেন ত।

ঘনাদা তারপর অতি কষ্টেই যেন বন্দুকটা তুলবেন। এবার খেই ধরেছে গৌর, তারপর ডান কাঁধ না বাঁ কাঁধে লাগাবে ঠিক করতে না পেরে শুধু হাতে ধরেই গোড়াটা টিপে বসবেন।

তারপর হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার! শিবুও যেন আর মেতে না উঠে পারে নি। নিশানার মাঝখানের লাল আলোয় ডুমটাই ফটাস। বন্দুকওয়ালার চোখ কি ছানাবড়া? আমি নিজেই জিজ্ঞেস করে তার জবাব দিয়েছি, উহুঃ, এখনো নয় হঠাৎ বেপটকা গুলিটা লেগে গিয়েছে ভেবে সে বদমেজাজে একটু ঠোঁট বেঁকিয়েই বলবে — কী আরো ছোঁড়ার শখ আছে নাকি?

কী বলবেন তাতে ঘনাদা?

ঘনাদা কেন, আমরাই যা বলবার বলব। শিশির এবার দোহার দিয়েছে, মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলব, তা একটু আছে।

বেশ ছুঁড়েই দেখো তাহলে ; বন্দুকওয়ালা এবার দাঁত খিঁচিয়েই বলবে নিশ্চয়।

তাতে আমরা যেন আরো ভড়কে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বলব, কিন্তু নিশানার মাঝখানে আর একটা লাল আলোর ডুম দিলে হয় না?

আবার আল বাল্‌ব? লোকটার মুখটা যা তখন হবে! রীতিমত চিড়বিড়িয়ে উঠে

বলবে, লাল বাল্‌বের বুল্‌স আই আবার দাগবার আশা আছে নাকি! থাক! থাক! খুব কেরামতি হয়েছে। আর দুটো গুলি পাওনা আছে। এমনি ছুঁড়ে দিয়ে বিদেয় হও।

কিন্তু এখানকার চাঁদমারির যা নিয়ম, আমরা সবিনয়ে বলব, সেটা মানা উচিত নয় কি?

ও, নিয়ম দেখাতে এসেছ? আমাদের চিবিয়ে খাবার মত গলায় বলবে বন্ধুকওয়ালা, বেশ, বুল্‌স-আইয়ের লাল বাল্‌বই লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখি নিশানদারির দৌড়। দেখি কটা বাল্‌ব ফাটে!

বুল্‌স আইয়ের লাল আলোর ডুম কিন্তু ফাটবে। একটা দুটো নয়, পর পর পাঁচটা দশটা পনেরটা!

বন্দুকওয়ালার মুখখানা তখন কী হবে? কেলে হাঁড়ি না জ্বালা?

ও, কী শিক্ষাটাই হবে!

আপনাকে কিন্তু আজ যেতেই হবে ঘনাদা।

বন্দুকওয়ালার নাকটা একেবারে ওর ওই নকল চাঁদমারির মাটিতেই ঘষে দিয়ে আসব।

একজিবিশনে বিকেল চারটে থেকে লোক জমতে শুরু হয়। সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ পুরস্কারের লোভে চাঁদমারি মানে শুটিং গ্যালারি জম-জমাট হয়ে ওঠে।

ঠিক সেই মোক্ষম সময়টিতে আপনাকে নিয়ে গিয়ে হাজির হব। আজ সাতটায় একজিবিশনের চাঁদমারিতে বাহাদুরকা খেল হবে বলে লাউডস্পীকারের ঘোষণার ব্যবস্থাও আমর করে এসেছি।

আঃ ছবিটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চাঁদমারির সামনে লোকে লোকারণ্য। বন্দুকওয়ালা হতভাগা চিপটেন কেটে কেটে সকলকে অপমান করে তাল ঠুকছে, — কই! সব ঠুটো হয়ে দাঁড়িয়ে কেন? কার কত মুরোদ বন্দুকটা ছুঁড়ে দেখিয়ে যাক। ঠিক সেই সময়ে আপনাকে নিয়ে ঢুকব। বন্দুকওয়ালা ও অন্য সবাইরাও নিশ্চয় ভাববে এ তালেবরটি কে?

তালেবরটি যে কে তা ভালো করে বুঝিয়ে ওই মেলাভর্তি লোকের মাঝখানে নাকখত খাইয়ে সব টিটকিরির শোধ আজ নিতেই হবে।

আপনি তৈরী থাকবেন ঘনাদা, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায়।

আমরা সব কথা যেন পাকা করে ওঠবার উপক্রম করেছি।

আসল খেল এইবারই শুরু হবার কথা। ঘনাদা কেমন করে ও-দায় থেকে পিছলে বার হবার চেষ্টা করেন সেই মজা দেখাই আমাদের মতলব।

গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে — ঘনাদার 'আ—চ্ছা' বলে একটু টান দেওয়ার সেই আসাতেই ফিরে তাকিয়েছি।

কিন্তু এ কি বলছেন ঘনাদা! প্রশ্নটা একটু বেয়াড়া নয় কি?

ঘনাদা অত্যন্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করছেন, "বন্দুকটা কী বলো ত। গান না

রাইফেল?"

"বন্দুকটা...বন্দুকটা?" আমরা একটু বুঝি থতমত খেয়েছি। তারপর গৌরই প্রথম সামলে উঠে বলেছে, "বন্দুকটা রাইফেল!"

"ভালো! ভালো!" ঘনাদা যেন খুশি হয়েছেন। আর আমরা বেশ ভাবিত হয়ে উঠেছি। লক্ষণটাও ভালো নয়। ঘনাদার কি এখন বন্দুকের খবর নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়।

রাইফেলের খোঁজ নেওয়াটা ঘনাদার সেই ভড়কানিরই হয়ত একটা লক্ষণ ভেবে মনকে অবশ্য প্রবোধ দিয়েছি। তাঁর পরের প্রশ্নে সেই আশায় একটা হাওয়াও লেগেছে।

"আচ্ছা", ঘনাদা গড়গড়ার দুটো টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, "তোমাদের ওই খেলার চাঁদমারির মালিকের নামটা কী তা জানো নাকি।"

"তা আর জানি না?" "নাম হল অটো কালেদ।"

"অটো কালেদ!" নামটা বার তিনেক যেন জিভে তারিয়ে তারিয়ে উচ্চারণ করেছেন ঘনাদা।

আর তারপর আমাদের একেবারে আক্কেলগুড়ুম করে দেওয়া সেই বাণীটি শুনিয়েছেন। ঘাড় নেড়ে বলেছেন, "বেশ। যাবো তাহলে।"

"যাবেন?"

আমাদের উল্লাসটা একটু বোধহয় আর্তনাদের মত শুনিয়েছে।

তবু সেই রকমই একটা ভাব বজায় রেখে উল্টো প্যাঁচ কষা শুরু করতে হয়েছে তখনই।

"ভাবছি, আগে থাকতে একটা পোস্টার ছাড়লাম না কেন? সারা শহরে একটা শোরগোল তুলে দিতে পারতাম।"

"শোরগোল এমনিতে কিছু কম হবে ভাবছিস্?" গৌর শিশিরকে সংশোধন করেছে, মুখেই যা রটাবার ব্যবস্থা করেছি তাতে কাতারে কাতারে লোক ওখানে গিয়ে জড় হবে দেখিস।

তাছাড়া ওখানে গিয়েই ত একজিবিশনের লাউডস্পীকারে সব ঘোষণা করে দেব। শিবু তার পরিকল্পনাটা জানিয়েছে।

"ঘোষণাটা কি হবে কিছু ভেবেছিস?" জিজ্ঞাসা করেছি আমি।

"তা আর ভাবিনি?" শিবু গড়গড় করে তার ঘোষণা শুনিয়েছে, আসুন, আসুন, দলে দলে চাঁদমারিতে এসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিশানাদারি দেখে জীবন সার্থক করুন।

ঘোষণাটা বাতলাতে বাতলাতে ঘনাদার দিকে চেয়ে শিবু জিজ্ঞাসা করেছে, "আপনার সেই ইওরোপের কীর্তিটাও বলব নাকি?"

ঘনাদাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমি জানতে চেয়েছি,

"কোন কীর্তিটার কথা ভাবছিস? লেনিনগ্রাডে রিভলভারে সেই মাছি মারা, না ড্যানিউব দিয়ে হাইড্রোফয়েলে যেতে যেতে সেই ......"

কীর্তিটা চটপট ভেবে নিতে না পেরে যে অপ্রস্তুত অবস্থাটা হতে পারত, শিবু ধমক দিয়ে তা থেকে আমায় বাঁচিয়েছে।

"ওই রেকর্ডের কথাই বলব ত?" প্রশ্নটা এবার সরাসরি ঘনাদাকে। ঘনাদার কোনো ভাবান্তর দেখা যায়নি। একটু যেন সবিনয়ে বলেছেন, "কিন্তু ওসব কথা না বলাই ত ভালো।"

ঘনাদা বলেছেন, "না বলাই ভালো।" তার মানে বলাতেও ঘনাদার বিশেষ আপত্তি নেই! অর্থাৎ ঘনাদা তাঁর সায়-দেওয়া নাকচ করছেন না। সত্যিই আমাদের আবদার রেখে বিকেলে বন্দুকের কেরামতি দেখাতে একজিবিশনের মেলায় যেতে রাজী!

এরপর 'তদা না শংসে বিজয়ায়' মার্কা মুখে রীতিমত দিশহারা হয়ে নেমে আসা ছাড়া আর করবার কী আছে! নামতে নামতে ভেবেছি — আমাদের চালাকি কি বুমেরাং হয়ে আমাদের ওপরই এসে হানা দিতে যাচ্ছে?

সকাল থেকে দুপুর আর দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে যাওয়ার পর সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না।

এর আগে দু দুবার ঘনাদা মুখে এমনি আমাদের আবদারে সায় দিতে বাধ্য হলেও জিরো আওয়ারের আগে একটা-না একটা ফিকিরে আমাদের ফাঁস ফসকে বেরিয়ে গেছেন।

ঘনাদা শেষ মুহূর্তে সেই রকম একটা ছুতো বার করবেন এ আশা কিন্তু বিফলই হল। ছ'টার পর সাড়ে ছ'টা বাজাতে ঘনাদাকে নিয়ে একজিবিশনের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া ছাড়া উপায় রইল না।

তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। রাস্তায় বেরিয়ে পড়েও শেষ চেষ্টা করতে বাকি রাখলাম না। ঘনাদাকে বেমালুম সরে পড়বার যত রকম সম্ভব সব সুযোগই দিলাম। ট্যাক্সির নামও না করে ইচ্ছে করেই ঘনাদাকে সসম্মানে পেছনের দিকে বসিয়ে নিজেরা ট্রামের সামনে গিয়ে বসলাম আর সারা রাস্তায় ভুলেও একবার পেছনে ফিরে তাকালাম না।

নামবার জায়গায় কাছাকাছি এসে দুরুদুরু বুকে বেশ একটু ব্যাকুলভাবেই পিছন ফিরে তাকালাম। তাকিয়েই বুকগুলো দমে গেল।

ঘনাদা জাজ্বল্যমান চেহারায় সেখানে বসে আছেন। মুখ ঘোরাতে দেখে বেশ একটু উৎসুকভাবেই যেন বললেন, "কী হে, এইখানেই নামতে হবে না?"

সেইখানেই নামলাম, আর তারপর থেকেই ভূমিকা বদলাতে হ'ল ঘনাদার নয়, আমাদেরই এখন পালাবার ফিকির খোঁজার গরজ। ট্রাম স্টপ থেকে নেমে একজিবিশনের গেটে যেতে যেতেই ফন্দিটা ঠিক করে কাজে লাগালাম।

বুদ্ধির বাহাদুরি-টুরি কিছু নয়, নেহাত ছেলেমানুষী ফন্দি কোনরকমে কায়দা করে ঘনাদাকে টিকিট কিনে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার পর নিজেরা গেট থেকেই হাওয়া।

এ-রকম একটা কাঁচা চালে শেষরক্ষা হবে না জানি, তবু আপাতত মান বাঁচিয়ে

একটা কৈফিয়ত বানাবার ফুরসত ত পাওয়া যাবে।

কিন্তু চলনসই একটা কৈফিয়ত খাড়া করাও কি সম্ভব?

একজিবিশনের গেট থেকে পালিয়ে এলোপাথাড়ি এ রাস্তায় সে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পরামর্শ করে কোনো কূলই পেলাম না। যে-গল্পই সাজাই, সবই যে শতচ্ছিদ্র তা বুঝতে পারি। সারারাত ত বাইরে কাটান যায় না, পালিয়েও যাওয়া যায় না বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে।

শেস পর্যন্ত মরীয়া হয়েই বনমালী নস্কর লেনে গিয়ে ঢুকলাম!

ঘনাদাকে কী মূর্তিতে যে দেখব তা ত বুঝতেই পারছি। কপালে যা আছে তার কাছে ফাঁসি দ্বীপান্তরও তুচ্ছ। তবু যা হয় হোক সাফ সাচ্চা কথাই বলে দেব।

বলার ভাবনাগুলো নীচে থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে জমে পাথর হয়ে গেল। বনোয়ারী তখন আমাদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে ওপরে যাচ্ছে।

কিন্তু ওর হাতের ট্রেতে ওসব ঢাকা প্লেট কিসের?

"এসব কী বনোয়ারী? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?" জিজ্ঞাসা করতেই হল হতভম্ব হয়ে।

বনোয়ারী যা জবাব দিল, তাতে একেবারে তাজ্জব। প্লেটগুলো নাকি কবিরাজী কাটলেটের আর বনোয়ারী এসব নাকি বড়বাবু মানে ঘনাদার ফরমাসেই তাঁর কাছে দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ট্রেতে অমন পাঁচ পাঁচটা প্লেট কেন? তোমার বড়বাবু কি পাঁচ প্লেটই সাঁটবেন?

"না, তা নয়", বনোয়ারী হাসিমুখে জানাল যে, "পাঁচটার মধ্যে চারটে প্লেট আমাদের জন্যে।"

"আমাদের জন্যে? আমাদের জন্যে ঘনাদা নিজে থেকে কবিরাজী কাটলেটের অর্ডার দিয়ে রেখেছেন? তা তিনি কোথায়? তাঁর টঙের ঘরে?"

"না, টঙের ঘরে নয়, দোতলায় আমাদের আড্ডা ঘরে নয়, দোতলায় আমাদের আড্ডা ঘরেই তিনি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

ঘনাদার অপেক্ষা করাটা কী ধরনের? আমাদের জন্যে এ-ভোজের ব্যবস্থা করারই বা মানে কী?

খাঁড়ার কোপ দেবার আগে বলির ছাগেদের জন্যে যেমন নধর ঘাসের ব্যবস্থা থাকে তেমনি কিছু?

দুরুদুরু বুকে ওপরের উঠে দোতলার বারান্দা দিয়ে আড্ডা-ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই একেবারে হতভম্ব। ঘনাদা বেশ মৌজ করে তাঁর মৌরসী আরাম কেদারায় গা এলিয়ে শুয়ে গড়গড়া টানছেন। তাঁর সামনে টেবিলেরই পাঁচ-পাঁচটি প্লেট সমেত বনোয়ারীর ট্রেটি রাখা!

হতভম্ব শুধু ঘনাদাকে অমনভাবে শায়িত দেখে নয়, আমাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবিশ্বাস্য সম্ভাষণ শুনেও।

এসো, এসো, ঘনাদা যেন সাদরে বললেন, মিছিমিছি হয়রান হয়ে এলে তো?

কথাগুলো বাঁকা না সোজা আর ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে ধরতে না পেরে খুনের আসামীদের মতই ভয়ে-ভয়ে যে যেখানে পারি টান হয়ে গিয়ে বসলাম।

বনোয়ারী তার ট্রেটা সামনের টেবিলে রেখে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা বসবামাত্র হাতেহাতে এক-একটা প্লেট ধরিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু প্লেট থেকে যত মনমাতানো গন্ধই পাই, সে-দিকে দৃষ্টি দেবার মত মেজাজ কি তখন আছে?

অবস্থাটা বুঝে ঘনাদার এবার দৃষ্টান্ত ও উপদেশে আমাদের উৎসাহিত করলেন। নিজের ম্যাগ্নম প্লেটটির প্রতি মনোনিবেশ করে নাও, নাও খেয়ে নাও। মোড়ের প্যারিস গ্রীল থেকে অর্ডার দিয়ে আনা স্পেশ্যাল কবিরাজী। ঠাণ্ডা হলে আর তার পাবে না!

ঘনাদার কথায় কবিরাজী কাটলেটের সদ্গতিতে মন দিতে হল, কিন্তু রহস্যটা কি তখনো ভেবে থই পাচ্ছি না। ঘনাদার মহানুভবতা একটা মাত্রাছাড়া মনে হচ্ছে না এ ব্যাপারে? আমাদের নির্বোধ চালাকি হাতে-নাতে ধরে ফেলেও তিনি প্রসন্ন মনে আমাদের নিজে থেকে স্পেশ্যাল কবিরাজী কাটলেট অর্ডার দিয়ে আনিয়েছেন। আবার আমাদেরই হয়রানির জন্যে সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

যা দেখছি শুনছি, তা কি স্বপ্ন না সত্যি!

তা স্বপ্ন বলে মনে হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়।

নিজের ঢাউস প্লেটের জোড়া-কাটলেট চেটেপুটে শেষ করে আমাদের এই ঘোর লাগা অবস্থাতেই ঘনাদা তাঁর প্রথম সম্ভাষণের খেই ধরলে, তোমাদের ওই অটো কালেদ না কি নাম তাকে আর খুঁজে পাওনি ত? আর পাবেওনা। আমিও পাইনি।

আপনিও পান নি? আমাদের ধরা গলা থেকে তাঁর কথায় একটু অস্ফুট প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু বার হল না।

হ্যাঁ, ঘনাদা গলায় একটা যেন করুণা মিশিয়ে বললেন, বেচারা আজ সকালেই মেলা থেকে সব পাত্তাড়ি গুটিয়ে পালিয়েছে। তবে আমার কাছ থেকে পালাবে কোথায়? মেলায় না পেলেও যেখানে ধরবার ঠিক তাকে গিয়ে ধরেছি।

আপনি ওই অটো কালেদকে শেষ পর্যন্ত ধরেছেন? কী করে? কোথায় ধরলেন? তাঁর খোঁজ পেলেন কী করে?

খোঁজ পেলাম ওই নামটা থেকেই? ঘনাদা স্নেহের দৃষ্টিতে আমাদের যেন একটু তিরস্কার করে বললে, অমন একটা আজগুবী নাম দেখেই ত লোকটা যে নকল জাল তা বোঝা উচিত ছিল। অটো হল খাস জার্মান নাম আর কালেদ খাঁটি যুগোশ্লভি পদবী। নেহাত আহাম্মক ছাড়া ওই বেজাত শব্দ জুড়ে কেউ নকল নাম বানায়?

ঘনাদা একটু থেমে জবাবের আশাতেই আমাদের দিকে চাইলেন কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের চোখগুলো তখন ঘরের মেঝেতেই নেমে গেছে।

ঘনাদা একটু যেন হেসে তারপর আবার শুরু করলেন, নামটা শুনেই সন্দেহ হয়েছিল।

বন্দুকের নিশানদারি নিয়ে দেমাক আর মেলায় চাঁদমারি খুলে কারবার করার কথা জেনে ছদ্মনামের ধড়িবাজটি যে কে তা বুঝতে বাকি রইল না। মেলায় গিয়ে ধরবার আগেই সে হয়ত হাওয়া হবে এ-ভয় অবশ্য আমার ছিল, তাই তার পালাবার ফিকির আর রাস্তাটাও আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম।

আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিলেন?

ও কথা তোমাদের ওই অটো কালেদও জিজ্ঞাসা করেছিল, তাকে তার লুকানো আস্তানায় গিয়ে ধরবার পরে। ঘনাদা বলে চললেন প্রথমে ত দেখাই করতে চায় না! ডকের পাহারাদার ভেতর থেকে খবর নিয়ে এসে জানালে যে কালেদ সাহেব কারুর সঙ্গে দেখা করতে চান না।

দেখা করতে চান না? বটে? মোক্ষম মন্তরটি লিখে পাহারাদার সেপাইকে বললাম, এইটি শুধু সাহেবের কাছে দিয়ে এসো। দেখা যাক তিনি কী বলেন।

ব্যস, চিরকুটে লেখা ওই দুটি শব্দতেই একেবারে যেন ভোজবাজি হয়ে গেল। পাহারাদার খবর আনবে কী, তোমাদের কালেদ সাহেব নিজেই ছুটে এলেন হন্তদন্ত হয়ে।

..... এমনি মন্ত্রের গুণ? মন্ত্রটা কী?

.....মন্ত্রটা শুনতে চাও, মন্ত্রটা এমন কিছু নয় শুধু দুটি শব্দ। পারদাচিরস মার্মোরেটত।

কী বললেন? পর্দা চিরে মারবাস ঠাস্? ওই হিং-ঠিং-ছট শব্দের এত গুণ?

হ্যাঁ, ঘনাদা মৃদু একটু হাসলেন, ও দুটো তোমাদের ওই কালেদ সাহেবের কাছে যেন সাপের মন্তর। একবার আওড়ালে ফণা নামিয়ে সুড়সুড় করে যেদিকে চাও সেদিকে চলে। ওই মন্তরটি জানলে তোমরাই ওকে বাঁদর নাচ নাচাতে পারতে।

কাঁপতে কাঁপতে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করার পর ওকে অবশ্য ভালো রকম ধাতানিই দিয়েছি। বলেছি তোমার চাঁদমারির নামডাক শুনে হাতের তাক একটু ঝালাতে এসেছিলাম যে হে। দেখতে এসেছিলাম স্কীট না সোজাসুজি টার্গেট শুটিং-এর ব্যবস্থা করেছ।

মুখখানা কাঁচুমাচু করে তোমাদের কালেদ বলেছিল, না, না, স্কীট কি ট্রাটের ব্যবস্থা কী করে করব? শুধু ওই একটু টার্গেট শুটিং — ওই পর্যন্ত শুনেই ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, টার্গেট শুটিং? ভড়কিবাজির আর জায়গা পাওনি? বুলস্ আই-এ লাল বাল্ব দিয়ে টার্গেট শুটিং কোথায় দেখেছ শুনি? আর যত মুখখু গোলা লোক পেয়ে রাইফেলের ভাওতা দিয়েছ? কী রাইফেল তোমার? কত গেজের? বারো কুড়ি না আটাশের? উনিশ শ তিনের স্প্রিংফিল্ড আরমারি না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেমি অটোমেটিক? আজ্ঞে কেন আর লজ্জা দিচ্ছেন! — করুণ মুখ করে বলেছে তোমাদের কালেজ, সবাই সমান মুখখু জেনে এয়ার গানকেই আসল রাইফেল বলে চালিয়েছি। বন্দুকের বিদ্যে ত আমাদের সকলের ঢু ঢু, বন্দুকের কথা ছেড়ে আমার খোঁজ পেলেন কী করে সেইটে যদি বলেন।

আমাদেরও এই এক কথা। বন্দুকের কুলুজির চেয়ে ঘনাদার খালেদ থুড়ি কালেদ

সন্ধানের রহস্যটাই আগে জানতে চাই।

ঘনাদা নিজে থেকেই অবশ্য দয়া করে আমাদের অটো কালেদেরই যেন মিনতি রাখলেন। বললাম, কেমন করে খোঁজ পেলাম? খোঁজ পাওয়া তো শক্ত কিছু নয়। সকালের খবরের কাগজটা পড়েই ত যা জানবার জেনে গেছি।

খবরের কাগজ পড়ে!

এবার সবিস্ময় উক্তিটা অটো কালেদের নয়, আমাদেরই।

হ্যাঁ, ঘনাদা করুণাভরে জানালেন, — খবরটা কাগজেই ছিল। কাগজটা কি ভালো করে পড়েছ আজ সকালে?

আজ্ঞে তা ত তন্ন তন্ন করেই পড়েছি মনে হচ্ছে, আমরা বিমূঢ় গলায় নিবেদন করলাম, কোনো খবর ত কোথাও পাইনি।

পাওনি? ঘনাদা অনুকম্পার হাসি হাসলেন, দেখোনি — বালবোয়া, এডেন, অ্যাকোয়াবা, সফান, লোডিং — ১৭ কে. পি. ডি. — রেডি — ক্লোজিং ১২।৩?

এগুলো কাগজের খবর? তার ওপর কালেদের সন্ধানের খেই? আমাদের হাঁ করা মুখগুলো এরপর আর কি বোজানো যায়? অবস্থাটা বুঝে ঘনাদা তাই ব্যাখ্যাটা করে দিলেন? বুঝতে পারছে না বুঝি কিছু? খুব ত খবরের কাগজ পড়ো তন্ন তন্ন করে: ও-খবর কোনোদিন দেখেন নি? আর ওগুলো জাহাজী খবর। শিপিং নিউজ-এ সবচেয়ে খুদে হরফে রোজ পাবে। যা এইমাত্র বললাম তার মানে হল বালবোয়া নামে জাহাজ এডেন অ্যাকোয়ারা ইত্যাদি বন্দরে পাড়ি দেবার জন্যে বারো তারিখ মানে আজই রওনা হচ্ছে।

এই খবর দেখেই বুঝলেন, যে ওই আমাদের খালেদ না কালেদ এইতেই পালাচ্ছে? আমাদের বিস্ময়যুক্ত সংশয় এবার সরবই হল।

তা আর বুঝব না? ঘনাদা আমাদের বুদ্ধির স্থূলতায় বেশ যেন হতাশ হলেন, তোমাদের অটো কালেদ যা চরিত্র তাতে হট করে প্লেনে পালানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাতে ভিসা পাসপোর্টের অনেক ঝামেলা আছে। তা ছাড়া তার নকল চাঁদমারির লটবহর ত সে ফেলে যেতে পারে না। তাই বালবোয়া গোছের কোনো মাল-জাহাজে যাওয়াই তার পক্ষে সুবিধে। প্লেনে নয়, সে এসেছিল নিশ্চয় ওইরকম কোনো জাহাজে। কাল হঠাৎ পালাবার তাড়ায় বালবোয়া জাহাজটাই যে সে বেছে নেবে, তা ওই বিজ্ঞাপন দেখেই বুঝলাম। কাল পর্যন্ত বালবোয়া জাহাজের লোডিং চালু ছিল। আজই সে জাহাজ ছাড়ছে। নিজের লটবহর বোঝাই করে চটপট সরে পড়বার এমন সুযোগ তোমাদের কালেদ ছাড়তে পারবে না বুঝেই ঠিক সময়ে গিয়ে ওই খিদিরপুরের সতেরো নম্বর ডকে গিয়ে তাকে ধরেছিলাম।

ধরে তাকে করলেন কী? আমরা এবার উদ্‌গ্রীব, পুলিশে দিলেন? পুলিশে! পুলিশে দেব অমন একটা বেচারা মানুষকে? ঘনাদা আমাদের যেন ধিক্কার দিয়ে বললেন, এখানে ওখানে তোমাদের মত মক্কেলদের একটু আধটু ভাঁওতা দিয়ে করে খায়, তাকে পুলিশে দেবার কী আছে? বন্দুকের ব না জেনে বোকার মত বাহাদুরি করাটা ত আর তার দোষ

নয়।

লজ্জায় আমাদের অধোবদন হওয়াই বোধহয় উচিত, তবু কৌতূহলটা চাপা গেল না। একটু বাধো-বাধো গলাতেই তাই জিজ্ঞাসা করলে শিবু, কিনতু ওই যে, আপনার পর্দা চিরে মার ঠাস না কী মন্ত্র.... পর্দা চিরে মার মার ঠাস নয়, ঘনাদা প্রায় ধমক দিয়ে শিবুকে থামিয়ে বললেন, কথাটা হল পারদাচিরস মার্মোরেটস।

ওই সমস্ত ঝাড়তেই ওই আমাদের খালেদ খুড়ি কালেদ অমন সুড়সুড়িয়ে এলো কেন? শিবু বোর নাছোড়বান্দা, একটা কিছু গলদ নিশ্চয় তার মধ্যে আছে। নইলে ও সাপের মন্তরে অত ভয় কেন?

ভয় নয়, ঘনাদাকে এবার প্রাঞ্জল হতে হল, ও মন্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা। ওই মন্তরের কল্যাণেই একদিন যে প্রাণে বেঁচেছিল, সেটুকু তোমাদের ওই কালেদ ভোলেনি।

ওই মন্তরের কল্যাণে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল? আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হল। কী থেকে। সাপের কামড়!

না, তার চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর কিছু। ঘনাদা গম্ভীর হলেন, দুনিয়ার যার চেয়ে হিংস্র আর সাংঘাতিক আর কোনো প্রাণী নেই।

প্রাণীটি কী জিজ্ঞাসা করবার অবসর না-দিয়েই ঘনাদা আবার শুরু করলেন শুধু এক মরুভূমির মাঝখানে সমুদ্রের বাড়িয়ে ধরা নুলোর মত এক উপসাগরের ধারে সেদিন ছিপ ফেলে বসেছিলাম। উপসাগরটা হল গাল্‌ফ অফ আকাবা আর মরুভূমিটা সিনাই! তখনও মরুভূমি দখল করেনি, সেটা লোহিত সমুদ্রের ধারে প্রায় বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে আছে।

কিছুদিন আগেই এক আরব নৌ যানে বারদরিয়ার সিনাইয়ের দক্ষিণের রাসমহম্মদে নেমে এই মরুর মাছে একটা আস্তানা করেছি।

আকাবা উপসাগরের জল একেবারে কাঁচের মত স্বচ্ছ। পাড়োর এক জায়গায় বসে নীচের চেতল মার্কা মাছটা যে আমার ছিপের টোপটার কাছে ঘোরাফেরা করছে তা তখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মাছটা টোপ গেলার সঙ্গে সঙ্গে টান দেওয়া কিন্তু আর হল না। হঠাৎ বন্দুকের শব্দে মরুভূমির নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল, সেই সঙ্গে একটা গুলি আমার ছিপের ডগাটা প্রায় ছুঁয়ে ডান দিকের বালিতে গিয়ে বিঁধেছে টের পেলাম।

গুলি কে ছুঁড়েছে তা জানতে দেরি হল না। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই কাছের একটা বালিয়াড়ির পাশ থেকে দুই মুর্তিকে বেরিয়ে আমারই দিকে আসতে দেখলাম। তাদের মধ্যে একজন তোমাদের এই অটো কালেদ, আর অন্যজন লম্বায় চওড়ায় প্রায় দৈত্যের মত তামাটে রঙের একটি মানুষ।

সেই মানুষটাই যে সর্দার আর তোমাদের কালেদ যে তার সাকরেদ তা বুঝতে দেরি হয় না। লোকটার চেহারা দুযমনের মত হলেও ব্যবহারটা খুব হাসিখুশি প্রাণখোলা।

আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাসির দমকে মরুভূমি কাঁপিয়ে বললে, কী দরবেশ বাবাজী, পেটের পিলে চমকে গেছে নাকি?

চা গেছে! হেসেই বললাম, তবে মাছটা যে ফসকালো, সেইটেই দুঃখ। দিচ্ছিলাম। বলে লোকটার আবার সে কী হাসির ধুম।

হাসি থামিয়ে সে কিন্তু খুব উৎসাহের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় করলে। বেশি এস্‌কল বলে নিজের পরিচয় দিয়ে আমার নামটা জানবার পর আমার হাত ধরে সে কী আমাদের ঝাঁকানি!

তার ঝাঁকুনিতে আমায় বারতিনেক বালির ওপর আছড়ে ফেলে তারপর তার যেন হুঁশ হল।

আরে! তুমি যে বালিতেই শুয়ে আছ বলে আমায় হেঁচকা-টানে তুলে মিটে গলাতেই জিজ্ঞাসা করলে, তা কি মাছ ধরছিলে?

যা ধরছিলাম তা ত তোমার বন্দুকের গুলিতেই ফসকে গেল। আমি অসাড় ডান হাতটা বাঁ হাত দিয়ে যথাসম্ভব মাসাজ করতে করতে বললাম, তবে একটা মাছ আগেই ধরেছি।

তাই নাকি! কী ধরেছে দেখি। এস্‌কল উদগ্রীব হয়ে উঠতে মাছের থলিটা খুলে তাকে দেখিয়ে বললাম ধরেছি এই দুটো মোজেস-এর সোল।

মোজেসের সোল! এসকল ভুরু কুঁচকে মুখ বেঁকিয়ে বললে, ও আবার কী নাম!

না, অন্য নামও আছে। তাকে আশ্বস্ত করলাম, তবে নামে কী দরকার? মাছ খাবার মত হলেই হল।

খাবার মত মাছ ধরবার আর কি জায়গা ছিল না! এস্‌কলের গলায় এবার একটু বাঁকা সুর, মরতে এই মরুভূমিতে এসেছ কেন? মরতে তুমিও ত এখানে এসেছ। একটু হেসে বললাম, মরু হলে কি হয়, এখানে মধু আছে নিশ্চয়।

আছে নাকি? এস্‌কলের চেহারা আর গলাটা একসঙ্গে রুক্ষ হয়ে উঠল হঠাৎ, তা তোর মধু ত এই আকাবা খাঁড়ির মাছে। এই পুঁচকের বদলে বড় মাছ ধরলেই পারিস!

বড় মাছ আবার এখানে কী? আমি একটু বোকা সাজলাম।

বড় মাছ কী জানিস না? এবার হিংস্র গলায় বললে এস্‌কল, জলের দিকে চেয়েই দেখ না একবার।

যা দেখবার তা আগেই আমি দেখেছি! যেখানে আমি ছিপ নিয়ে বসেছিলাম, ঠিক তার নীচেই খাঁড়ির কাকচক্ষু জলে এক সঙ্গে তিন তিনটে সমুদ্রের যমদূত ঘুরছে।

যেন চাট্টা ভেবে সরলভাবে বললাম, যাঃ। এগুলো তো হাঙর। আবার যেমন তেমন নয়। আসল মানুষ-খোকো ট্রাইনোডন ওবেসস্? হু, এস্‌কল চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, হাঙরদের ঠিকুজি কুষ্টি জেনে ফেলেছিস দেখছি।

তা জানতে হবে না। আমি যেন তার প্রশংসায় একটু ফুলে উঠে বললাম, শুধু কি এখানকার হাঙর, এ বালির রাজ্যের আরো অনেক গুলুক সন্ধানই যে এক কদিন নিয়ে ফেলেছি।

নিয়ে ফেলেছিস — এস্‌কলের চোখ দুটো এবার যেন জ্বলছে মনে হল, তাহলে হাঙ্গর ধরাই ত তোর এখন দরকার!

কী করে ধরব? আমি যেন এস্‌কলের কাছেই আর্জি জানালাম, ছিপে কি হাঙ্গর ধরা যায়?

তাহলে ঝাপটে গিয়ে ধর। বলে সেই তামাটে দৈত্য আমায় খাঁড়ির পাড় থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিলে।

ইচ্ছে করলে চক্ষের নিমেষে সরে গিয়ে ওই পাঁচমণি লাশকে নিজের ঠেলাতেই খাঁড়ির তলাতে পাঠাতে পারতুম। কিন্তু তার বদলে এক হাতে আমার মাছের থলে নিয়ে আর এক হাতে এতক্ষণ যে তার ওস্তাদের পাশে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তোমাদের সেই অটো কালেদকে জড়িয়ে টান দিয়ে খাঁড়ির জলে গিয়ে পড়লাম।

হাঙ্গর কটা তখনকার মত সেখান থেকে চলে গেছে। তারা ফেরার আগেই এস্‌কল তার নিজের সাকরেদ তোমাদের ওই কালেদকে তোলবার ব্যবস্থা করবে ভেবেছিলাম। কিন্তু সে রকম কোনো মতলব তার দেখা গেল না। তোমাদের কালেদের দরকার তার কাছে বোধহয় ফুরিয়েছিল। তাই আমার সঙ্গে আরেকটা আপদ যেন বিদেয় হল এমনি তখন তার মুখের চেহারা। সেই চেহারায় আমায় একটা টিট্‌কিরির সেলাম দিয়ে তাকে চলে যেতে একবার শুধু তাকে ডেকে ফেরালাম। একটা কথা রাখবে দোস্ত?

কী, কী কথা! সে বিদ্রূপ ভরে জিজ্ঞসা করলে।

এই শেষ একটা উইল করে যাবার ইচ্ছে ছিল। একটু শুনে নেবে? হাঙ্গর কটা তখন আবার আমাদের দিকেই আসছে। সে দিকে চেয়ে সে হায়নার হাসি হেসে উঠে বললে, উইলের অত তাড়া কিসের? কাল আসিস্। শুনব।

তার হুকুম মেনে পরের দিনই এলাম! এস্‌কল তখন একা-একা খাঁড়ির পাড়ে আমারই মত ছিপ ফেলে বসে আছে।

হঠাৎ বন্দুকের গুলিতে তার ছিপের সুতোটা গেল ছিঁড়ে। এস্‌কল তা একেবারে ভ্যাবাচাকা। তার একশ গজের মধ্যে কাউকে না দেখতে পেয়ে আরো তাজ্জব। এত দূর থেকে ছিপের সুতো ছেঁড়বার মত গুলির তাগ কার?

না, আমাদের কাশি পর্যন্ত এবার শোনা গেল না। ঘনাদা আমাদের ওপর একবার চকিত চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার সুরু করলেন, যার তাগ, বালিয়াড়ির ধার থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে দেখে যেমন অবাক তেমনি রেগে আগুন হয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এস্‌কল বললে, তুই, তুই এখনো বেঁচে আছিস?

..... হাঁ আছি। কাছে এসে সবিনয় বললাম, ভূত হয়ে যে নেই তা বোঝাবার জন্য গুলিটা করতে হল। কিন্তু বাতাসে কেমন কেটা পোড়া-পোড়া গন্ধ যেন পাচ্ছি! তাই না।

গন্ধ শুধু নয়, দূরে আগুনের শিখা আর ধোঁয়াটাও এবার দেখা গেল। তোমার আস্তানার তাঁবুগুলোই যেন জ্বলছে মনে হচ্ছে এস্‌কল আমি সব বেদনার সুরেই বললাম।

এস্‌কল কিন্তু ক্ষেপে গেল একেবারে।

তুই! তুই এ আগুন জ্বালিয়েছিস! বলো বুনো মোষের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।

বালির পর তার থোবড়ানো মুখটা একটু ঘুরিয়ে সোজা করে দিয়ে বললাম, কিছু মনে কোরো না দোস্ত, বাধ্য হয়েই আগুনটা দিতে হল। এখানে হাইজ্যাকিংয়ের প্লেন নামাবার যে ঘাঁটিটি তুমি তোমার দলের হয়ে পাতছিলে, যন্ত্রপাতি সমেত সেটা বরবাদই হয়ে গেল এখন। তোমাদের এই শয়তানি চক্রান্ত ভাঙবার জন্যেই এ কদিন এই সিনাই মরুর হাওয়া আমায় খেতে হয়েছে।

আমাদের চক্রান্ত ভাঙবি তুই।

বালিতে চিত হয়ে থাকা অবস্থাতেই এস্‌কল আমায় বেকায়দায় পেড়ে ফেলার জন্যে হড়কে যাওয়া কাঁচির জুড়োর প্যাঁচ চালাল। না, খাঁড়ির জল থেকে তাকে তোলবার চেষ্টা আর করলাম না। পাড় থেকে ঝুঁকে পড়ে বললাম, উইল যদি করতে চাও, আমি শুনতে কিন্তু রাজী। তবে তোমার নিজের নামেই করতে হবে। নাম ত তোমার বেসিল এস্‌কল নয়। বেসিল হল গ্রীক আর এস্‌কল হল ইহুদী নাম। ইহুদী হলে মোজেসের সোল বললে অমন হাঁ করে থাকতে না। তুমি না-ইহুদী না-আরব এদের দুপক্ষের ঝগড়ার সুবিধে নিয়ে সিনাই মরুভূমিতে শুধু নিজের শয়তানী মতলব হাসিল করতে এসেছ। তা এ যাত্রা যদি রক্ষা পাও তাহলে সে চেষ্টা করে দেখো।

এবার আমার হাতের পুঁটলিটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, রক্ষা পাবার একটা উপায় তবু করে দিয়ে যাচ্ছি। ওর গা টিপে দুধের মত যে রস বেরোয়, তাই একটু করে চারধারের জলে মিশিয়ে দিও, হাঙ্গারের চোদ্দ-পুরুষের কেউ তোমায় ছোঁবে না। হাঙ্গার দেখানো ও মাছের নামটাও মন্ত্রের মত মনে রেখো। কাল প্রাণে বাঁচবার পর তোমার সাকরেদও এই মনত্র আমার কাছে শিখে তোমার মত শয়তান সর্দারের সম্রব চিরকালের মত ছেড়ে গেছে। মন্তরটা ধীরে ধীরে বলছি, ও মাছের গা টিপতে টিপতে মুখস্ত করে ফেলো। — পর্দাচিরস্‌ মার্মোরেটস্‌।

ঘনাদা তাঁর বিবরণ শেষ করে আমাদের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, তারপর টঙের ঘরের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন, একটি কথা ভুলে যাচ্ছলাম। এ আরাম কেদারাটা একটু পুরোনো হয়ে গেছে। একজিবিশনের মেলায় আজ নতুন একটার অর্ডার দিয়ে এসেছি। ওরা কাল হয়ত পাঠিয়ে দেবে। বলে ঘনাদা আর দাঁড়ালেন না।

বিধাতা

বনফুল

বাঘের বড় উপদ্রব। মানুষ অস্থির হইয়া উঠিল। গরু, বাছুর, শেষে মানুষ পর্যন্ত বাঘের কবলে মারা পড়িতে লাগিল। সকলে তখন লাঠি সড়কি বর্শা বন্দুক বাহির করিয়া বাঘটাকে মারিল। একটা বাগ গেল— কিন্তু আর একটা আসিল। শেষে মানুষ বিধাতার নিকট আবেদন করিল—

"ভগবান, বাঘের হাত হইতে আমাদের বাঁচাও।"

বিধাতা কহিলেন— আচ্ছা।

কিছু পরেই বাঘরা আসিয়া বিধাতার দরবারে নালিশ জানাইল— "আমরা মানুষের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। বন হইতে বনান্তরে পলাইয়া ফিরিতেছি। কিন্তু শিকারী কিছুতেই আমাদের শান্তিতে থাকিতে দেয় না। ইহার একটা ব্যবস্থা করুন।"

বিধাতা কহিলেন,— "আচ্ছা।"

তৎক্ষণাৎ নেড়ার মা বিধাতার নিকট আবেদন পেশ কবিলেন —

"বাবা আমার নেড়ার যেন একটি টুকটকে বউ হয়। দোহাই ঠাকুর, তোমায় পাঁচ পয়সার ছিন্নি দেব।"

বিধাতা কহিলেন,— "আচ্ছা।"

সুশীল পরীক্ষা দিবে। সে রোজ বিধাতাকে বলে, "ঠাকুর, পাশ করিয়ে দাও।" আজ সে বলিল, "ঠাকুর, যদি স্কলারশিপ পাইয়ে দিতে পার, পাঁচ টাকা খরচ করে হরির লুট দেব —"

বিধাতা কহিলেন. — "আচ্ছা।"

হরিহর ভট্টাচার্য মামলা করিতে যাইতেছিল। সে বিধাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আজীবন তোমার পূজো করে এসেছি। উপবাসে দেহ ক্ষীণ করেছি। শালা ভাইপোকে আমি দেখে নিতে চাই। তুমি আমার সাহস হও।"

বিধাতা কহিলেন, — "আচ্ছা।"

সুশীল পরীক্ষা দিবে। সে রোজ বিধাতাকে বলে, "ঠাকুর, পাশ করিয়ে দাও।" আজ সে বলিল, "ঠাকুর, যদি স্কলারশিপ পাইয়ে দিতে পার, পাঁচ টাকা খরচ করে' হরির লুট দেব—"

বিধাতা কহিলেন, — "আচ্ছা।"

হরেন পুরকায়স্থ ডিস্টিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হইতে চায়। কালী পুরোহিতের মারফত সে বিধাতাকে ধরিয়া বসিল— এগারোটা ভোট আমার চাই। কালী পুরোহিত মোটা রকম দক্ষিণা খাইয়া ভুল সংস্কৃত মন্ত্রের চোটে বিধাতাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ভোটং দেহি— ভোটং দেহি। বিধাতা কহিলেন, — "আচ্ছা, আচ্ছা।"

কৃষক দুই হাত তুলিয়া কহিল — "দেবতা, জল দাও—"

বিধাতা কহিলেন— "আচ্ছা।"

পীড়িত সন্তানের জননী বিধাতাকে প্রার্থনা জানাইল— 'আমার একটি মাত্র সন্তান, ঠাকুর কেড়ে নিও না—"

বিধাতা কহিলেন— "আচ্ছা।"

পাশের বাড়ির ক্ষেন্তি পিসি উপরোক্ত মাতার সম্পর্কে বলিলেন— "বিধাতা মাগীর বড় দেমাক। নিত্যি নতুন গয়না প'রে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল। ছেলের টুটিটি টিপে ধরে বেশ করছে দয়াময়। মাগীকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে দাও ত!"

বিধাতা কহিলেন— "আচ্ছা।"

দার্শনিক কহিলেন— "হে বিধাতা — তোমাকে বুঝিতে চাই।"

বিধাতা কহিলেন— "আচ্ছা।"

চীন দেশ হইতে চীৎকার আসিল— "জাপানীদের হাত হইতে বাঁচাও প্রভু।"

বিধাতা কহিলেন— "আচ্ছা।"

বাঙলা দেশ হইতে এক তরুণ ধরিয়া বসিল— "কোনো সম্পাদক আমার লেখা ছাপিতেছে না। 'প্রবাসী'তে লেখা ছাপাইতে চাই। রামানন্দবাবুকে সদয় হইতে বলুন।"

বিধাতা কহিলেন— "আচ্ছা।"

একটু ফাঁক পড়িতেই বিধাতা পার্শ্বোপবিষ্ট ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনার বাসায় খাঁটি সর্ষের তেল আছে?"

ব্রহ্মা কহিলেন— "আছে। কেন বলুন ত!"

বিধাতা— "আমার একটু দরকার। দেবেন কি?"

ব্রহ্মা (পঞ্চমুখে)— 'অবশ্য, অবশ্য।"

ব্রহ্মার বাসা হইতে ভাল সরিষার তৈল আসিল। বিধাতা তৎক্ষণাৎ তাহা নাকে দিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

আজও ঘুম ভাঙে নাই।

টাকের ওষুধ

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ষষ্ঠীপদর একটাই দুঃখ। দুঃখ চুল নিয়ে। চরচর করে মাথা থেকে চুল উঠে যাচ্ছে। মাথার চিরুনি বোলাতে আজকাল আর সাহসই হয় না, চিরুনির সঙ্গে গোছ-গোছা উঠে আসে। এইভাবে যদি চুল উঠতে থাকে, চাঁদি সাফ হয়ে যেতে কতক্ষণ! এমনিতেই তো মাথার সামনের দিকটায় বেশ ফাঁকা হয়ে উঠেছে। ব্রহ্মতালুতে গোপনে-গোপনে একটা টাকও এমনভাবে গজিয়ে উঠেছে যে, এখন আর তা বোধহয় লুকিয়ে রাখার উপায় নেই।

এই তো আজই সকালবেলা বাজার করে ফিরছে ষষ্ঠী, ভবতারণবাবুর সঙ্গে দেখা। "এই যে ষষ্ঠী, কেমন আছ?"

ষষ্ঠী একগাল হাসল, "আজ্ঞে, ভাল।"

"ভাল তো দেখতেই পাচ্ছি। তা, মাথায় টাক পড়ে গেল যে! এত অল্প বয়েসে টাক পড়া কি উচিত?"

ষষ্ঠীর চোখ-মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। কী যে বলবে ভেবে পায় না। মনে-মনে ভাবে লোকটা ভীষণ ঘুঘু, ঠিক দেখতে পেয়েছে টাকটা। হাঁ করে তাকিয়েই থাকে।

ভবতারণবাবু ছাড়বার পাত্র নন, বললেন, "তা কিছু লাগাচ্ছ-টাগাচ্ছ?"

"আজ্ঞে"!

"আর অবহেলা করো না হে, শেষটায় কিন্তু পস্তাবে। টেকো-লোকদের কপালে অনেক দুঃখ থাকে। আজকাল তো নানারকম ওষুধ-টসুধ বেরিয়েছে, তা লাগিয়ে দেখো না।"

ষষ্ঠীর মেজাজটাই খারাপ হয়ে যেতে থাকে। চুল উঠে যাওয়া টাক-পড়া নিয়ে ওর কথা বলতে একদম ভাল লাগে না। টাকা তো আর ইচ্ছে করে বানায় না কেউ, ওটা পড়লে কী আর করা যাবে! আসলে কিছু লোকের স্বভাবই থাকে ঘুঁচিয়ে ঘুঁচিয়ে কথা বলার। ষষ্ঠী মুখ ঘুরিয়ে নিল, তারপর হনহন করে বাড়িমুখো রওনা দিল।

বাড়ি ফিরে এসেও ওর মেজাজটা ঠাণ্ডা হতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল। আর এরই মধ্যে একবার এক ফাঁকে ও আয়নার সামনে এসে মাথাটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। ব্রহ্মতালুর টাকের ওপর পাতলা কিছু চুল দিয়ে ঢাকা। খুব খুঁটিয়ে লক্ষ না করলে সেটা নজরে পড়ার কথা নয়। কিন্তু ভবতারণবাবুর চোখ যেন শকুনের চোখ, খুঁজে-খুঁজে ঠিক টাকটাই আবিষ্কার করেছে ওপর।

ষষ্ঠী ঠিক করলে, ফের যদি লোকটার সঙ্গে দেখা হয়, ও মুখ ঘুরিয়ে থাকবে। আজেবাজে লোককে বেশি লাই দিলেই ঝামেলা। বলে কি না, কত ওষুধ-টসুধ বেরিয়েছে, লাগিয়ে দ্যাখো না! দ্যাখো না! ষষ্ঠী হাসবে না কাঁদবে ; কত ডাক্তার-কোবরেজ যে ও করেছে, হিসেব আছে নকি! ডাক্তারদের পেছনেও কম টাকা ঢেলেছে! কম ওষুধ খেয়েছে! এই তো মাস কয়েক আগে এক কোবরেজমশাই গলা বাড়িয়ে বললেন, "দ্যাখো হে,

নিয়ম মেনে যদি চলো, তোমার মাথায় আমি নতুন চুল যদি গজিয়ে দিতে না পারি, কোবরেজিই ছেড়ে দেব।"

যষ্ঠী কখনও যা করে না, তাই করে বসেছিল টিপ করে কোবরেজমশাই একটা প্রণাম করে বসেছিল।

"আহা, করে কী, করে কী! ওঠো হে, ওঠো। আসল কী জানো, জীবনে কখনও ভেঙে পড়লে চলে না। সমসময় ভরসা রাখতে হয়। মাথায় তোমার চুলের হাট বসিয়ে দেব, দ্যাখো না।"

যষ্ঠীর চোখ দুটো চকচক করে উঠেছিল, বলল, "আজ্ঞে, তাই যদি পারেন, চিরকাল আমি আপনার দাস হয়ে থাকব।"

"হেঁ, হেঁ, তা তো থাকবেই। এই শর্মার কাছে যখন এসেছ, তখন আর তোমার ভাবনা কী! তা, সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছু আছে তো?"

যষ্ঠী বলল, "টাকার জন্য ভাববেন না কোবরেজমশাই। যা লাগে আমি খরচ করতে রাজি। আর সত্যি-সত্যি যদি মাথায় চুল গজিয়ে দেন, তা হলে যা চাইবেন, তাই দেব।"

"বেশ, কথাটা কিন্তু মনে রেখো।" কোবরেজমশাই তাঁর মান্ধাতার আমলের আলমারি ঘেঁটে একগাদা পাচন আর মালিশ এনে গুঁজে দিলেন ওর হাতে। "বুঝলে হে, অনেক দামি ওযুধ, একশো পঁচানব্বই টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা। তা এখন যা পারো দিয়ে যাও। এরপরে কিন্তু আর দামি ওযুধ দেব, বুঝলে?

মাথা নেড়ে তখনকার মতো শ'খানেক টাকা কোবরেজমশাইয়ের হাতে দিয়ে হাসি-মুখে চলে এসেছিল যষ্ঠী।

তারপর দিনের পর দিন সেই পাচন গোলা। এক-একটা বড়ি জিভে ছোঁয়াতেই যেন পেটের নাড়িভুঁড়ি উলটে আসে। আবার তিনবেলা নিয়ম করে মাথায় চটচটে গুড়ের মতো মালিশ, গন্ধে মশা-মাছি অবধি সামনে এগোতে সাহস পায় না। কিন্তু উপায় কি, চুল গজাবার জন্য হেন কাজ নেই ও করতে পারে না।

যষ্ঠীপদ তাই করেছিল বেশ কিছুদিন। হপ্তা-হপ্তা কোবরেজমশাইয়ের ওযুধ আনা আর গুনে-গুনে টাকা দিয়ে আসা। চুল গজানো তো দূরের কথা, মাথার সামনের দিকটা আরও খানিকটা ফাঁকা হয়ে গেল।

শেষটায় রেগেমেগে সেই কোবরেজ মশাইয়ের আর মুখদর্শনি করে না ও।

এইরকম কত কোবরেজ, কত হোমিওপ্যাথি, এমনকি, একবার এক হেকিমের কাছেও মাথা নিয়ে হাজির হয়েছিল ও, কিন্তু থোড়াই চুল পড়া বন্ধ হল।

আসলে ওর কপালটাই খারাপ। এখনও যে কিছু-কিছু চুল রয়েছে মাথায়, এটুকু যে কতদিন থাকবে, কে জানে। মাথাটা হয়তো একদিন ধুধু চড়া-পড়া মাঠের মতো দেখাবে। তখন দিনেরবেলা রোদে বেরোলে চাঁদি ফেটে চৌচির হবে, রাতের বেলা ফাঁকা মাথায় হিম লাগালে বিছানায় শুয়ে সাও-বার্লি খেতে হবে।

চুল যে কত উপকার করে মানুষের, এই সময় যেন হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছিল যষ্ঠী। কেবল উপকার, আজকাল কতরকম চুলের ছাঁট লাগায় ওর বন্ধুরা। অথচ যষ্ঠীর কপালে

সেসব নেই। তবু ঘোড়ের দিকে চুল বড় হয়ে উঠলে সেলুনে না গিয়ে ওরও উপায় থাকে না। তাই তো গত সপ্তাহেই একবার ও চুল ছাঁটানোর জন্য পাড়ার 'নেতাজি সেলুনে' ঢুকেছিল। সেলুনের ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে ওর সেই ছোটবেলা থেকে জানাশোনা, তবু ভদ্রেশ্বর সেদিন ওর মাথার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে উঠেছিল, 'কি দাদা, চুল কাটবেন?"

যষ্ঠীও বোকার মতো একটু না হেসে পারেনি, "কী আর করব ভাই, যা আছে তাতেই একটু কাঁচি বুলিয়ে দাও।"

ঘাড়ের কাছে কিছুক্ষণ কাঁচি আর চিরুনি দিয়ে কুরকুর করে কাটাকাটি করল ভদ্রেশ্বর। তারপর কাঁচি থামিয়ে বলল, "চুল গজাবার তো অনেক ওষুধ বেরিয়েছে আজকাল, মাখেন না কেন?"

আবার গা-পিত্তি জ্বলে যায় যষ্ঠীর, "ওষুধ না ছাই। অনেক মেখেছি ভাই, কিচ্ছু হবার নয়।"

"সে কী বাবু, কত লোকের তো হচ্ছে, আর আপনার হবে না।"

"ছাই হচ্ছে! কার হয়েছে শুনি?"

ভদ্রেশ্বর বলল, "আজ্ঞে, বৃন্দাবনবাবুর হয়েছে। ওঁর মাথাটা তো টাক পড়ে-পড়ে একটা লাউয়ের মতো হয়ে উঠেছিল।"

"বটে, কে বৃন্দাবন?" আগ্রহে এবার তাকায় যষ্ঠী।

"আজ্ঞে, আমাদের প্রাইমারির টিচার। আগে তো ওঁর মাথায় টাক আমরাই দেখেছি, এখন সেদিন দেখলাম, মাথাভর্তি মিশমিশ করছে চুল। যেমনই কালো তেমনই ঘন।"

যষ্ঠী এবার চিনতে পারল বৃন্দাবনকে। ভদ্রেশ্বর ঠিকই দেখেছে। কিন্তু ওই রহস্যটা ওর জানা। পরচুলা পরেন উনি। হাসল যষ্ঠী, "তুমি ঠিকই দেখেছ। ওরকম পরচুলা পরলে আমার মাথায়ও চুল দেখতে পেতে।"

"পরচুলা!" একটু অবাক হয় ভদ্রেশ্বর।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ পরচুলা। পরচুলা পরতে-পরতে মাথায় যখন ঘা হবে তখন বুঝতে পারবে।"

ভদ্রেশ্বর আবার কুরকুর করে কাঁচি আর চিরুনি চালাল ওর মাথায়। তারপর ঘাড়ে-গলায় পাউডার-ফাউডার ছড়িয়ে মাথায় আলতো করে চিরুনি বুলিয়ে টাকটাকে ঢেকে দিল।

যষ্ঠী ভদ্রেশ্বরের কাটার মজুরি ছাড়াও চার আনা বকশিশ দিয়ে ফিরে এসেছিল বাসায়।

সব কথাই আজ মনে যাচ্ছিল তার। কিন্তু ঠোঁট বাঁকা করে ভবতারণবাবুর কথা বলাটা যেন কিছুতেই সহ্য করার নয়। লোকটাকে আচ্ছা করে দু-চার কথা শুনিয়ে এলে হত। এ যেন খানিকটা পালিয়েই এসেছে যষ্ঠীপদ।

যাকগে, কী আর করা যাবে। যষ্ঠী ঘাড়ের ওপর তোয়ালে ফেলে বাথরুমে যাবার জন্য উঠল। আর ঠিক এই সময়ই দরজায় ঠুকঠুক করে টোকা। কে রে বাবা, এই অসময়ে আবার কে এল!

"কে?"

"আহা, দরজা খুলবে তো?"

গলা শুনে একটু চমকেই উঠল ষষ্ঠী। তবে কি ভবতারণবাবুই আবার বাড়ি অবধি ধাওয়া করলেন নাকি! এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিল তাই। ষষ্ঠী কটমট করে তাকাল, "কী চাই?"

"এই দ্যাখো, চাইবার জন্যই লোকে আসে নাকি! তখন তোমাকে দেখে আমার খুব কষ্ট হল, তাই এলাম।"

আবার গা-জ্বলা শুরু হল ষষ্ঠীর। বলল, "আমার এখন সময় নেই, আনি চান করতে যাচ্ছি।"

ভবতরণবাবুও নাছোড়বান্দা, "তা'লে তুমি চানটা করে এসো, আমি একটু বসি। তোমার ওই টাকের ব্যাপারটায় আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে।"

ষষ্ঠী যে কী করবে বুঝতে পারে না। একটু রাগত গলায় বলল, "আমার মাথায় টাক থাক আর নাই থাক, আপনার কী?"

"আহা অত চটো কেন?" ভবতারণবাবু ঘরের ভেতর ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েন। "মাথা যখন রয়েছে, টাক তো পড়তেই পারে। কিন্তু আমি বলি কি —"

"কী?"

"টাকে যাতে চুল গজায় সে চেষ্টা একবার করে দ্যাখো না।"

"আপনি আমার টাকের পেছনে লেগেছেন কেন শুনি? সেই তখন থেকে কেবল আমার টাক নিয়ে কথা বলছেন।"

ভবতারণবাবু হাসলেন, "চটো না ষষ্ঠী, চটো না। আমার একটা কথা শুনবে?"

"বলুন?"

"আমার মাথার দিকে তাকাও একবার তাকাও না। এখন তো কত ঘন চুল দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু এককালে ঠিক তোমারই মতো আমার মাথায়ও একটা টাক পড়তে শুরু করেছিল। তারপর ভগবানের আশীর্বাদে টাক পড়া বন্ধ হয় নতুন চুল গজাতে শুরু করল।"

"কী বলতে চান আপনি?"

"মিথ্যে নয় ভাই, যা সত্যি তাই বলছি। তোমরা তো আবার আজকালকার ছেলে, কথাটথা শুনতেই চাও না।"

ষষ্ঠীপদর কেমন পর কৌতুক বাড়ে। ভবতারণবাবুর যে বানিয়ে বানিয়ে বলছেন, মনে হয় না। পাশের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে ষষ্ঠীও, "সত্যি বলছেন, আপনারও টাক পড়তে শুরু করেছিল?"

"মিথ্যে বলব কেন, টাক পড়া যে কী যন্ত্রণার তা আমি জানি না নাকি! মাথা ভোঁ-ভোঁ করত, ভাল করে ঘুম হত না। জানো হে, দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় আমি শুকিয়ে যাচ্ছিলাম।"

ষষ্ঠী নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিল, ঠিক তো, ওরও তো এরকমই হয়। জিজ্ঞেস করল, "তা চুল গজাল কীভাবে?"

ভবতারণবাবু একটু হাসলেন, "আরে ভায়া, সে কথা বলার জন্যই তো কাজকর্ম ফেলে ছুটতে-ছুটতে এলাম। তোমার চেয়ে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে বলো!"

ষষ্ঠী হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। লোকটাকে যেন এখন আর অত খারাপ লাগছে না।

"আসলে কী জানো, আমার কথা শোনো, তোমার টাকেও যদি চুল না গজায় তো কী বললাম।"

"কী কথা?"

"কথা মানে, আচ্ছা তুমি তন্ত্রমন্ত্র বিশ্বাস করো?" ভবতারণবাবু পায়ের ওপর পা তুলে আয়েস করে বসলেন, "তন্ত্রের সাহায্যে দিনকে যে রাত বানানো যায় তা তুমি বিশ্বাস করো?"

"কী করতে হবে বলুন না?" ষষ্ঠী আরও খানিকটা এগিয়ে বসে।

"ঠিক আছে, তা হলে বলেই ফেলি, আমার এক পিসতুতো শ্বশুরের শ্যালক ঘোর তান্ত্রিক, তাঁর কাছে একবার গিয়ে দেখা করো না। এমন তোমায় বিধান দেবেন যে মাথায় চুল না গজিয়ে আর উপায় থাকবে না।"

"মন্ত্র পড়ে দেবেন?"

"মন্ত্রই যে পড়বেন এমন কোনও কথা নেই। লোকবিশেষে তিনি বিধান দেন। এই যেমন, আমাকে উনি কী একটা জংলা গাছের শেকড় তুলে এনে হাতে দিয়েছিলেন। সেই শেকড় বেটে দিনসাতেক আমি মাথায় লাগিয়েছি, ব্যস আর দেখতে হয়নি।"

কেমন যেন উত্তেজনা বাড়তে থাকে ষষ্ঠীর, পুরনো লোকদের কাছে এখনও কত গুপ্তবিদ্যা রয়েছে কে তার হিসেব রাখে। বলল, "কোথায় থাকেন উনি?"

"সে তুমি যদি যেতে চাও, ঠিকানা-ফিকানা সব লিখে দেব। না হয় একটা চিঠিও দিয়ে দেব, তোমার সুবিধে হবে।"

ষষ্ঠী বলল, "নিশ্চয়ই যাব, অঅপনার কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারি! কী নাম তাঁর?"

ভবতারণবাবু বললেন, "'জটিলবাবা' বলেই আমরা ডাকি। আসল নাম জটিলেশ্বর মহারাজ।"

"জটিলবাবা?"

"হ্যাঁ হে, জটিলবাবা নামে যেন জটিলবাবা কাজেও তেমন। যে-কোনও জটিল সমস্যাই হোক না কেন, সরল করে নিতে পারেন। তবে বাবার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। এখন প্রায় ছিয়ানব্বইয়ের কাছাকাছি। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, এই বয়সেও উনি দু-চারজন চেলা নিয়ে অজয় নদীর তীরে একটা আশ্রম বানিয়ে তন্ত্রসাধনা করে যাচ্ছেন। একবার তুমি গেলেই বুঝতে পারবে মনের কী জোর।"

"অজয় নদীর তীরে! সে তো বীরভূমে।"

"বীরভূম তো কী হয়েছে, দরকার হলে এসব ব্যাপারে হিল্লি-দিল্লিও যাওয়া যায়, বীরভূম তো ঘরের কাছে হে! তাছাড়া বীরভূম হচ্ছে তন্ত্রমন্ত্রের দেশ। এখনও খুঁজে বেড়ালে অনেক সাচ্চা লোককে ওখানেই পাওয়া যাবে।"

"না, না, আমি যাব ভবতারণদা। আপনি চিঠি লিখে দিন। আমি কাল সকালেই বেরিয়ে যাব।"

ভবতারণবাবু হাসলেন, খসখস করে চিঠি লিখে দিলেন। তারপর বিদায় নেবার সময় বললেন, "ফিরে এসে খবরটা দিও কিন্তু।"

পরদিন সকালেই ষষ্ঠীপদ ছোট্ট একটা সুটকেসে জামাকাপড় ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ট্রেনে উঠল, ট্রেন থেকে নামল। একে জিজ্ঞেস করল, ওকে জিজ্ঞেস করল। তারপর নদী পেরোল। নদীর ধার দিয়ে মাইল ছ-সাত হাঁটল। হেঁটে-হেঁটে জটিলবাবার আশ্রমের কাছে যখন এল তখন প্রায় সন্ধে হয়-হয়।

নদীর পাশেই আশ্রম। জায়গাটা বেশ নির্জন। ধারে কাছে কোনও গাঁয়ের চিহ্ন নেই। আশ্রমের চারপাশ ঘিরে বেশ কিছু গাছপালা, দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন একটা জঙ্গল।

কেমন একটু ভয়-ভয়ও লাগতে থাকে ওর। বীরভূম যেমন তন্ত্রমন্ত্রের দেশ, তেমনই আবার ডাকাতেরও দেশ। জঙ্গলের মধ্যে সত্যি-সত্যি ওটা আশ্রম না ডাকাতের আস্তানা! কী জানি, ভবতারণবাবু ওকে জলজ্যান্ত একটা বিপদের মধ্যেই ঠেলে আনলেন কি না!

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ষষ্ঠী। তারপর ভাবল, অত ভয় পেলে চলবে না ওর। যা থাকে কপালে, জঙ্গলের মধ্যেই ঢুকে পড়ল। তারপর এগোতে এগোতে মাটির দেওয়াল আর খড়ের ছাউনি দেওয়া একটা ঘর দেখতে পেল। ঘরটার সামনের দিকে আসতেই জটিলবাবাকে চোখে পড়ল ওর।

দাওয়ায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে ধ্যান করছেন জটিলবাবা। পরনে একটি নেংটি, খালি গা। মাথায় বটের ঝুরির মতো জট। পিঠ ছাপিয়ে সেই জট মেঝেয় গড়াচ্ছে। বাবার যে অনেক বয়েস হয়েছে, বোঝা যায়। গায়ের চামড়া কেমন যেন ঝুলে পড়েছে।

ষষ্ঠী আর একটু এগিয়ে মাটিতে উবু হয়ে বাবাকে প্রণাম করল। আর তখনই জটিলবাবার মুখ দিয়ে একটা ধ্বনি বেরোল, "ব্যোম মহাদেব। আয় ব্যাটা, বোস এখানে।"

ষষ্ঠী চিঠিটা এগিয়ে ধরল বাবার দিকে।

"কী এটা?"

"আজ্ঞে চিঠি। ভবতারণবাবু দিয়েছেন।"

"কে? ভবা? ভাল আছে তো ভবা?"

চিঠিটা মেঝেতে একপাশে রাখল ষষ্ঠী। "আজ্ঞে ভাল। ওঁর মাথায় এখন একগাদা চুল, টাক পড়া বন্ধ হয়ে গেছে।"

"চুল!" জটিলবাবার চোখ দুটো কেমন খুদে-খুদে হয়ে ওঠে। একটু পরেই যেন প্রসঙ্গটা ধরতে পারলেন, "ও হ্যাঁ, চুল উঠে যাচ্ছিল বলে খুব কান্নাকাটি করতে এখানে এসে।"

"হ্যাঁ বাবা, দারুণ চল হয়েছে মাথায়। সেলুনে কাটতে গেলে এখন ওকে ডবল পয়সা দিতে হয়।"

"হবেই। তা, তোকে পাঠাল কেন? তোরও কি টাক পড়ছে নাকি রে?"

"আজ্ঞে বাবা, হ্যাঁ। রাতে ঘুম হয় না, কান ভোঁ-ভোঁ করে।" ষষ্ঠী বলতে বলতে আবেগে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরে, "জীবনে আমার একটাই দুঃখ বাবা, মাথায় চুলগুলো হুহু করে উঠে যাচ্ছে, মাথাটা একদম ফাঁকা মাঠের মতো হয়ে যাচ্ছে।"

"ব্যোম মহাদেব।" আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন জটিলবাবা।

ষষ্ঠী হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।

জটিলবাবা ফিক করে একটু হাসলেন, "চুল আবার একটা সমস্যা নাকি রে, কিছু ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আবার আমার মাথাভর্তি চুল হবে বাবা?"

"মাথাভর্তি তো হবেই, পিঠ ছাপিয়ে পা অবধি গড়াবে। যা, নদীর পাড় থেকে এক খাবলা মাটি তুলে নিয়ে আয় দেখি।"

"মাটি!"

"যা না, ওই তো সামনেই নদী। খানিকটা মাটি নিয়ে আয়।"

ষষ্ঠীপদ কী আর করে। উঠে নদীর দিকে এগোল। চারপাশটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার। সাপখোপ কোথায় কী লুকিয়ে আছে কে জানে! কিন্তু বাবার আদেশ তো ফেলা যায় না। হাঁটতে-হাঁটতে একেবারে নদীর পাড়ে চলে এল। এমন সময় সরসর করে কী যেন একটা লাফিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল, শেয়াল না কুকুর, কে জানে!

গা ছমছম করে উঠল ওর, সঙ্গে সঙ্গে নদীর পাড় থেকে খানিকটা মাটি তুলে হনহন করে আবার ও বাবার কাছে ফিরে এল।

"এনেছি বাবা।"

"এনেছিস, রাখ। এই মাটিতেই তোর কাজ হবে।"

ষষ্ঠী কেমন বোকার মতো তাকায় জটিলবাবা হাতের ত্রিশূলটা এবার তুলে ধরেন, "ব্যোম মহাদেব।" তারপর ত্রিশূলটা দিয়ে মাটির ওপর একটু ছোঁয়ালেন। বিড়বিড় করে কিছু যেন মন্ত্র পড়লেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজে ধ্যান করে বসে রইলেন।

ষষ্ঠীও হাত জোড় করে বসে রইল। ভক্তিতে কেমন গদগদ হয়ে উঠতে লাগল।

মিনিট পাঁচেক ওইভাবে কাটল। আবার, "ব্যোম মহাদেব।" জটিলবাবা ত্রিশূলটা সরিয়ে নিলেন, একগাল হাসলেন, "যা, এই মাটি যত্ন করে নিয়ে যা। রোদে শুকিয়ে শক্ত করে নিবি। তারপর মাথায় ঘষবি, বুঝলি?"

"মাথায় ঘষব!" কেমন একটু অবাক হয়ে তাকায় ষষ্ঠী। শুকনো মাটির ঢেলা মাথায় ঘোষলে চুল গজাবে, এ-কথা যেন ওর বিশ্বাসই হতে চায় না।

"হ্যাঁ রে খোকা, মাথায় ঘষবি। ঘষতে-ঘষতে দেখবি চুল উঠে যাচ্ছে। চুল উঠতে-উঠতে পুরো মাথাটা যখন বেলমুণ্ডি হয়ে যাবে, তখন আবার এখানে আসবি, তখন দেব ওষুধ, সাতদিনেই মাথাভর্তি কুচকুচে কালো চুল গজিয়ে যাবে, বুঝলি?"

ষষ্ঠী ভয়ে-ভয়ে মাথা নাড়ে, তাই করবে।

"ভয় নেই রো খোকা, যা বলছি কর গে যা। হাতে নাতে যদি ফল না পাস তখন আমায় বলিস।"

ষষ্ঠী বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। মাটির তালটা পাতায় জড়িয়ে যত্ন করে সুটকেসে ভরল, তারপর আবার গুটি-গুটি পায়ে আশ্রম ছেড়ে বাড়িমুখো রওনা দিল।

পরের ঘটনা সামন্যই। অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিল ষষ্ঠী। মাটির তালটা

রোদে শুকিয়ে টনটনে করে নিল, তারপর সেই শক্ত মাটির ঢেলা দিয়ে মাথায় ঘষাও শুরু করল।

শক্ত মাটির ঢেলা মাথায় ঘষা কি সোজা কথা, খোঁচা লেগে রক্তফক্তও ঝরতে শুরু করল। তা করুক, চুল যত ওঠে ততই যেন ওর মঙ্গল। মাথাটড়াকে পুরো বেলমুণ্ডি করে তবে আবার জটিলবাবার কাছে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, ততই যেন ও বাঁচে।

এর মধ্যে একদিন আবার ভরতারণবাবু এসে হাজির, "কী হে ভায়া, ঠিকমতো ঘষছ তো মাথায়? দেখি দেখি, বাহ, অনেকটাই তো ফাঁক হয়েছে দেখছি।"

করুণ চোখে তাকায় যষ্ঠী। "চুল তো ঘষে-ঘষে উঠিয়েই ফেলছি, শেষ পর্যন্ত আবার গজাবে তো?"

"গজাবে না মানে, জটিলবাবা কি ফালতু নাকি হে! লোকে ওকে ঠিকমতো চিনল না, এই যা দুঃখ।"

"এই দেখুন না, খোঁচা লেগে-লেগে টাকটার কী হাল হয়েছে!" মাথা ঝুঁকিয়ে ব্রহ্মতালুটা দেখায় যষ্ঠী।

ভবতারণবাবু একটু হাত বুলিয়ে দেন সেখানে। "আসলে কী জানো, এ চুলগুলো তোমার মাথা থেকে চলে যাওয়াই ভালো। নতুন চুল গজাবেই তখন আর এগুলোকে রাখা কেন! নতুন আর পুরনোতে কখনও মিশ খায় না।"

যষ্ঠী বলে, "তা তো বুঝলুম, কিন্তু এই ঘাড়ের দিকে চুলগুলো কিন্তু এখনও বেশ শক্তই ছিল, উঠতেই চায় না।"

"জোরে জোরে ঘষো, তবে না উঠবে! তা ছাড়া যত তাড়াতাড়ি তুলতে পারবে, ততই তোমার সুবিধে। তাই না?"

যষ্ঠী মাথা নাড়ে, "তাই।"

ভবতারণবাবু আরও কিছুক্ষণ বসেন, যষ্ঠীপদকে উৎসাহ দেন, তারপর আবার আসব বলে বিদায় নিয়ে চলে যান।"

যষ্ঠী ঘর থেকে বেরোয় না, মিনিট-দশেক পর-পরই ঢেলা দিয়ে মাথা ঘষে। আয়নার সামনে গিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মাথা দ্যাখে। নাহ্, প্রায় উৎখাত হয়ে এসেছে। আর দু'একদিনের মধ্যেই পুরোটা তুলে ফেলা যাবে। মনে-মনে বেশ চাঙ্গাই বোধ করে ও। কখনও বা গুনগুন করে গানও গেয়ে ওঠে, জটিলবাবার কাছে গিয়ে এবার যখন আসল ওষুধ নিয়ে আসব তখন আর আমায় পায় কে! মাথাভর্তি মিশমিশে কালো চুল যখন ভরে উঠবে তখন আর আমায় পায় কে! লালা ...... লুলু......

সব চুল তুলে ফেলতে আর চিন-চারেক লেগে গেল। যষ্ঠীপদ আবার সেই ছোট্ট সুটকেসটায় কাপড়চোড় ভরে নিয়ে জটিলবাবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। বেরোবার সময় মাথায় একটা কাপড়ের টুপি পরে নিল। এমন ন্যাড়া লাউমুণ্ডি মাথা নিয়ে কখনও রাস্তায় বেরনো যায়!

সারা রাস্তা বুকের মধ্যে যেন ঝমঝম করে বাজনা বাজছিল। আশ্রমে গিয়ে বাবার

শ্রীচরণে এবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বাবার জন্যে একটা নতুন কাপড়ও কিনে রেখেছিল ও, সেটা এবার প্রণামী হিসেবে দিয়ে আসতে হবে।

লালা-লুলু — গানের কলি ভাঁজতে-ভাঁজতে ট্রেনে উঠল, ট্রেন থেকে নামল। নদী পেরোল, নদীর ধরা দিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে হ্যাঁ, ওই তো সেই জঙ্গল। ওখানেই তো বাবার আশ্রম।

ছুটতে শুরু করল যষ্ঠী। তারপর আশ্রমের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল।

কী হল রে বাবা, কাউকেই দেখছি না যে! এর আগের দিন তো বাবা এখানে বসেই ধ্যান করছিলেন। তবে কি আজ ঘরের ভেতরে রয়েছেন?

যষ্ঠীপদ গদগদ গলায় ডাকল, "বাবা। জটিলবাবা!"

"কে?" ঘরের ভেতর থেকে কে যেন সাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু এ তো জটিলবাবার গলা নয়। আবার ডাকল। "জটিলবাবা আছেন? আমি যষ্ঠীপদ এসেছি বাবা।"

ঘরের ভেতর থেকে লোকটা ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে। কেমন ভোঁদড়মার্কা চেহারা।

"কাকে চাই?" লোকটার চোখে বিস্ময়।

"আজ্ঞে, আমি জটিলবাবার কাছে এসেছিলাম। উনি আমাকে আসতে বলেছিলেন।"

"বলেছিলেন বুঝি। কিন্তু উনি তো নেই।"

"নেই মানে, কোথায় গেছেন?" কেমন যেন বুকের ভেতর কাঁপতে শুরু করে যষ্ঠীর।

"পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছেন।"

"পঞ্চভূতে! যষ্ঠীর চোখ দুটো কেমন ঝুলে পড়ে, "পঞ্চভূতে মানে?"

"পঞ্চভূত বোঝেন না? উনি ইহজগতের মায়া কাটিয়ে স্বর্গধামে চলে গেছেন।"

"আজ্ঞে, মারা গেছেন?" ব্রহ্মতালুতে যেন একটা লোহার ডাণ্ডা পড়ে যষ্ঠীর, "আমার চুল!"

লোকটা বলে, "এই তো দিন-চারেক আগে আমরা তাঁর ভক্তরা মিলে এই নদীর ধারে তাঁকে দাহ করলাম।"

যষ্ঠীর কান জুড়ে ভোঁ-ভোঁ শুরু হল, চোখের সামনে অসংখ্য ঝিঁঝিঁ পোকার খেলা, সুটকেসটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ও চেঁচিয়ে উঠল, "আমার চুল!"

"চুল!" লোকটার চোখে বিস্ময়।

"আমার চুলের কী হবে!" যষ্ঠী চেঁচিয়ে উঠল. "আমার চুলের কী হবে?" তারপর আর দাঁড়াবার মতো অবস্থা নয় ওর। সুটকেসটা বগলদাবা করে ও নদীর ধার দিয়ে ছুটতে শুরু করল।

পথিকের বন্ধু

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহকুমার টাউন থেকে বেরুলাম যখন, তখনই বেলা যায় যায়। কলকাতা থেকে আসছিলাম বরিশাল এক্সপ্রেসে। বারাসাত স্টেশনে নিতান্ত অকারণে (অবশ্য যাত্রীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী) উক্ত বরিশাল এক্সপ্রেস চল্লিশ মিনিট কেন যে দাঁড়িয়ে রইল দারুব্রহ্মবৎ অনড় অবস্থায় তা কেউ বলতে পারলে না। গন্তব্যস্থান বনগাঁয়ে দেখি রাণাঘাট লাইনের গাড়ি চলে গিয়েছে।

বেলার দিকে চাইলাম। বেশ উচুঁতেই সূর্যদেব, লিচুতলা ক্লাবে খানিকটা বলে আড্ডা দিয়ে চা খেয়ে ধীরে সুস্থ হেঁটে গেলেও এই পাঁচ মাইল পথ সন্ধ্যার আগেই অতিক্রম করতে পারা কঠিন হবে না। রামবাবু, শ্যামবাবু, যদু ও মধুবাবু সবাই বেলা পাঁচটার সময় ক্লাবে বসে গল্প করছিলেন। আমায় দেখে বললেন — এই যে বিভূতি, এসময় কোত্থেকে?

— কলকাতা থেকে।

— বাড়ি যাবে? ট্রেনে গেলে না?

— ট্রেনটা ফেল হয়ে গেল, বরিশাল এক্সপ্রেস চল্লিশ মিনিট লেট।

— এসো, খুব ভাল হয়েছে এক্সপ্রেস লেট হয়ে। বোসো চা খাও।

তারপর গল্পগুজবে (যার বারো আনা পরনিন্দা) সময় হু হু করে কেটে গিয়ে কখন যে গোধূলির পূর্বমুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে, তা কিছু বলতে পারি নে। যেতে হবে এখনো অনেকটা রাস্তা, আর দেরি করলে পথেই অন্ধকার হয়ে যাবে, বৃষ্টিও আসতে পারে, কারণ বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস। বড় রাস্তায় উঠে সত্যিই দেখলাম আড্ডা দিতে গিয়ে সময়ের আন্দাজ বুঝতে পারিনি। তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম। পশ্চিম আকাশে মেঘ করে আসচে।

চাঁপাবেড়ে ছাড়িয়েচে, রাস্তায় জনমানব নেই, পথের দু'পাশে ঘন জঙ্গলে পটপটির ফুল ফুটেচে, গন্ধ ভেসে আসচে জোলো বাতাসে, শেয়াল, খস্‌খস্‌ শব্দ করে চলে গেল পাতার ওপর দিয়ে দিয়ে, বিলিতি চটকা গাছের ডাল বেয়ে ঝুলে পড়েছে মাকাললতা। কলকাতা থেকে হঠাৎ এসে বেশ লাগচে এই নির্জনতা।

চাঁপাবেড়ের পুল ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়েচি, এমন সময় দেখি একটি লোক কাঁধে বাঁক নিয়ে আমার আগে আগে যাচ্চে।

আমার পায়ের শব্দে সে চমকে পিছন ফিরে আমার দিকে চাইলো।

ওকে এপথে একা দেখে একটু আশ্চর্য হয়েচি। এ বনপথে এ সময় কেউ একা বড় একটা হাঁটে না।

বললাম — কোথায় যাবি?

— আজ্ঞে, গোপাল নগরে।

— বাঁকে কি রে?

— দই আছে।

— এত দই কি হবে?

— নিবারণ ময়রার বাড়ি বায়না আছে। তেনাদের বাড়ি আজ খাওয়ান দাওয়ান।

— তোদের বাড়ি কোথায়? দই আনচিস কোথা থেকে?

— আজ্ঞে, বেনাপোল থেকে।

— বলিস কিরে, এই দশমাইল দূর থেকে দই আনচিস! তা এত দেরি করে ফেললি কেন?

লোকটার কণ্ঠস্বরে মনে হয়েছিল ও আমাকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে বাঁচলো এই সন্দেবেলা। একা যেতে ওর নিশ্চয় ভয় করছিল।

আমার প্রশ্নের উত্তরে সে গল্প জুড়ে দিলে কেন তার দেরি হল দই নিয়ে রওনা হতে। ওদের একটা গোরু হারিয়ে গিয়েছিল আজ পাঁচ দিন। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। আজ দুপুরের পর হিজোলতলার বাঁওড়ে সেই গোরুকে চরতে দেখা গেল। তারপর ওরা দল বেঁধে বেরুলো গোরু আনতে। গিয়ে দেখে বাঁওরের ধারে একটা লোক বসে আছে, তার কাছেই ছ'টা গোরু একসঙ্গে চরচে। সবগুলোই বিভিন্ন গ্রামের হারানো গোরু, ক্রমে জানা গেল। লোকটা তো ওদের দেখেই দৌড়— ইত্যাদি।

এইবার বেশ সন্দে হয়ে এসেচে।

বাঁশ-আমবনের ভেতরে ভেতরে ঘুলি ঘুলি অন্ধকার।

সামনে একখানা শুকনো কাঠ উঁচু চটকা গাছের মাথা থেকে ভেঙে পড়তেই ও চমকে উঠে বললে—- ওকি? আমি হাসি চেপে বললাম— চটকা গাছের ডাল। লোকটা আশ্বস্ত হয়ে বলল — ও।

— তোমার নাম কি?

— নিধিরাম।

— বাড়ি?

— কটক জিলা।

— সত্যি? তুমি তো বেশ বাঙালীর মত কথাবার্তা বলচো।

— তা হবে না বাবু? বেনাপোলের কাছে কাসুন্দিয়াতে আমার পনেরো বছর কেটে গেল। ওখানে আমার গোরুর বাথান। কুড়িটা গাইগোরু, পনেরো-যোলটা বক্‌না বাছুর, মস্ত বাথান। রোজ আধমণ দুধ হয়। এঁড়ে বাছুর আমরা রাখিনে, শুধু বক্‌না বাছুর রেখে দিই। এঁড়ে বিক্রী করে ফেলি বাবু—

লোকটা একটু বেশি বকে। আমাকে পেয়ে ওর বকুনি আর থামতে চায় না। একা যাচ্ছিল, আমায় পেয়ে ও ভারি খুশি হয়েচে, ভরসা পেয়েচে এই সন্দেবেলা।

বললে— বৃষ্টি আর হল না বাবু, কি বলেন?

— সেই রকমই তো দেখচি।

— এবার বড় দুবচ্ছর। আমন ধানের রোয়া হল কই? বীজপাতা ছিল দু কাঠা ভুঁই।

সে বীজ লালচে হয়ে আসছে। ওই দেখুন, কেমন মেঘ করে আসচিল, আবার ফর্সা হয়ে এল! এবার আমাদের এদিকে খুব কম বৃষ্টি হয়েছে। আমন ধানের রোয়া হয়নি, চাষামহলে হাহাকার পড়ে গিয়েচে, ধানের দর ছিল চার টাকা মণ। এখন উঠেচে সাড়ে সাত টাকা মণ। এর মধ্যে উপোস শুরু করে দিয়েচে।

আমায় আবার বললে— গোরুগুলো অনেক কষ্ট করে মানুষ করা। এবার বিচুলির অভাবে মারা পড়বে বাবু।

— কাঁচা ঘাস কেটে খাওয়াবে। বর্ষাকালে কোনো গোরু বিচুলি খায়? সবই কাঁচা ঘাস খেয়ে বাঁচে।

— বেত্‌না নদীর ধারে আগে আগে কত কাঁচা ঘাস পাওয়া যেতো, এখন সব আঁটি বেঁধে এনে এনে বনগাঁ শহরে বিক্রী করে। শহরে বাবুরা চার আনা চোদ্দ পয়সায় এক আঁটি কিনচে। আমাদের গোরুর ঘাস নিয়েই মুশকিল। ওটা কি বাবু?

এইবার লোকটা চমকে উঠে যেন আমার গাঁ ঘেঁযে এসে থমকে দাঁড়ালো।

আমি বললাম— কই, কি?

— ওই যে সাদা মত?

চেয়ে দেখলাম, কিছুই না। মাকাল লতার মোটা সাদা লতা গাছের ডাল থেকে ঝুলে দুলচে অন্ধকারে। লোকটা দেখচি বিযম ভীতু।

হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্টু বুদ্ধি জাগলো।

আমায় ও বললে— বাবু, আপনি কোথায় যাবেন?

— আমি একটু এগিয়ে ডানদিকের রাস্তায় নেমে যাবো। ওখানেই আমার গাঁ।

— গোপালনগর এখন কতদূর আছে?

— তা দেড় মাইল।

— পথে কোনো ভয়-টয় নেই তো?

আমি জোরে ঘাড় নেড়ে বললাম— না, ভয় কিসের। এ অঞ্চলে বাঘ-টাঘ নেই। বুনো শুয়োরও নেই। সে বললে— আমি বাঘের কথা বলিনি বাবু— বলি এই — সন্দেবেলা আবার নাম করতে নেই — সেই তাঁদের —

— ও ভূতপ্রেতের?

— ও নাম করবেন না সন্দেবেলা। বাম রাম রাম রাম! ও নাম কি করতে আছে এ সময়? রাম রাম রাম রাম -

আমি অতি কষ্টে হাসি চেয়ে বললাম— ও বুঝিচি। তবে একটা কথা, যখন তুমি বিদেশী লোক, তখন তোমাকে সব খুলে বলাই ভালো।

— কি বাবু?

— দাঁড়াও এখানে। আমি তো এখুনি নেমে যাবো, তুমি একা যাচ্চ এতটা পথ— অন্ধকারে— পথে জনপ্রাণী নেই--। আমার বর্ণনার বহর শুনে লোকটা আরও আমার দিকে ঘেঁযে দাঁড়ায়। আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বললে— তারপর বাবু?

— তারপর আর কি, তোমাকে বলা আমার উচিত নয়, কিন্তু যখন জিগ্যেস করলে তখন না বলাটা তো ঠিক নয়। বিশেষ করে একা যখন যাচ্চ। সঙ্গে নেই লোক। ওই যে একটা সাঁকো আছে রাস্তার ওপর বনের পাশে, ওই সাঁকোটা বড় খারাপ জায়গা।

— কেন বাবু?

— ও জায়গাটাতে ভূত— মানে ওরা সব আছেন কিনা! পাশে যে বড় বাগান, ওটার নাম গলায়-দড়ের আমবাগান। বড্ড খারাপ জায়গা। অনেকদিন আগে তখন আমি ছেলেমানুষ একবার একজন এই তোমার মতই বিদেশী লোক একা যাচ্ছিল গোপালনগরে, সন্দের পর। তার পরদিন সকালবেলা দেখা গেল কিসে তার ঘাড়টা ভেঙে মেরে ফেলে রেখেচে সাঁকোর তলায়। এ আমার নিজের চোখে দেখা। কথাটা তোমায় বলা উচিত নয়, তবে যখন জিগ্যেস করলে, তখন চেপে রাখাও তো উচিত নয়। একটা বিপদ হতে দেরি লাগে না, তখন তুমি বলতে পারো বাবু, আপনি জেনে-শুনেও আমায় বলেননি কেন। সন্ধের পর কেউ ও পথে যায় না। প্রাণ হাতে করে যেতে হয়। আজ বছর দুই আগে এক রাখাল ছোঁড়া দিনদুপুরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সাঁকোর তলায়। যাক সে, তুমি রাম রাম বলতে বলতে চলে যাও, কোনো ভয় নেই।

— বাবু, আপনি কি নেমে যাবেন?

— হ্যাঁ, আগে আমার গাঁয়ের রাস্তা নেমে গেল। আমি এইবার চলে যাবো।

— তাই তো বাবু, একা আমি কি করে যাবো?

— রাখে কেষ্ট মারে কে? মারে কেষ্ট রাখে কে? কপালে মৃত্যু থাকলে কেউ সামলাতে পারে না। না থাকলে কেউ মারতে পারে না। রাম রাম বলতে বলতে চলে যাও। দাঁড়াও, আজ আবার তিথিটা কি? চতুর্দশী। তিথিটা ভালো নয়। অমাবস্যে, চতুর্দশী, প্রতিপদ এই তিথিগুলো খারাপ।

— কেন, কেন বাবু?

— সে আর তোমাকে বলে কি হবে? তুমি সন্দের অন্ধকারে একা রাস্তার ওপর— যেতে হবে এখনো তোমায় এক ক্রোশ পথ। ক্রমশ ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আসচে। তবে তোমায় বলা আমার উচিত— বিদেশী লোক, তোমায় সব কথা খুলে না বলাটাও ঠিক নয়। একটা বিপদ হোতে কতক্ষণ? তখন তুমি আমায় দোষ দিতে পারো। এইসব তিথিতেই ভূত প্রেত — পিশাচ ব্রহ্মদত্যি—

লোকটা বলে উঠলো— রাম রাম রাম রাম— ও সব নাম করবেন না বাবু—

— মানে ওঁরা সব বার হয়ে থাকেন কিনা—

— তাই নাকি? তবে তো—

— আবার কি জান, এই চতুর্দশী তিথিতে গলায় দড়ি দিয়ে অপমৃত্যু ঘটেছে এমন ভূতেরা বার হয়।

আমি একবার বড় বিপদে পড়েছিলুম—

লোকটা আড়ষ্ট সুরে বললে — কি বাবু?

— একটা শ্মশানের ধার দিয়ে সেবার যাচ্চিলাম। সেও এই ভূত-চতুর্দশীর তিথি। দেখি যে অন্ধকারে গাছের ডাল থেকে কি একটা যেন ঝুলচে— কাছে গিয়ে দেখি একটা মেয়ে মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলচে আর হি হিঃ করে হাসচে—

লোকটা আঁৎকে উঠে বললে— কি সর্বনাশ!

— যাক্ ওই আমার রাস্তা নেমে গেল। আমি চললাম এবার। যাও তুমি, একটু সাবধানে যাও, সাবধানের মার নেই।

কথা শেষ না করেই আমি আমাদের গ্রামের পথে নেমে পড়লাম।

ও কাঁদো কাঁদো সুরে বললে— বাবু, আমাকে একটু এগিয়ে নিয়ে সাঁকোটা পার করে দ্যান যদি—

আমি শিউরে বলে উঠি— আমি? আমার কম্ম নয়, আমাকে তারপর এগিয়ে দেবে কে? বাবারে, প্রাণ হাতে করে যাওয়া ওসব জায়গায়! একে আজ ভূত-চতুর্দশী—

— রাম রাম রাম রাম!

— তুমি চলে যাও একটু জোর পায়। আবার রাস্তাও তো কম নয়! আচ্ছা চলি— তুমি বিদেশী লোক, জিগ্যেস করলে তাই এত কথা বলা। নইলে কি দরকার?

আমাদের রাস্তায় নেমে কয়েক পা মাত্র এগিয়েচি, লোকটা দেখি ডাকচে— বাবু, বাবু, একটা কথা শুনুন— ও বাবু —

পিছন ফিরে দেখি কাঁধের বাঁকটা একটি শিশুগাছের তলায় নামিয়ে দাঁড়িয়েচে।

বললাম— কি?

— দইগুলো নিয়ে আমি এখন কি করি বাবু?

— কি আর করবে? বায়না রয়েছে, এক মুঠো টাকা। দিয়ে এসো। রাত হয়ে গিয়েচে, ওদের খাওয়ানোর সময় হলো। রাম ব'লে এগিয়ে পড়ো— সাবধানে যেও—। আর কোন কথা না বলে আমি হন হন করে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

শুনলাম ও আবার ডাকচে— ও বাবু, ও বাবু— শুনে যান— একটা কথা ও বাবু—! দূরে ওর গলার সুরটা যেন আর্তনাদের মত শোনাচ্ছিল।

গজেনকাকার মাছ ধরা

বিমল কর

আমাদের গজেনকাকার সামনে মুখ ফস্‌কে কিছু বলার উপায় ছিল না। অন্তত বাবা কিছু বলতে পারতেন না, মা তো নয়ই।

সেবার খুব বৃষ্টি-বাদলা যাচ্ছিল। একটানা তিন-চার দিন বৃষ্টির পর ধানবাদ শহরের মাঠঘাট, কবরখানার আশপাশ, গোশালা সব ডুবে গেল। রেল-লাইনের পাশে যে সমস্ত ঝিল-মতন ছিল— যাকে আমরা লোকে ট্যাংক বলতাম, তার জল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রেল-লাইনই না ডুবে যায়!

লোকো ট্যাংকে অনেকেই মাছ ধরত তখন, বছরের বার মাসেই। কেউ শখ করে, কারুর বা নেশা ছিল মাছ ধরার। তা সেবারের ওই টানা বৃষ্টির পর ট্যাংকের জল যখন ছাপিয়ে মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে গিয়েছে তখন মাছ ধরার ধুম পড়ে গেল।

আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন চাটুজ্যে-কাকা। মাছ ধরা ছিল তাঁর নেশা। তিনি ছিলেন রেলের গার্ড-সাহেব। যেদিন বাড়িতে থাকতেন, কিম্বা সুযোগ পেতেন, সেদিনই ছিপ হাতে বেরিয়ে পড়তেন মাছ ধরতে। এই চাটুজ্যে-কাকা ওই সময় এক বড়-সড় মাছ ধরেছিলেন ট্যাংক থেকে। সেই মাছ তিনি বাড়িতে ভাগাভাগি করে দু'তিন বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের বাড়িতে এক ভাগ এসেছিল।

আমার মায়ের হাতের রান্না ছিল ভালো। আরও যত্ন করে মাছটা রাঁধলেন। বাবা যে খাইয়ে লোক ছিলেন— তাও নয়, তবে বাবার জিভের খুব তার ছিল। খেতে ভাল লাগলে খেতেন অল্প, তবে বলতেন বেশী।

মাছটা বাবার ভাল লেগেছিল। বললেন, 'খুব স্বাদ মাছটার। চমৎকার স্বাদ। এমন মাছ জীবনে কমই খেয়েছি।'

কথাটা মুখ ফস্‌কেই বলা। সকলেই এ-রকম বলে। গজেনকাকা বাবার মুখোমুখি বসে খাচ্ছিলেন, কথাটা শুনলেন। বললেন না কিছুই।

পরের দিন বিকেলে দেখি গজেনকাকা একটা ছিপ হাতে ঢুকছেন। আমরা অবাক। আমাদের বাড়িতে কোনোদিন কারুর হাতে ছিপ দেখিনি। বললাম, 'ছিপ নিয়ে কী করবে, কাকা?'

'মাছ ধরব।'

'মা-ছ। কোথায়? লোকো ট্যাংকে?'

'হ্যাঁ।'

'ছিপ কিনলে?'

'না, চেয়ে এনেছি দাসবাবুর কাছ থেকে। দেখবো একবার। ছিপটা ভাল মনে হচ্ছে না।'

'কবে যাবে?'

'দেখি। মাছ ধরা কিছুই নয়। তবে তেমন একটা মাছ ধরায় অনেক হিম্মত লাগে। ভাল ছিপ দরকার।'

'তুমি যেদিন মাছ ধরতে যাবে— আমাদের নিয়ে যাবে তো?'

'বৃষ্টি না হলে নিয়ে যাব।'

খুবই খুশি হলাম গজেনকাকার কথায়। লোকে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে দেখেছি দূর থেকে, নিজেরা কখনো মাছ ধতে যাইনি, ট্যাংকের পাশে বসেও থাকিনি। যাক্, এবার অন্তত গজেনকাকার শাগরেদ হয়ে মাছ ধরতে যাব।

দিন তিনেক কাটতে-না-কাটতেই একটা হই-হই পড়ে গেল। পড়বারই কথা। গজেনকাকা ছিপ আছেন তো আনছেনই। সারা ধানবাদ শহর ঘুরে এর ওর কাছ থেকে কোনোটা সরু, কোনোটা লিকলিকে, কোনোটা মাঝারি, কোনোটা বা বড় মাপের ছিপ এনে জড়ো করতে শুরু করলেন। সবই চেয়েচিন্তে আনা। ঘরে বসে কয়েক দফা সেই ছিপ পরীক্ষা করতেন গজেনকাকা, তারপর যা করতেন সেটা আরও অদ্ভুত।

আমাদের নীচের দালানে একটা বড় চৌবাচ্চা ছিল। জলও ভরা থাকত। গজেনকাকা আমাদের বলতেন ভারী-ভারী জিনিস এনে চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে সেটা ছিপের ডগায় বেঁধে দিতে। আমরা মায়ের রান্নার বাসন-কোশন, শিলের নোড়া, হামনদিস্তের মুগুর—যেখানে যা পেতাম এনে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতাম ছিপের ডগায়। গজেনকাকা ছিপ ধরে টান মারতেন। বলতেন, ছিপের, 'জান' পরীক্ষা করছেন। আসলে কাকা কম-সে-কম একটা সাত-আট সেরি মাছ তো ধরবেনই। কাজেই কষ্ট করে মাছ ধরার পর যদি সেটা ওঠাতে গিয়ে ছিপ ভেঙে যায় তবে কী হবে?

কথাটা ঠিকই। আমরা ভাইবোনেরা গজেনকাকার বুদ্ধির তারিফ করতাম।

এইসব কাজকর্ম একটু লুকিয়ে-চুরিয়ে হত, যেন মায়ের চোখে না পড়ে যায়। রান্নাঘরের বাসনপত্র শিল-নোড়ার এই দুর্গতি মা সহ্য করবেন না।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। মা ধরে ফেললেন একদিন।

গজেন-কাকা মাথা চুলকে বললেন, 'দাদার সেদিন মাছটা খেতে খুব ভাল লেগেছিল। ওটা ছিল বড় কাতলা। পাকা রুই আরও ভাল লাগবে। আমি একদিন সের আষ্টেকের একটা মাছ ধরব ভাবছিলাম বউদি।'

মা বিলক্ষণ চেনেন গজেনকাকাকে। বললেন, 'মাছ পুকুরে থাকে, চৌবাচ্চায় নয়। তুমি পুকুরের পাড়ে গিয়ে বসে থাকো গে।'

গজেনকাকা বোধহয় দুঃখই পেলেন, কিন্তু হাল ছাড়লেন না।

বোধহয় পরের দিনই গজেনকাকা সটান ট্রেনে চেপে চলে গেলেন আসানসোল। সেখান থেকে সন্ধেবেলায় গাড়িতে ফিরে এলেন মস্ত এক ছিপ নিয়ে। চকচকে হুইল। ছিপটা দেখে আমরা বেজায় খুশি। কাকা বললেন, আসানসোল আঢ্যি কোম্পানিতে এর চেয়ে ভাল ছিপ আর ছিল না। কাগজে মোড়া আধ ডজন বঁড়শিও দেখালেন গজেনকাকা।

ছোট-বড় বঁড়শি। আর সেই সঙ্গে লাল কাগজের মলাট দেওয়া, অনেকটা ধারাপাতের মতন দেখতে, একটা বাংলা চটি বই, তাতে নানার রকম চার আর টোপ দেবার ফিরিস্তি লেখা আছে।

এরপর দিন দুই গেল চার তৈরি করতে। গজেনকাকা বইয়ের লে।া থেকে অর্ধেক নিলেন, অর্ধেক বার করলেন মাথা খাটিয়ে। বললেন, 'দেখ, মাছ তো আর ছাগল নয় যে, যা পাবে খাবে, তাদের পছন্দ আছে। ও-সব আজেবাজে জিনিস দিয়ে চার আমি মাখব না। খেতে ভাল, গন্ধ আছে-এমন জিনিস দিয়ে চার তৈরি করব।'

গজেনকাকা কী কী জিনিস দিয়ে চার তৈরি করেছিলেন আজ আর তা মনে নেই— তবে এইটুকু মনে আছে, বেড়াল পচলেও তার চেয়ে খারাপ গন্ধ বেরোয় না। মায়ে ভয়ে গজেনকাকা বাগানে হাঁড়ি চাপা দিয়ে চার রেখে এসেছিলেন।

বাবার চোখে এত তোড়জোড় ধরা পড়ল, নাকি মা কিছু বলে দিয়েছিলেন কে জানে— বাবা বললেন, 'গজেন, তুমি কি ছিপের দোকান খুলবে?

গজেন-কাকা বিনয় করে জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে না।'

'তবে'?

'একদিন মাছ ধরতে যাব।'

'আচ্ছা! তা তোমার কি মাছ ধরার অভ্যেস আছে?'

'মোকামার গঙ্গায় ধরেছি।'

বাবা কৌতকু বোধ করছিলেন। 'বাঃ, তবে তো তোমার হাতযশ আছে। চেষ্টা করে দেখো। তা মাছ ধরতে কোথায় যাবে ভাবছ?'

'আজ্ঞে লোকো ট্যাংকে।'

'সে কী, তার জল তো শুকিয়ে গেল! মাছও শুনেছি সব শেষ।'

এবার গজেনকাকা বিজ্ঞের মতন একটু হেসে বললেন, ' শেষ কেমন করে হবে দাদা! বাড়তি জলে যে-সব মাছ ভেসে উঠেছিল সেগুলো হল হালকা মাছ। হালকা জিনিস জলে আগে ভেসে ওঠে, ভারী জিনিস থাকে তলায়। আমি কম করেও সাত-আট-সেরি মাছ ধরব।'

গজেনকাকার কথায় বাবা হেসে বললেন, 'তা ঠিক। দেখি ক'সের মাছ ধরতে পারো!'

পরের দিন গজেনকাকার শাগরেদ হয়ে আমরা দুই ভাই চললাম লোকো ট্যাংকে মাছ ধরতে। অর্থাৎ গজেনকাকার মাছ ধরা দেখতে। মেয়েদের মাছ ধরতে যেতে নেই বলে তুলতুলিকে আমরা সঙ্গে নিলাম না। সে ভীষণ চটে গেল। মা বারবার বললেন, 'জলে নামবে না তোমরা।'

বর্ষার দিন। মেঘলা অল্পস্বল্প হবেই। দু-এক পশলা বৃষ্টিও হতে পারে। গজেনকাকা বড় একটা ছাতা নিলেন, আমরা দুই ভাই নিলাম ছোট-ছোট ছাতা। গজেনকাকা ছিপটাকে ঘাড়ে চাপিয়ে ছাতার বাঁটে অমন বিদঘুটে গন্ধআলা চারের কৌটো কাপড়ের পুঁটলিতে ঝুলিয়ে মাছ ধরতে চললেন। পিছুপিছু আমরা। দেখলে মনে হবে গজেনকাকা আমাদের

সঙ্গিনধারী সেপাই।

লোকো ট্যাংকের জল তখন সত্যিই কমে গিয়েছে। চারদিকে কাদাকাদা ভাব, বড় বড় ঘাস, নানা রকম লতাপাতা, শ্যাওলা, শাপলা। ট্যাংকের একদিকে রেললাইন অন্যদিকে মাঠ।

তখন দুপুর। ভাত খেয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। মাইল খানেকের বেশি হাঁটা হয়েছে, মেঘলা-মেঘলা ভাব থাকলেও দরদর করে ঘামছি।

মাছ ধরার ভিড় নেই ট্যাংকে। নেহাত মাছ-ধরার নেশা যাদের, তেমন পাঁচ-সাত জন বসে আছে ছাতা মাথায়।

অন্যদের অনেক দূরে রেখে গজেনকাকা একটা জায়গা বেছে নিলেন। জল-বরাবর সরুমতন একটা তক্তা পাতা, চারদিকে শ্যাওলা আর শাপলা। গজেনকাকা তক্তার ওপর বসে বেশ কিছুক্ষণ সব নজর করলেন, তারপর চারের কৌটো খুলে সেই অদ্ভুত পদার্থ পাঁকের সঙ্গে মেখে নিয়ে তাল পাকিয়ে জলে ছুঁড়তে লাগলেন। গন্ধে বমি আসছিল আমাদের। কয়েকটা ব্যাঙ লাফিয়ে তক্তায় উঠল। আমরা তক্তার ত্রি-সীমানাতেও থাকলাম না।

গজেনকাকা হাত ধুয়ে একটা মহাদেব-মার্কা বিড়ি ধরালেন, বোধহয় গন্ধ কাটাতে।

বেশ খানিক্ষণ অপেক্ষা করার পর গজেনকাকা ছিপ, বঁড়শি সব ঠিকঠাক করে নিয়ে ছিপ ফেললেন। বললেন, 'চারটে বঁড়শি দিলাম রে। বড় মাছ তো। কালোজাম আর রুটির টোপ দিয়েছি। বাবুরা নেচেনেকে ছুটে আসবে।' আমরা দুই ভাই সামান্য তফাতে বসে পড়লাম।

গজেনকাকা ছিপ ফেলে জলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মাঝে-মাঝে কথা বলছিলেন আমাদের সঙ্গে। মাছ ধরার গল্প বলছিলেন। মোকামার গঙ্গায় কাকা রুই, কাতলা, মৃগেল, গলদা কত কী ধরেছেন। মাছ ধরা হল বুদ্ধির খেলা। মাছের সঙ্গে বুদ্ধি খেলিয়ে লড়তে হয়।

দেখতে-দেখতে এক ঘন্টা কাটল। বিকেল চারটের গাড়িও চলে গেল। মাঝে-মাঝেই মালগাড়ি যাচ্ছে লাইন দিয়ে। মাটি যেন সামান্য কেঁপে উঠছিল গাড়ি যাবার সময়। যতবার গাড়ি যাচ্ছে ততবার গজেনকাকা বিরক্ত হচ্ছেন, যেন মাছরা শব্দ শুনতে পাচ্ছে গাড়ির।

দু-ঘন্টা কাটল। তিন ঘন্টা। বিকেল শেষ। আকাশে একটু কালচে মেঘও উঠেছে। আমাদের ভয় করছিল, আর খানিকটা পরে বিকেল মরে সন্ধে হয়ে আসবে, বৃষ্টিও আসতে পারে। অন্ধকার হয়ে গেলে এখানে বসে থাকব কেমন করে।

গজেনকাকার কোনো হুঁশ নেই। ফাতনা দেখছেন এক দৃষ্টে। মাঝে-মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ সইয়ে নিচ্ছেন।

আমরা অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়! খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছিল। মাছরা একটুও নেচেনেচে আসছে না।

'কাকা?'

'উঃ!'

'মাছ আর আসবে না। বাড়ি চলো।'

'আসবে।'

'আর কখন আসবে! এত দেরি হচ্ছে।'

'বড় বড় মাছ অনেক তলায় থাকে। তলা থেকে আসতে দেরি হয়। এইবার আসবে।'

আরো খানিকটা সময় গেল। অন্ধকার-মতন হয়ে আসছিল। বাদলা-হাওয়া আসতে লাগল। বৃষ্টি বোধহয় এসেই গেল।

হঠাৎ দেখি গজেনকাকা উঠে দাঁড়িয়েছেন। ছিপের হুইলে হাত। বললেন, 'টোপ গিলেছে। এইবার বাছাধনকে .....'

গজেনকাকা সুতো ছাড়তে লাগলেন।

আমরা হাঁ করে তাকিয়ে। সন্তু বলল, 'কাকা, কী করছ?'

'মাছ খেলাচ্ছি।'

মাছ বোধহয় খেলতেই লাগল।

গজেনকাকার সব সুতো যখন ফুরিয়ে গেল, তখন কাকা আচমকা লাফ মেরে পেছন দিকে সরে এসে ছিপ হাতে দৌড়তে লাগলেন।

আমরা কিছুই না বুঝে ভয় পেয়ে কাকার সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়তে লাগলাম।

শেষপর্যন্ত কাকা মাঠের কাদার মধ্যে পা পিছলে একেবারে চিত হয়ে পড়লেন। হাতে ছিপ।

আমরা কাকার কাছাকাছি এসে হাঁফাতে লাগলাম।

কাকা বললেন, 'বেজায় ভারী মাছ। দশ-বারো সের হবে। দেখ তো ডাঙায় উঠল কি না?'

দশ সেরের মাছ শুনে আবার আমরা ট্যাংকের দিকে ছুটলাম।

গিয়ে দেখি মাছের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। ভাঙা চোরা ফুটোফাটা শ্যাওলা মাখা একটা ছোট বালতি পড়ে আছে।

সন্তু চেঁচিয়ে বলল, 'কাকা, মাছ নেই।'

কাদামাখা গজেনকাকা উঠে দাঁড়িয়েছেন। হাতে ছিপ।

কাছে এসে কাকা সব দেখলেন। তারপর বললেন, 'মাছটা বড় চালাক, বালতি মাথায় দিয়ে টোপ খেয়েছে। কাল এসে বেটাকে ধরব।'

আমরা অবশ্য আর গজেনকাকার সঙ্গে মাছ ধরতে যাইনি।

ভদ্রতার ঝঞ্ঝাট

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

সংসারে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে কারুর কোন হাঙ্গামাতে থাকবো না— গোলমালে যাবো না, নির্বিবোধ হ'য়ে থাকবো, দেখবেন— তা' কিছুতেই পারবেন না ; মানে, আপনাকে তা পারতে দেবে না। লোকের স্বভাব হ'চ্ছে অকারণে বিরক্ত করা। লোককে সেটা যদি বুঝিয়ে দেন যে আপনি বিরক্ত হ'চ্ছেন, হাবে ভাবে আবার তা' বোঝালে হবে না-ব'লে বোঝাতে হবে, তবেই হবেন অতি বদ্‌লোক, আর যদি ভদ্রতার খাতিরে কিছু না বলেন, তাহ'লে সারা জন্ম আমার মত মুখ বুজে পড়ে মার খান— আর ঝঞ্ঝাট পোয়াতে থাকুন!

আমার হয়েছে মশাই, বিপদ! যত নির্বিবোধ হয়ে একপাশে পড়ে থাকতে চাই তত বিরোধ বাড়ে। মানে দেখলাম সমস্ত সংসার আমাকে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে দেবেনা বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। একটা দিনের শুধু ব্যাপার শুনুন!

সকাল বেলা উঠে, গেরস্থ-লোক একটু বাড়ীর কাজ-কর্ম সারতে হয়— খুব ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে এলেন একজন পরিচিত বন্ধু আড্ডা দিতে। তিনি বেশ ভালরকম জানেন আমার অবস্থা ; একটু পরে অফিস যাব, বাজার করতে হবে, কনট্রোল থেকে চাল ডাল আনবো। ঠিক সেই সময় তিনি এলেন আপ্যায়িত হতে। বসলেন তো ওঠেন না কারণ তাঁর তাড়া নেই — এদিকে দেখছেন আমি উস্‌খুস্ কচ্ছি কিন্তু ভদ্রতায় বাধছে বলতে যে আপনি উঠুন! তাঁর বয়ে যাচ্ছে! আমি উস্‌খুস্ কচ্ছি, একটুতেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছি হুঁ হুঁ করে কথার জবাব দিচ্ছি, তবু তিনি নির্বিকার। শেষকালে বাধ্য হয়ে উঠে পড়লুম এবং চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে দেঁতো হাসি হেসে, বলে ফেললুম, "আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি— আবার আফিসে যেতে হবে!"

'ও তাড়া আছে বুঝি?' এতক্ষণে তিনি হৃদয়ঙ্গম ক'রলেন যে আমার তাড়া আছে, তাও পূর্ণভাবে নয়, আংশিক। কারণ দণ্ডায়মান হ'য়ে তাঁর আবার কথা চ'ললো হ্যাঁ, তাহ'লে আর আপনাকে কি ধ'রে রাখবো না, তবে একটা কথা— সেই ঘনশ্যামের ছেলেটা আজকাল কি ক'চ্ছে, অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। সুরেনের মামীর শুনলুম খুব অসুখ, সেদিন দেখলুম ট্রামে চ'লেছে, চেহারাটাও খারাপ হয়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে কয়েকটা জবাব ছাড়লুম এবং শেষকালে আর উত্তর দিলুম না। শূন্য দরজার দিকে চেয়ে তিনি এতক্ষণে 'আচ্ছা চলি, আর একদিন আসা যাবে' ব'লে এগুলেন! বুঝুন আক্কেল! বলুন, এর প্রতিকার কি?

এদিকে তো ৮টা বেজে গেল, কখন রেশন আনবো আর বাজার ক'রবো? অতএব দ্রুত স্নান এবং তার চেয়ে দ্রুত হণ্টনে ট্রাম-ডিপোয় গমন। ইচ্ছে একটু ব'সে যাওয়া তা' সেখানে পৌছে দেখলুম সে ইচ্ছাটা আপিসের টাইম্ কাবার হ'য়ে গেলে হয়তো পূরণ

হ'তে পারে। সমস্ত ভর্তি।

মাত্র সামনের সিটে একজন হোমরা চোমরা ভদ্রলোক বসে আছেন। তার পাশেই খালি দেখে বসলুম। কিন্তু পরে বুঝলুম কাজটা ভাল করিনি। কোম্পানি দুটি লোকের বসবার জন্যেই মাপ করে সিট তৈরী করেছিলেন, কিন্তু আমার পূর্ববর্তী আরোহী মহাশয়ের তা ইচ্ছে নয় ব'লে তিনি আগের দখলিদার হিসেবে বেঞ্চে বসে আছেন।

সোজা হ'য়ে ব'সলে পার্শ্ববর্তী লোকটির যে একটু স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধে হ'তে পারে এইখানেই তাঁর আপত্তি।

কোনক্রমে ব'সলুম। ভেবেছিলুম একজন পাশে এসে ব'সলে হয়তো ভদ্রলোক করুণা ক'রে একটু সোজা হবেন, কিন্তু তাঁর বয়ে গেছে, অসাড়! ফলে আমার শরীরে অর্ধভাগ শূন্যে রইলো, বাকীটুকু ১ ইঞ্চিপরিমাণ জায়গায় ঠেকানো। একবার একটু ভদ্রতার ইঙ্গিত জানবার জন্য ঈষৎ একটু ঠেলা দিলুম, তিনি মিক্শচারের শিশি নাড়ার মত নিজের দেহটাকে সেই স্থানেই একটু নেড়ে নিলেন, যেন জানালেন 'এই তো তোমার কথা রেখেছি বাপু, আর জ্বালিও না।' যেভাবে তিনি ব'সেছিলেন ত' দেখলে মনে হয় যেন ভদ্রলোক তাঁর পিতৃদত্ত জমিদারীতে তাকিয়া হেলাম দিয়ে একটু পরেই আলবেলা টানবেন বোধহয়।

হঠাৎ উঠেই বা দাঁড়াই কি করে? বলিই বা কি? একটা হাস্যোদ্দীপক অবস্থার মধ্যে নিজেকে নিপতিত করার প্রবৃত্তি আমার হ'ল না। ভদ্রতার খাতিররে কিছু ব'লতে না পেরে সমানে জিম্‌নাস্টিকের কসরৎ ক'রতে ক'রতে একটা ঊরুর ওপর ভর দিয়ে ডিপো থেকে পাঁচ মাইল মনে করুন আপিসে এলুম। কি ঝঞ্ঝাট বলুন তো?

একটি ফাউন্টেন পেন আছে। পাঁচবার সারিয়ে লিখছি, ঠিক সেই সময় প্রত্যেকের কলমটি দরকার এবং কলমটি অপরের ব'লে সেটিকে চাপ দিয়ে লেখা চাই তাদের— দুদিন পরে চাপের চোটে সব গেল ঢলঢল হ'য়ে। বাঙালীর মুঠোর মধ্যে কিছু আঁটসাট থাকবার জো আছে?— অতচাপ সইবে কেন? তা সর্ব সময় লোককে কি বলা যায় যে 'মশায়, একটু আলতো চাপ দিন! কি ঝঞ্ঝাট বলুন তো! যদি না দিই লোকে ব'লবেন, 'একবার দিলে কি ক্ষয়ে যাবে? কিন্তু ওদিকে আমি যে দিতে দিতে ক্ষয়ে গেলুম সেটা বুঝছেন কি?'

সিগারেট আজকাল গুরুজনের সামনে খাওয়া ভাল, কারণ তাঁরা চাইবেন না, কিন্তু বন্ধুবান্ধবের সামনে প্যাকেট খোলার জো আছে? আড়ালে খুলে খান তখনি শুনবেন, 'দেখি একটা ভাই', কেউ আবার তাও বলেন না শুধু দুটো আঙ্গুল বাড়িয়ে দেন অর্থাৎ তাতে সিগারেটটা পরিয়ে দাও এইভাবে— বুজুন ব্যাপার।

মাইনের টাকা নিয়ে বাড়ি এসেছি— তিনজন মহাবিপদগ্রস্ত হ'য়ে উদ্ধারের জন্য আমার কাছে ছুটে এলেন— কিছু ধার দাও! দিন তিনেক পরেই ফিরিয়ে দিয়ে যাব— না যদি দিই ভদ্রতায় বাধে আর যদি দিই বাড়ীতে কুরুক্ষেত্র হয়। অন্তত চুপি চুপি দিলুম এবং ব'লে দিলুম ভাই, সংসারের খরচ থেকে দিচ্ছি, তাঁরা আমায় এমন আশ্বাস দিয়ে গেলেন যেন এই যাব আর চলে আসবো এই রকমভাবে— আজও তাঁরা আসছেন— আমি ব'সে

আছি, মাস সাত্তেক কেটে গেছে গিন্নীর সঙ্গে নানান তালগোল করে আজও হিসেব মেলাতে পারছি না। শুধু ঝঞ্ঝাট!

সেদিন নতুন দুখানি রেকর্ড কিনে নিয়ে এলাম। পাশের বাড়ির চক্রবর্তী মশাই শুনলেন— অতএব তাঁর বাড়িতে একবার সেগুলি শোনানো চাই। মেশিন, রেকর্ড মায় পিন সব চলে গেল। মাস দুয়েক পরে অবশ্য ফিরেও এল একদম নতুনভাবে— সমস্ত মনে করুন প্লেন হ'য়ে গেছে। তার জন্যে চক্রবর্তী মশায়ের বিন্দুমাত্র লজ্জার কারণ নেই, বরং চক্রবর্তী মশাই বললেন, নিন মশাই আপনার যন্তর ফিরিয়ে, ছেলেপুলেগুলো দিনরাত যখন তখন বাজিয়ে একেবারে কান ঝালাপালা ক'রে দিলে তাই আমি আজ জোর ক'রেই টেনে নিয়ে এলুম। অর্থাৎ এই বিরক্তিকর যন্ত্রটা আমিই যেন মাথার দিব্যি দিয়ে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলুম— তিনি আজ তো আমার হাতে সমর্পণ ক'রছেন কিন্তু যখন তা সমর্পণ করলেন তখন প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও তার আওয়াজ বার করা গেল না। যদি বলেন, 'দাও কেন?' খুব ভাল কথাই ব'ললেন! আমায় তো ভদ্রতা রেখে সমাজের পাঁচজনের সঙ্গে বাস করতে হবে? থাকলে 'না' বলি কি করে?

এইজন্যে তো মনে করুন সম্প্রতি বই কেনা ছেড়ে দিয়েছি। একশো একাশি জন বন্ধু বই কেনেন না চেয়ে পড়েন। আমি আহাম্মক, আমি কিনি। তাঁরা প'ড়তে নিয়ে যান এবং তারপর বাড়ীতে সাজিয়ে রেখে দেন। যাঁরা আবার তার মধ্যে সমজদার লোক তাঁরা আবার সেগুলি যে কত ভাল লেখা তা পড়াতে তাঁদের অন্যান্য বন্ধুদের কাছে চালান ক'রে দেন— আমি তার বছরখানেক পরে পুরানো বইয়ের দোকান থেকে আমারই নাম লেখা বই কিনে নিয়ে আসি। যদি না দিই তা'লে বন্ধুত্ব থাকে না।

মেয়ে গান শেখে, একটি হারমোনিয়ম কিনেছিলুম, কিন্তু পাড়া, প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনের সেটির সুর এত পছন্দ যে কেনা এস্তক তা আমার বাড়ী থাকে না— তাঁদের বাড়ীতেই ঘোরে। একবারটি চাইলে তো 'না' বলা যায় না— দিতে হয়। ফলে সেটির বর্তমান অবস্থা হ'য়েছে শোচনীয়, এখন সেটি থেকে বেলো করলে আর আওয়াজ বেরোয় না— দীর্ঘশ্বাস বেরোয়।

বলুন দেখি কি ঝঞ্ঝাট? আমি করি কি? সকাল বেলা কাগজ আসে তা' পাশের বাড়ীর মিত্তির মশাই আমার বাড়ী এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে যান। ট্রামে খবরের কাগজটা পড়ি তাও নির্ঝঞ্ঝাটে পড়বার জো আছে? ঠিক পাশের লোকটির সেটি দরকার! 'স্যার, কাইণ্ডলি দেবেন একখানা পাতা!' — বুঝুন!

আমি জানি আপনারা ব'লবেন— কেন ক্ষয়ে যাবে কি? না ক্ষয়ে যাচ্ছে না কারুরই কিছুই— কারণ এদিকে আমি যে শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র শর্মা হ'য়ে ব'সে আছি।

আষাঢ়ে স্বপ্ন

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

তখন পুজার ছুটি। আমি আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছি। ক্লান্তিবোধ হওয়াতে সকাল সকাল শুইয়া পড়িলাম। যেমন শোওয়া, অমনি ঘুম। এ অভ্যাসটি আমার ছেলেবেলা হইতে! কিন্তু সে কথা যাক্— আমি তো ঘুমাইয়া পড়িলাম। খানিক পরে মনে হইল, আমি যেন আলিপুরে গিয়াছি। সেটা যেন সিংহ, বাঘ আর ভালুকের দেশ। চারিদিকেই জানোয়ারের ঘর-বাড়ি, জানোয়ারের পথ-ঘাট, জানোয়ারের হাট-বাজার। জানোয়ারগুলো যেন সকলেই স্বাধীন। আবার সম্প্রতি যেন তাহারা কিছু অধিক মাত্রায় শান্তশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে! সিংহ-বাঘেরও রক্ত-মাংসে আর তেমন রুচি নাই! তাই, তাহাদের কাহাকেও আর আটকাইয়া রাখিবার দরকার হয় না।

যাহা হউক, তাহাদের নিকট হইতে একটু দুরে থাকা ভাল মনে করিয়া আমি একটা বড় রাস্তা ধরিলাম। কিছু দূর গিয়া, প্রথম পরিচয় হইল উল্লুকের সঙ্গে। তাহার নাম 'চতুর্ভুজ'। চতুর্ভুজ বেশ ভালমানুষ! দুই দণ্ডেই আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়া লইল। আমি বলিলাম, 'তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি ; এখানে দেখাবার মত কিছু আছে কি?' চতুর্ভুজ বললি, 'দেখবার অনেক জিনিস আছে। বিশেষ, কাল আমাদের রাজার ছেলের বিয়ে। তাই কয়েক দিন থেকে খুব ধুমধাম আমোদ-আহ্লাদ চলছে। চল, তোমাকে কিছু কিছু দেখিয়ে আনি।'

আমরা দুইজনে বাহির হইলাম। রাস্তার মোড় ফিরিয়াই, সম্মুখে খুব বড় প্রকাণ্ড বাড়ি দেখতে পাইলাম। চতুর্ভুজ বলিল, 'ঐ আমাদের রাজার বাড়ি।' বাড়ির সম্মুখে গিয়া দেখি, মস্ত মস্ত ফটক! বন্দুকে সঙিন চড়াইয়া 'পেঙ্গুইন' সাহেব পাহারা দিতেছে। বন্দুক দেখিয়া বুকটা গুর গুর করিয়া উঠিল! আর মুখের চেহারাটাও, বোধ করি, কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছিল। তাহা না হইলে চতুর্ভুজ আমার মনের ভাব বুঝিল কেমন করিয়া! আমাকে সাহস দিবার জন্য সে বলিল, ভয় কি। এ তো আর মানুষের দেশ নয় যে, এখুনি বন্দুক উঠিয়ে গুলি ছুঁড়বে। এটা জানোয়ারের মুল্লুক! এখানে কাউকে গুলি করবার হুকুম নেই।'

চতুর্ভুজের কথা শুনিয়া আমার একটু সাহস বাড়িল। বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজবাড়ি দেখিতে লাগিলাম। রাজবাড়ি অতি পরিপাটি। চারিদিকে মোটা মোটা থাম ; থামের উপর বড় বড় খিলান! খিলানে ও কার্নিসে নানা রকম কাজ-করা। অনেকটা সেকেলে রাজ-রাজড়াদের বাড়ির মত। সিঁড়ির দুইধারে নানা রকম ফুল ও পাতাবাহারের গাছ। সম্মুখে ফুলবাগান। আমরা এদিক সেদিক চাহিতে দেখিলাম, ঘরের ভিতর প্রকাণ্ড এক সিংহ বসিয়া রহিয়াছে, আর একটা ভালুক তাহার চুল ছাঁটিয়া দিতেছে! আমি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ও কে?'

চতুর্ভুজ বলিল, 'উনিই আমাদের রাজা। রাজামশাই এখন ক্ষৌরি হচ্ছেন। রাজার

সঙ্গে তুমি দেখা করবে?' আমি বলিলাম, 'না ভাই, তোমাদের রাজার সুমুখে যেতে আমার সাহস হচ্ছে না। চল, অন্য রাস্তা ধরি।' চতুর্ভুজ একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমি এত ভীরু!'

আবার দুইজনে চলিতে লাগিলাম। রাজবাড়ির দক্ষিণ দিক দিয়া একটা সরু গলি গিয়াছে। সেই গলি ধরিয়া কিছু দূর গিয়াই একখানি খোলার বাড়ি দেখিতে পাইলাম ; সেই বাড়ির ভিতর হইতে একটা যেন নাকি সুরের গোঙানি শব্দ আমার কানে আসিতে লাগিল। চতুর্ভুজ বলিল, 'এটা আমাদের ছেলেদের পাঠশালা। এক বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিত এখানে গুরুগিরি করেন!' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঐ গোঙানিটা কিসের?' চতুর্ভুজ তাড়াতাড়ি দেখিয়া আসিয়া বলিল, 'ও কিছুই নয়। এক ছোকরা দু'য়ে দু'য়ে যোগ করে পাঁচ লিখেছে, তাই গুরুমশাই রাগ করে তার কান ধরে পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে দেবার মতলব করেছেন, আর ছেলেটা কাঁদছে।' আমি বলিলাম 'এই সামান্য অপরাধে এত কঠিন শাস্তি!' চতুর্ভুজ একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'অপরাধটা সামান্য হল কিসে? দু'য়ে দু'য়ে কত হয়, এ যে না বলতে পারে, তাকে পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত।' আমি বলিলাম, 'ভায়া, তুমি তো আর মানুষের ছেলেদের পাঠশালা দেখনি, তাই এমন কথা বলছ! মানুষের ছেলে হলে হয়তো বলত—

দুয়ের পিঠে দুই
বিছানা পেতে শুই।'

— 'একবার একটি ছেলেকে "জল" বানান করতে বলা হয়েছিল। সে অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে ভয়ে এক গা ঘেমে শেষে বলল, "ফু" আর "স"! আর একটি ছেলের হাতে পাঁচটা সন্দেশ দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "এর থেকে যদি কেউ একটা খায়, তবে আর ক'টা থাক্‌বে!" সে তো প্রশ্ন শুনে কেঁদেই আকুল। বাপরে সে কি কান্না! কেবল কাঁদে আর বলে, "আমি একটাও দেব না"।

আমাদের খোকাবাবুদের কথা শুনিয়া চতুর্ভুজ বলিল, 'সত্যি, এমন সব ছেলে নিয়ে তোমরা ঘরকন্না কর! তা মানুষের ছেলে কত আর ভাল হবে! এ রকম ছেলে কিন্তু আমাদের এই জানোয়ারের দেশে একদিনও টিকতে পারত না।'

পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া গল্প করিতে করিতে আমরা একটা ছোট নদীর ধারে উপস্থিত হইলাম। ঘাটে দেখিলাম, একখানা নৌকা বাঁধা। ওপারে যাইবার জন্য বিস্তর জানোয়ার জড় হইয়াছে। কিন্তু খেয়া-মাঝি কুমির আজ গরহাজির। অফিসের বেলা যাইতেছে, তবুও মাঝির দেখা-সাক্ষাৎ নাই। খোঁজ করিতে করিতে শুনিতে পাওয়া গেল, বেচারার একটা দাঁতে বড় ব্যথা হইয়াছে, তাই সে লেজমোটা নামে এক নামজাদা ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছে। দাঁতটা নাকি তুলিয়া ফেলা নিতান্তই দরকার।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানেও আবার ডাক্তার আছে?' চতুর্ভুজ বলিল, 'ডাক্তার? বড় যে সে ডাক্তার নয়! এমন দু'চার জন মানুষের দেশে থাকলে, তোমরা প্রাণের ভয়ে সর্বদা এত অস্থির হয়ে বেড়াতে না!' আমি বলিলাম, 'সত্যি! তবে তো তোমরা বেশ সুখেই আছ, এখানে কোন্ কোন্ অসুখ বেশী?' চতুর্ভুজ বলিল 'জ্বর-জাড়ি বড় একটা এখানে নেই। লেজ-ছেঁড়া রোগই এখানকার প্রধান রোগ। এমন দিন প্রায় যায় না, যে

একজন না একজনের লেজ না ছেড়ে। তা ডাক্তারও তেমন সরেস! তার ওষুধের গুণে বোঁচা লেজ গজিয়ে উঠতে বোধহয় এক মুহূর্ত ও সময় লাগে না! আবার যদি তিনি সেই ছেঁড়া-লেজ টুকুর কাটামুখ এক ফোঁটা ওষুধ দেন, অমনি দেখতে দেখতে তা থেকে একটা আস্ত নতুন জানোয়ার গজিয়ে ওঠে! ব্যাপারখানা কি, একবার ভেবে দেখ। চার-পাঁচ দিনের কথা,— একটা শেয়ালের লেজ ছিঁড়ে গিয়েছিল। সে সেই লেজটুকু মুখে করে নিয়ে তখনি ডাক্তারের কাছে ছুটে গেল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তার বোঁচা লেজে এক ফোঁটা ডাক্তারি ওষুধ পরিবামাত্র একটা নতুন লেজবার হল! আর সেই ছেঁড়া টুকরাতে এক ফোঁটা ওষুধ দিতে তা থেকে একটা নতুন শেয়াল গজিয়ে উঠল! তারপর ডাক্তারকে সেলাম করে দুই শেয়াল গজিয়ে উঠল! তারপর ডাক্তারকে সেলাম করে দুই শেয়ালে গল্প করতে করতে বাড়ি চলে গেল।' চতুর্ভুজের গল্প শেষ হইতে না হইতেই নিকটে একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। চতুর্ভুজ বলিল, 'ভয় কি; মানুষের মত এমন ভীরু আমি আর দেখি নি!' আমি মুখখানা একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিলাম, 'না, ভয় আর কিসের? তবে কি না ভায়া, মানুষের প্রাণের দামটা বড় বেশি ; তাই একটু সাবধানে থাকতে হয়।' এই সময় আবার বন্দুকের আওয়াজ হইল। আমরা দেখিলাম, রাস্তার একপাশে দুইজন শিকারি বন্দুক হাতে করিয়া বসিয়া আছে। চতুর্ভুজ বলিল, ঐ দু'জন এখানকার গোরাপল্টন ; ওদের সঙ্গে একটা নেউল দেখছ? ওটাই ওদের কুকুর! ওরা তেমন ভাল শিকারি নয়। আমাদের এই দেশে এমন সব শিকারি আছে যে, তাদের কথা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। আমার নিজের শিকারের একটা গল্প বলি শোন। একবার শিকারে বার হয়ে রাঙা হরিণ দেখতে পাই। তার সর্বাঙ্গ ঠিক যেন মখমলে ঢাকা! এমন সুন্দর হরিণ দেখলে চামড়াখানির ওপর কার না লোভ জন্মে? কি উপায়ে ওটা আস্ত পাওয়া যায়, তাই ভাবতে লাগলাম। যদি গুলি করে হরিণটি মারি, তা হলে তো চামড়ার দফারফা! শেষে অনেক ভেবে চিন্তে এক উপায় ঠিক করলুম। হরিণ খুব মোটা একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি পকেট থেকে একটা পেরেকে বার করে বন্দুকে পুরে, তার লেজে গুলি করলাম। আমার লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ! পেরেক ঠিক হরিণের লেজ ফুঁড়ে গাছে বিঁধে গেল। অনেক টানাটানিতেও সে পালাতে পারল না। তখন আমি একখানা ধারাল ছুরি দিয়ে তার নাকের মাঝামাঝি খানিকটা চিরে দিলাম, আর এক গাছা বেত নিয়ে খুব জোরে তাকে মারতে লাগলাম। মারের চোটে ছটফট করতে করতে বেচারা হরিণ সেই চেরা নাকের ফাঁক দিয়ে বার হয়ে পালিয়ে গেল। আস্ত চামড়াখানা নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম।' চতুর্ভুজের কথা শুনিয়া আমি তো অবাক! অনেক শিকারি দেখিয়াছি, কিন্তু এখন আশ্চর্য শিকারের কথা জন্মেও শুনি নাই। ধন্য জানোয়ারের দেশ!

ইহার পর আমরা নদীর ধার হইতে ফিরিলাম। কিছু দূর আসিয়া সম্মুখে হ্যাট-কোট পরা এক সাহেব দেখিলাম। তাহার সঙ্গে দুইটি ছেলে। জানোয়ারের রাজ্যে সাহেব দেখিয়া প্রথমটা আমার আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কাছে আসিলে দেখিলাম, সে সাহেব নহে, একটা 'বুলডগ'। সাহেবের পোশাক পরিয়া সাহেব সাজিয়াছে। আমাদের খুব কাছাকাছি হইলে, কুকুরসাহেব ইশারা করিয়া চতুর্ভুজকে তাহার কাছে ডাকিল। তারপর দুইজনের

মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলিল। কি কথা হইল জানি না, কিন্তু কথাগুলো যে আমাকেই লক্ষ্য করিয়া, তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। কারণ কথা বলিতে বলিতে সাহেব কেবলই আমার দিকে তাকাইতেছিল। যাহা হউক, সে চলিয়া গেলে, চতুর্ভুজ আমার কাছে আসিয়া বলিল, 'লোকটা, কে, জান? এখানকার পুলিস সার্জেন্ট। এই দেশে কোন নতুন লোক এলে, ওকেই তার খোঁজ-খবর রাখতে হয়। তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

আমি বলিলাম, 'তা তুমি কি বললে?' চতুর্ভুজ বলিল, তোমার পরিচয় দিলাম। তোমার মনে কোনও ফন্দি-টন্দি নেই। কেবল জানোয়ারের দেশ দেখাই তোমার উদ্দেশ; শুনে সাহেব আর কিছুই বলল না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'নতুন লোক দেখলেই তার খোঁজখবর রাখা কি এখানকার রীতি?'

চতুর্ভুজ বলিল, 'তা নয় তো কি; এ কি মানুষের দেশ পেয়েছে যে, চোর-ডাকাত ভদ্র-ইতর— সব এক সঙ্গে বাস করবে?'

আমি আর কিছু না বলিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। ইহার পর গলির মোড় ফিরিয়া, আমরা রাজবাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু এ কি ব্যাপার! একটু আগে যে স্থান বেশ নিরিবিলি দেখিয়া গিয়াছি, এখন দেখি, সেখানে লোকারণ্য— অর্থাৎ জানোয়ারে জানোয়ারারণ্য।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজ এখানে কিছু আছে নাকি?

চতুর্ভুজ বলিল, 'বাঃ তোমাকে তো আগেই বলেছি রাজার ছেলের বিয়ের জন্যে কয়েকদিন থেকে খুব ধুমধাম চলছে। চল, মেলার ভেতর গিয়ে বসি।'

মেলার মধ্যে একটা জায়গা বাছিয়া আমরা বসিয়া পড়িলাম। কিছু পরে হাতির পিঠে চড়িয়া স্বয়ং রাজা মহাশয় উপস্থিত। চতুর্ভুজ আমার গা টিপিয়া আস্তে আস্তে বলিল, 'রাজার মাথায় কে ছাতি ধরে রয়েছে, জান? ও আমার জ্ঞাতি ভাই! দেখলে, আমাদের কত সম্মান?' অহঙ্কারে তখন চতুর্ভুজের নাক তিনগুণ ফুলিয়া উঠিয়াছে! লেজ থাকিলে, বোধ করি, তাহাও ফুলিয়া 'কলার গাছ' হইয়া উঠিত।

আমি বলিলাম, 'তা তো বটেই! বন-গাঁয়ে শেয়াল রাজা! জানোয়ারের রাজ্যেও যদি তোমাদের সম্মান না হয়, তবে আর হবে কোথায়?'

আমার মুখের কথা শেষ না হইতেই, ছোট-বড় দুইটা ভালুক পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে নাচিতে মেলার মধ্যে প্রবেশ করিল। এইটাই প্রথম খেলা। আহা, সে কি রগড়ের নাচ! মানুষের হাতেও ভালুক-নাচ দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সরেস নাচ আর হয় না! দুজনে ভঙ্গি করিয়া নাচে আর সুর করিয়া গান গায়! ভালুকের ভাষার সে গানটা আমি বুঝতে পারলাম না বটে, কিন্তু সকলেই 'বাহবা' করিতে লাগিল।

ইহার পর সিংহ আর ভালুকের ক্রিকেট ম্যাচ। দুই দলই সমান। বাছা বাছা এগারো জন সিংহ আর এগারো জন ভালুক। প্রথমে ভালুকেরা 'ব্যাট' ধরিল, এগারো জন সিংহ ফিল্ড করিতে লাগিল। কিন্তু 'ফিল্ড' করিবে কি, ভালুকের একটা 'হিট' বলটাকে একেবারে 'বাউন্ডারি' পার করিয়া দেয় আর 'রান' বাড়িতে থাকে। প্রথম দু'জনে এমন খেলিল যে,

দ্বিতীয় ব্যাট 'আউট' হইবার পূর্বেই ভালুকদের ৭৯ 'রান' হইল! ইহার পর তৃতীয় ব্যাট আসিল। সে-ও বড় কম নয়। যদি সে অল্পক্ষণ পরেই কট-আউট হইল, তবুও তাহার পূর্বে ৩২টা রান করিয়া লইতে ছাড়ে নাই। ক্রমে ক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম, যষ্ঠ প্রভৃতি সমুদয় ব্যাট উৎসাহে রান করিয়া আউট হইয়া গেল। প্রথম ব্যাট নট আউট রহিল। ভালুকদের পক্ষে রান হইল— ৩৭৫।

ইহার পর সিংহেরা ব্যাট ধরিল। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাট তেমন সুবিধা করিতে পারল না, কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় ব্যাট এমন জোরে বলটাকে সাঁটাইতে লাগিল, যে, প্রথম ব্যাট আউট হইবার পূর্বে সিংহদের রান হইল ১০৬। সিংহদের চতুর্থ, পঞ্চম ও যষ্ঠ ব্যাটের কপাল বড় মন্দ, প্রত্যেক ২/৩ টি মাত্র রান করিয়াই বোল্ড আউট হইল। তৃতীয় ও সপ্তম ব্যাটের খেলা আবার বেশ জমিয়া গেল। তৃতীয় ব্যাট রানের সংখ্যা ২০৩ না করিয়া ছাড়িল না। বাকি কয়েকজনও পাকা খেলোয়াড় ছিল। সিংহদের পক্ষে রান হইল — ৩৯০ ; সুতরাং সিংহেরাই জিতিল।

মানুষের ক্রিকেট ম্যাচ দেখিয়াছি, খেলিতে খেলিতে কেহ খুব বাহাদুরি দেখাইত পারিলে, সকলে হাততালি দিয়া তাহাকে উৎসাহ দিয়া থাকে। কিন্তু এই জানোয়ারদের ক্রিকেট খেলাতে উৎসাহ দিবার রীতি অতি ভয়ানক। এক একজন রান করিতে থাকে, আর হাজার হাজার সিংহ, বাঘ, গন্ডার, ভালুক, কুকুর, বিড়াল, শেয়াল, গাধা উৎসাহে একসঙ্গে গলা ছাড়িয়া চ্যাঁচাইয়া উঠে। বাপরে, সে যে কি সাংঘাতিক আওয়াজ, তাহা কি বলিব। ভয়ে গা-টা যেন ছম-ছম করিয়া উঠে! আর, সে কি একবার? যতবার রান — ততবারই সেই আওয়াজ! সিংহের পক্ষে জয় হওয়াতে, পশুরাজের ভারি আনন্দ। তিনি লেজ নাড়া দিয়ে মনে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর ফুটবল ম্যাচ। সিংহ, বাগ, ভালুক, হাতি, জিরাফ, এবং আরো কতকগুলোতে মিলিয়া দুই দলে ফুটবল খেলিতে লাগিল। দুই দলই সমান। অনেকক্ষণ পর্যন্ত লুটাপুটি হুড়াহুড়ি চলিল ; কোনও পক্ষই জিতিতে পারিল না। ভালুকেরা ক্রিকেট-ম্যাচে হারিয়া খুব অপমানিত হইয়াছিল। পাছে আবার ফুটবল-ম্যাচে হারে, এই ভয়ে তাহারা কোমর বাঁধিয়া খুব উৎসাহের সহিত খেলিতে লাগিল। একে তাহারা পাকা খেলোয়াড়, তাহার উপর আবার প্রাণপণ করিয়া লাগিয়াছে, কাজেই বিপক্ষেরা দমিয়া গেল। উঠাউঠি দুই গোল দিয়া ভালুকেরা ফুটবল ম্যাচ জিতিল। ভালুকদের জিত হওয়াতে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা এমন বিকটস্বরের চিৎকার করিয়া উঠিল যে, সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে কাহার সাধ্য! তাহার ধেই ধেই করিয়া নাচে আর অনেকগুলোতে মিলিয়া 'গাঁক' 'গাঁক' করিয়া একসঙ্গে চ্যাঁচাইতে থাকে! সে চ্যাঁচানি আর থামে না, শেষে এমন হইয়া উঠিল যে, রাজা হুঙ্কার ছাড়িতে বাধ্য হইলেন! তখন সব একেবারে চুপ।

ফুটবলের পর 'টাগ-অফ-ওয়ার'। এক পক্ষে হাতি, সিংহ, চিতাবাঘ ; অপর পক্ষে মহিষ, ভালুক বানর প্রভৃতি। ক্রিকেট, ফুটবলের পর টাগ-অফ-ওয়ার ভাল লাগিবে কি না, — ভাবিতেছিলাম। কিন্তু শেষে বুঝিলাম, এই খেলাটাই সব চেয়ে সেরা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুই দলে প্রাণপণে দড়ি টানাটানি করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ কাহাকেও হটাইতে

পারিল না। টানাটানিতে হাতির উৎসাহ সব চেয়ে বেশি! তার ইচ্ছা, ভালুকের দলটাকে একেবারে মুখ থুবড়িয়া আছাড় দিবে। সেইজন্য এমন জোরে টান দিতে লাগিল যে, ভালুকদের ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া গেল। সবাই ভাবিল, আর দুই-এক মিনিট পরেই ভালুকের দলকে চিৎপাত হইতে হইবে। ঐ—ঐ বুঝি গেল! কিন্তু এ কি, বুড়ো মদ্দ হাতিরটাই কি না শেষে পা পিছলে দড়াম! আহাম্মক হাতির দোষেই অমন পাকা খেলাটি মাটি হইল! রাগে, দুঃখে, অপমানে সিংহ মাথা নিচু করিয়া রহিল। ভালুকের দল আবার উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু এবারকার চ্যাঁচানি অনেকটা ভদ্র রকমের।

টাগ-অফ-ওয়ারের পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর কিছু বাকি আছে কি?' চতুর্ভুজ বলিল, খেলা শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু এবার আমাদের জাতীয়-সঙ্গীত আরম্ভ হবে।

জানোয়ারের আবার জাতীয় সঙ্গীত! কথাটা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। কিন্তু সে হাসি বেশিক্ষণের জন্য নহে —

সামনে এসে দাঁড়ায়, হেন
শক্তি আছে কার?
একেবারে ঘাড়টি ভেঙে
রক্ত শুষি তার!

গানের এই প্রথম চার লাইন শুনিয়া আমার তো চক্ষুস্থির! মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল! কি জানি আমাকে দেখিয়া যদি কাহারও রক্ত আবার শুষিবার ইচ্ছাটা জাগিয়া উঠে! ভাবিলাম, আর নহে, একবারে চম্পট দেওয়াই ভাল। চতুর্ভুজকে বলিলাম, 'চল, যাই।' সে বলিল, না না গানটা শেষ হতে দাও।

ছোট-বড় পার করেছি —
হাজার হাজার ;
জোর যার মুল্লুক তার,
এই নীতি সার!

ক্রমেই আমার শরীরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। ভয়ে মুখ দিয়া একটিও কথা সরিল না। চতুর্ভুজের গা টিপিয়া ইশারা করিলাম, কিন্তু সে-স্থান ত্যাগ করিবার জন্য তাহার ব্যস্ততা দেখা গেল না! এদিকে, তাহাকে চটাইয়া একা চলিয়া আসিতেও আমার সাহসে কুলাইল না!

কাকেও না ডরি মোরা,
মানুষ তো ছাড় ;
সারা জগৎ কেঁপে উঠে
ছাড়িলে হুঙ্কার!

হুঙ্কার না ছাড়িতেই আমার কাছে সারা জগৎ কাঁপিতেছিল, ছাড়িলে তো রক্ষাই ছিল না! আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। চতুর্ভুজ যদি আরো কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চিতই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িতাম। আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, এতক্ষণে তাহার সুমতি হইল — বাহির হইবার জন্য আস্তে আস্তে

উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহার হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া, তবে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

আমার মুখের ভাব দেখিয়া এবার ঠাট্টার বদলে সে বরং সহানুভূতি দেখাইতে লাগল। আমরা কিছুদূর অগ্রসর হইলে পর, সে বলিল, সত্যি তোমার ভয় পাবার কথাই বটে। কিন্তু উৎসবের দিনে, — বিশেষ রাজার সুমুখে কার সাধ্যি তোমাকে কিছু বলে! তাই আমি অতটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম। সে যা হোক্ উৎসব কেমন দেখলে, বল?'

আমি বলিলাম, 'উৎসব বেশ দেখলাম। ক্রিকেট, ফুটবল, টাগ-অফ-ওয়ার — এ সব আমার খুবই ভাল লেগেছে ; কিন্তু ভাই, তোমাদের জাতীয় সঙ্গীত আমাকে আধমরা করে ফেলেছিল! আস্ত দেহ নিয়ে যে আজ ফিরতে পারব সে আশা বড় ছিল না! যা হোক্, এখানে যে প্রাণে বেঁচে এসেছি, সেই ঢের!'

আমরা চলিতে চলিতে আর একটা নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে আসিয়াই চতুর্ভুজের মুখখানা কেমন শুকাইয়া গেল! তেমন স্ফূর্তি, তেমন দন্তবিকাশ আর নাই! তাহার মুখের কথাও যেন ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এতক্ষণে তোমার সাহসেই আমি চলাফেরা করেছি, এখন হঠাৎ তোমার কি হল? তুমি এমন জড়সড় হয়ে পড়লে কেন?' চতুর্ভুজ একটা গাছের উঁচু ডালের দিকে আঙুল বাড়াইয়া, ভয়ে ভয়ে বলিল, ঐ যে পেঁচা দেখছ, ওটাই আমার যম। তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ আলাপ!'

চতুর্ভুজের মুখের কথা না ফুরাতে, সেই পেঁচা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরিয়া ছুটিয়া আসিল এবং জালার মুখের মত প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া চতুর্ভুজকে গিলিয়া ফেলিল।

সেই বিদেশে হাজার হাজার জানোয়ারের মধ্যে আমার একমাত্র বন্ধুর এই দশা দেখিয়া, আমি বিশেষ ব্যথিত হইলাম। রাগে আমার গা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগল। ইচ্ছা হইল, পেঁচার মুণ্ডুটা ছিঁড়িয়া ফেলি! আমি তাহাকে তাড়া করিলাম। সে ভয় পাইয়া নদীতে পড়িয়া গেল। সেখানে একটা হাঁস ভাসিতেছিল ; সে পেঁচা তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল। তাহাকে ধরিবার জন্য আমি ঝাঁপ দিবামাত্র একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইল, আর অমনি স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল।

এ কি! কোথায় জানোয়ারের দেশ, আর কোথায় আমি! জানোয়ারদের মেলা, তাহাদের ক্রিকেট, ফুটবল, টাগ-অফ-ওয়ার খেলা, তাহাদের জাতীয় সঙ্গীত, পেঁচার নিষ্ঠুরতা, — সবই আষাঢ়ে স্বপ্ন। আমি যেখানে যেভাবে শুইয়াছিলাম, তেমনই আছি! মাঝে থেকে, কেমন করিয়া কি যেন হইয়া গেল। আমি আশ্চর্য হইয়া আমার স্বপ্নের কথা ভাবিতে লাগিলাম! তারপর কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, জানি না। সকালে উঠিয়া রাত্রের স্বপ্নের কথা যাহাকে বলি, সে-ই হাসিয়া মরে!

রুপোর ইস্টিলের বাক্স

লীলা মজুমদার

মনি ফণী ঠেঁপি পুঁটি রাখু বাগাই কাউকে খুব ছিরিমন্ত বলা যায় না। রোগা, হাড়-জিরিজিরে, খিদে-খিদে ভাব। ল্যাকপ্যাকে হাত-পা নেড়ে, খনখনে গলায় রুপোদাদার গিন্নির কাছে গিয়ে কেমন রাগ দেখাচ্ছে দ্যাখো না। আর কথার কী ছিরি! 'নেই-জমিদারির জমিদার, তার গোমস্তা রুপো চক্কোত্তি। রুপো না গুপো। নেংচে হাঁটা দেখলেই সব মালুম দেয়! তেজ দেখিয়ে আবার নালিশ করা হয়েছে! বড় বাহাদুরের ভাঙা মঞ্জিলের পেছনের ফুল-বাগান, তাতে যত না ফুল তার বেশি ঝুল! তার পেছনে ফল-বাগান। ফল না ছল! দেখে লোকে হেসে বাঁচে না। দুটো বৈঁচি, দুটো আঁশফল, কটা নোনাগাছ এ ওর গায়ে ঠেকো দিয়ে বচ্ছরের পর বচ্ছর বড় বড় নোনা ধরাচ্ছে। গুটিকতক বুনো কুল, কী টক, কী টক। তবে কামারাঙা গাছের মাথা থেকে পা অবধি সোনালি ফল টসটস করছে, ভেতর থেকে যেন আলো ফুটে বেরুচ্ছে। একটা তে-বাঁকা বুড়ো কাঁঠালগাছও আছে। তার গিঁট-পাকানো ফলগুলোকে ক্যাওট-পাড়ার বাঁদরগুলো যদি ভাল করে পাকতে দিত, মন্দ মিষ্টি লাগত না।' তবু ওই বাগানের মাটিই ওদের খাওয়ায়-দাওয়ায় বলা যায়।

মাটি খুঁড়ে মিষ্টি মান, কন্দ আলু তোলে। মজা পুকুরের ধারে একটা বুড়ো আমগাছ; তার পায়ের গাছে শামুক -গুগ্‌লির মেলা। হাঁড়ি ডুবিয়ে রাখলে কুচো চিংড়িতে ভরে থাকে। খুব মন্দ নয় বাগানটা। সূর্যমুখীর গাছে বড়বড় ফুল ফোটে। তার বিচি খেতে কী মিষ্টি, কী মিষ্টি। বড়বাহাদুরের ঠাকুরদা নাকি চীনদেশ থেকে বিচি আনিয়ে চারা তুলিয়ে ফুল ফুটিয়ে ফুলের বিচি গাওয়া-ঘি-তে ভেজে, খোদ সায়েব ম্যাজিস্ট্রেটকে খাইয়ে, সেকালে 'রায়সাহেব' খেতাব পেয়েছিলেন। এখনও বড়বাহাদুরের বৈঠকখানার রংজলা দেওয়ালে, ফ্রেমে-বাঁধানো নোনাধরা সনদটা যে কেউ দেখে আসতে পারে। তবে রুপোর ওপর নীল মিনে করা মেটেলটা কবে চুরি গেছে। কাচের আলমারিতে তার বাক্সটির নীল মখমলের ওপর মস্ত একটা তারার মত দাগ।

সে দাগ বড়বাহাদুরনি ওদের কত বার দেখিয়েছেন আর বলেছেন, 'সাগরদ্বীকে কে তোদের জম্মাতে বলেছিল রে? গাছে সব বাদুড়ঝোলা হয়ে ছিলি। ভলান্টিয়াররা ফলের মত পেড়ে এনে এখানে ফেলে দে গেছে।' কারও পাতানো মা আছে, বাপ আছে, কারও কেউ নেই। আগে ত্রাণশিবিরে ছিল, এখন ছোট-ছোট কুঁড়েঘর করে দিয়েছে সরকার, মাসে মাসে সাহায্য দেয়। রুপোদাদা স্থানীয় অধিবাসী, তাঁকেই ওদের গার্জেন করে দিয়ে গেছে। সাহায্যটাও তাঁকেই দেয়। রুপোঠানদিদি বড় ভালমানুষ।

বড়বাহাদুরনির দিনকাল মন্দ। ছেলেপুলেরা বিদেশ গেছে। কেউ খোঁজটাও করে না, কিছু পাঠায়ও না। আসলে নাকি ভারী বড়লোক ওরা। পালা করে ছেলেমেয়েগুলোকে

রুপোদাদু বড় মঞ্জিলে পাঠিয়ে দেন বুড়োমানুষ দুটোর ফাইফরমাশ খেটে দিতে। তাঁদের ওপর দাদুর বড় ভক্তি। বড়বাহাদুরনি অষ্টপ্রহর ধনদৌলতের গর্ব করেন। এই বাড়িতে আর ওঁদের নানা জায়গায় বাগানবাড়িতে বিস্তর ধনরত্ন লুকানো আছে। নাকি রাশি-রাশি হীরে জহরত আছে কালো একটা ইস্টিলের বাক্সে সিলমোহর করা। দিদিশাশুড়ির কাছে শোনা কোনো একটা গাছের গোড়ায় উৎসর্গ করা ধন সব। আসল মালিক বড়বাহাদুর আর বাহাদুরনি। সেটি পেলেই ওঁদের সব দুঃখ ঘোচে।

থেকে থেকে রুপো চক্কোত্তিকে ডেকে বলেন, 'হ্যাঁ রে, তোর লজ্জাশরম নেই? সরকার তোকে পেন্সিল দেয় অথচ বাক্স খুঁজে দেবার নামটি নেই। স্রেফ হিংসে ছাড়া আবার কী? ওরে ছেলেমেয়েরা, রুপোকে দিয়ে হবে না, ও পেটপুজো করতেই আছে। দ্যাখ না, দিনে দিনে শরীরটা কেমন চেকনাই হচ্ছে। তোদের মধ্যে যে খুঁজে দেবে তাকে দশটা টাকা দেব। বাকি দিয়ে বাড়ি সারাব, বাগান সাফ করাব, বুড়োবয়সটা পুজো-আচ্চা করে কাটাব। তোদের দিয়েই করাব। ভয় নেই। পয়সা দোব।'

রাখু সাহস করে বলল, 'তা বাক্সটা কত বড় হবে, মা? জানলে, খোঁজার সুবিধে হয়।'

বড়বাহাদুরনি নিজের হাতের বুড়ো আঙুল থেকে কড়ে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এই এত্তটা হবে মনে হয়।'

রাখু অবাক! 'ও মা, অত্তটুকু? কীই বা ধরবে ওতে?'

বাহাদুরনি চটে গেলেন। বড়বাহাদুর রাতে চোখে ভাল দেখেন না। আরামকেদারার হাতলে দিনমান পা তুলে বসে থাকেন, আর গড়গড়া টানেন। রুপোদাদু তামাক যোগান। বাহাদুরনি তাঁকে বলেন, 'হ্যাঁগো, হারানো বাক্সটা এক বিঘত-মত হবে, না? রাখু বলছে, কতটুকু বা ধরবে ওতে। আমি বলি কী হয়ত একমুঠো হীরে আছে। কোটি-কোটি টাকা তার দাম।'

নল নামিয়ে বড়বাহাদুর বললেন, 'টাকা-কড়ি, হীরে জহরত লয়গো। আছে একটা দলিল। (নস্যি নিয়ে নিয়ে তাঁর 'ন'গুলো সব 'ল' হয়ে যায়) যদ্দুর জানি উটি পেলে এখন যেখানে ঘোড়দৌড়ের মাঠ আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের সব জমিটুকুরই আমরা বংশানুক্রমে সর্বস্বত্ব পাই। ট্যাক্স ফ্রিতে। সে কি চাট্টিখানিক কথা।'

বাহাদুরনি কটমট করে রুপোদাদুর দিকে চেয়ে বললেন, 'রুপো দুবেলা অন্নধ্বংস করে, কাজকম্ম নেই। ও খুঁজে দিক। নইলে মাসমাইনে দিয়ে রাখা কেন?'

কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে নরম গলায় রুপো বললেন, 'মাসমাইনেটা অবিশ্যি গবরমেন্ট দেয়, মুন্সিপালের পেন্সিল।'

'থাকছ তো বাপু আমাদের ভিটেয়।'

রুপো বললেন, 'না গো মা, উটি আমার পৈতৃক সম্পত্তি। ক্ষয়ে ক্ষয়ে সামান্যই আছে। ছেলেরা রইল না, সম্পত্তি দিয়ে কী করব?'

বড়বাহাদুর হঠাৎ বলে বসলেন, 'না গিন্নি, তাও নয়। ওই বাগানটে একবার দেনার

দায়ে রুপোর ঠাকুরদাকে বেচে দিয়েছিলাম। তবে এই বাড়িটে আমাদের বইকী।'

গিন্নি রেগে বললেন, 'সেখানেই বা এত সময় কাটায় কেন?' রুপো কিচ্ছু বললেন না। গড়গড়াটি ভাল করে ধরিয়ে, নলটি বড়বাহাদুরের হাতে দিয়ে, উঠে পড়লেন।

বাহাদুরানি শেষ কথা বললেন, 'হতভাগারা ঠিক কথা বলে, রুপো নয় তো গুপো! তা বাপু তুমি ন্যাংচালে আমি কী কত্তে পারি? বাক্সটি খুঁজে দাও, দশ টাকা পাবে। দলিলটে একবার হাতে পেলে আর দেখতে হবে না।'

এতক্ষণ ছেলেমেয়েগুলো চাতালের ভাঙা সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসে হাঁ করে বড়দের কথা গিলছিল। এবার সবাই একসঙ্গে উঠে পড়ে বাক্স খুঁজতে চলল।

দুই

কিন্তু চলল বললেই তো আর চলা যায় না। তার বায়নাক্কা কত। প্রথমেই ছোঁক-ছোঁক করতে করতে রুপোদাদু এসে বললেন, 'তা গিন্নির কোমরে বাত, রোজ জল-ছেঁকই দেবে কে আর কন্দ শাঁকালু বুনো ট্যাড়স শামুক গুগলিই বা তুলে আনবে কে? আমাকে দিয়ে ও-সব হবে না স্পষ্ট বলে রাখছি তোদের, নাকি আমার সময় আছে, বল তোরা?' এরা তাই শুনে হেসেই কুটোপাটি। আবহমানকাল থেকে রুপোদাদুকে দেখে আসছে, তা তিনি যাবেনটা কী করে, নাকি তাঁর যাবার কোনও চুলো আছে?'

সবাই হেসেই একশা। বলে কি না, 'ওগো রুপো পায়ে গুপো, তোমার সময় নেই তো কি আমাদের আছে? তুমি এখান থেকে নড়লে বাহাদুরনির একশো একুশটা ফাইফরমাশ খাটবে কেটা শুনি?' তারপর অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে, 'হাতে হুঁকো, বগলে পুঁটলি চললেটা কোথায়?'

তাই শুনে দুবার নাক টেনে অমনি রুপো গুপো পায়ে হাঁটা দিলেন। যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে বলে গেলেন, 'আমার আর কি? তোদের যা মন চায় তাই করিস। তোদের হাতে পঙ্গু গিন্নিটাকে ছেড়ে চললাম। কর্তানির গঞ্জনা আর সয় না। বাক্স পেলাম তো ফিরে আসব। নচেৎ এই দেখা শেষ দেখা।' এই বলে জোর কদমে হাঁটা দিয়ে দেখতে দেখতে বুড়ো চোখের আড়াল হয়ে গেলেন। এরা ক'জন তাঁর যাবার পথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

ঘোর কাটলে না হেসে করে কী? 'দেখলে বুড়োর কাণ্ড! কোথাকার কে ওই বাহাদুরনি! ঠোঁট ফাঁক করলে দুধ-দই হয়, মিনি-মাগানা উদয়াস্ত খাটিয়ে নেয়! আর তারই কথায় পৈতৃক ভিটে ছেড়ে চলল! এ দিকে বাঁ ঠ্যাং তো সোজাই হয় না। থাকল পড়ে ঘরদোর, ছাগল, হাঁস, বেড়ালছানা রইল ঠানদিদি!' অমনি নিজেদের কথায় নিজেরাই আঁতকে উঠল। সে কী কথা! ভিটে ছেড়ে যে লম্বা দিল, গিন্নির তো সত্যিই কোমরে বাত, না ধরতে উঠতে পারে না। খায়ওনি হয়ত ভোর ইস্তক!

তখন ছুট ছুট ছুট, নিকনো-পুঁছনো টালির ছাদ দেওয়া খুদে বাড়ির দিকে। 'ও কী ঠানদিদি, সুয্যি প্রায় মাঝ-আকাশে, এখনও শুয়ে আছ যে? রাঁধবে না? খাবে না? আহা, আমরাও খাব না? মুখে এখনও জলটুকু পড়েনি কারও।' ঠানদিদি পাশ ফিরে শুল।

চোখদুটো ফোলা-ফোলা, লালমত, নাকে সর্দি। ভাঙা গলায় বলল, 'যা ভাগ্! আমি মুখে জলও দেব না, রাঁধবও না, হল তো? আমার শরীর খারাপ। তোরা যা। তোরা না পেন্সিলধারী? আর আট বছরের দশ বছরের ধাড়ি-ধাড়ি মেয়ে তিনটেকে এতকাল কী শেখালাম? চরে খা, করে খা।'

ওরা সব অমনি ধপাধপ বসে পড়ে বলল, 'যা বললেই তো আর যাওয়া যায় না। আমরাও রাঁধবও না, খাবও না। সকাল থেকে শুকিয়ে আছি। সক্কলের শরীর খারাপ।'' এই না বলে সটাং সবাই লম্বা হয়ে মেঝের ওপর শুয়ে প'ল।

ঠানদিদি তখন ফিক করে হেসে ফেলে বলল, 'নে, আর ঢং করতে হবে না। কে কী এনেছিস, বের করে ফ্যাল।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে রাখু পুঁটলি খুলে বলল, 'অ্যাই দ্যাকো, জামরুল এনিচি, ভেতরটা অক্তের মত নাল, কামরাঙা এনিচি নসে টসটস কচ্ছে, বড় শাঁকালু এনিচি। এবার তুমি ওঠো দিকিনি, সব ভাগ করে দাও। ও টেঁপি, কী দেখছিস কী? ঠানদিদিকে টেনে তোল।' তার আর দরকার হল না। কী জানি কোত্থেকে জোর পেয়ে গেল ঠানদিদি, নিজেই হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে পড়ে, মুখ হাত ধুয়ে, কাচা কাপড় পরে, দু'দিকে ধার দেওয়া ছুরিটে নিয়ে তক্তাপোশের ওপরই ফল কুটতে বসল। একবারটি উঠলে আর ঠানদিদিকে থামায় কে!

টিন থেকে লেড়ুয়া বিস্কুট, বোয়েম থেকে ছোট-ছোট লালচে বাতাসা বেরুল। তারপর খাওয়া-দাওয়া চুকলে, ফুটো বালতি ভাঙা শাবল নিয়ে একদল বেরিয়ে পড়ল। ততক্ষণে টেঁপি পুঁটির সঙ্গে খেন্তিও জুটেছে। তার পালাজ্বর ছেড়ে গেলেই খিদে পায়।

ঠানদিদি দু-একবার বলল, 'শাঁকালুটে অত খাসনি মা, ঢেকুর উঠবে। আর দ্যাখ, কামরাঙা খেলে ফের জ্বর হতে পারে।'

খেন্তি বলল, 'না খেলেও হতে পারে।'

তোলা উনুনে মাটি দিয়ে রোদে রেখে এল পুঁটি। খেন্তি হাঁসগুলোকে পুকুরপাড়ে ছেড়ে এল। টেঁপি বড় ছাগলিটাকে দুইতে বসল। ঘরের চালের শিমগাছ শুকিয়ে গেছে, শিমগুলো ঠনঠন করছে। খো' ছাড়াতেই লাল বিচিগুলো আলমনির থালায় ঠুনঠুন করে পড়ল।

ঠানদিদির মুখে হাসি ধরে না। 'ওরে রসুনবাটা দিয়ে কাঁচালঙ্কা দিয়ে আর ওপর থেকে একপলা কাঁচা সরষের তেল ছেড়ে দিয়ে যা হবে না, জম্মে খাসনি। আমার কালাধলা যা ভালবাসত না!'

ঠানদিদি চোখে আঁচল দিল। খেন্তি বলল, 'ওমা, কী কষ্ট! মরে গেছে বুঝি? বেড়ালছানা হবেও বা, না ঠানদি?' ঠানদিদি চলে গেল, 'বেড়ালছানা হবে কেন?'

'তবে বুঝি তোমার ছেলে ওরা?'

'বালাই ষাট! ওরা কুকুরছানা। কী মিষ্টি চেহারা ছিল গো। ঝাঁকড়া চুল, উনুনমুখো, তিরিক্ষি মেজাজ, দাঁতে কী ধার! আমাকে উঁটা চেবানো করে ছাড়ত!' ঠানদিদির চোখ

ছলছল।

মেয়েরা বলল, 'কী দুঃখু, কী দুঃখু! গোরুর গাড়ি চাপা পড়ে ম'ল বুঝি?'

ঠানদিদি কী বিরক্ত। 'মরবে কেন, কেষ্টর জীব? ওই পাজি দুটো সঙ্গে নে গেছে। নাকি ছেড়ে থাকতে পারে না।'

'কোন পাজি দুটো, ঠানদি?'

'ওই শিবু শম্ভু ছাড়া আবার কোন পাজি রে!'

মেয়েরা অবাক হল। 'তারা কে, ঠানদি?'

ঠানদিদি রাগ-রাগ গলায় বলল, 'আমার শত্তুর ছাড়া আবার কে! ভাবতে পারিস পাঁচ বচ্ছর হাওয়া!'

খেন্তি বলল, 'তারা কি আর আছে?'

ঠানদিদি গরম হয়ে বলল, 'থাকবে না-ই বা কেন? যমেও নেবে না ওদের।'

'তা কোথায় গেল?'

'কী জানি। কুকুর ছানা আর মাছ-ধরার ছিপ নিয়ে রাতারাতি অদর্শন। লিখে রেখে গেল, বড় গাঙে চলিলাম। আমাদের খোঁজ করিও না।'

মেয়েগুলো ঠানদিদির কাছে ঘেঁসে বসে বলল, 'অ্যাদ্দিন বলনি কেন?'

'কে শোনে দুঃখের কথা, দিদি। নে, ওঠ, মাটি শুকুল, আঁচ দিই।'

বড় ভাল রাধেঁ ঠানদিদি। শামুক-গুগলি-কুচো চিংড়ি দিয়ে কন্দের ঘন্ট, শিমবিচির ডাল, বড় বড় লাল চালের ভাত এইসব করবে।

পুঁটি বলল, 'রুপোদাদা কেতায় গেল বাক্স খুঁজতে? বাহাদুরনি কোনও কম্মের নয়, পানটা অবধি ছেঁচে দিতে হয়। ওর কতায় কেউ ঘর ছাড়ে?'

ঠানদিদি বলল, 'গেছেও আবার ভুলথানে। খালতলার ওনাদের সঙ্গে এঁদের তিন পুরুষ মুখ দেখাদেখি নেই। বাক্স সেখানে যাবে কোন দুঃখে?'

তিন

ঠানদিদির মুখ দেখে শিবু-শম্ভু কেন গেল জিজ্ঞেস করবার সাহস পেল না পুঁটি। কাছে এসে বলল, 'সেখানে নেই তো আর কোথায় থাকতে পারে? এই বাড়িতে?'

'হুঁ'! তোর যেমন কথা। এ বাড়ি গোরুখোঁজা করিয়েছে, সরু চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে ফেলেছে। ঠাকুরদার পেট-ব্যথার মাদুলিটে কুলুঙ্গির ফাঁক থেকে বেরিয়েছিল, কিন্তু সমস্ত বাগবাগিচা উখড়ে ফেলেও বাক্স-টাক্স কিচ্ছু পায়নি। তবে একটা ভাল হয়েছিল, সেই ফাঁকে ওই সব কন্দ কচু ট্যাড়স পুঁইয়ের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল বুড়ো। তা কী যেন বলছিলাম। যাওয়া উচিত ছিল বড় গাঙের পাড়ের কুঠিবাড়িতে। তাও শুনি ভেঙে পড়েছে। তবে আম-কাঁঠালের বাগানটি বছরে বছরে জমা দেওয়া হয়। বড়কর্তাদের তাইতেই কোনওমতে চলে।'

এই সময় ছেলেরা ফিরে এল, কথাও বন্ধ হল। কোটো রে বাটো রে কড়া চাপাও রে। কিন্তু খেতে বসে ঠানদিদির মুখে ভাতের গরাস উঠতে চায় না। শেষটা বলল, 'সে

আহাম্মুখ জলটুকু মুখে দিল না। ভাত জুটবে কোন চুলোয়?'

খেন্তি বলল, 'ছিঃ, স্বামীরা দেবতা হয়। আহাম্মুখ বলেত নেই।'

'আহাম্মুখ হলেও বলতে নেই? ওই দ্যাখ, দ্যালে, বেড়ালের নকশার নিচে লেখা— 'সদা সত্য কথা বল রে মন'।'

পুঁটি বলল, 'আহা, সে মন বললেও, তুমি কেন বলবে? ভাত খাচ্ছ না কেন? ভাতে চোখের জল পড়লে নোনতা লাগবে যে।'

বগাই তার ছেঁড়া ইজেরের কোনা দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে, গালে হামি খেয়ে বলল, 'ছি, কানে না, কানে না। কাও, কাও।' তখন হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে ভাত কটি খেয়ে নিল ঠানদিদি।

ছেলেরা আঁচিয়ে এসে বলল, 'যাইগে বুড়োটাকে খুঁজে নে আসি। কোথায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কে জানে। ঘন্টায়-ঘন্টায় কিছু না সাঁটালে তো গায়ে গতর পায় না!'

ঠানদিদি চটে গেল, 'ওমা ও কী কথা গো! চাট্টিখানি মুখে দেয় তো নয়। খাওয়ার খোঁটা দিতে হয় না বাছা। খায় আবার কোথায়, এট্টু শোঁকে। বেলা বাড়ছে, এবার পথ দ্যাখো বাছারা। দুগ্গা দুগ্গা।'

বেরিয়েই প'ল শেষটা। চেতলা বলে চেতলা। মা-কালীর মন্দির, শ্মশান-মশান সব পেছনে পড়ে রইল, রেলের লাইন ডিঙোল, তবু চলেছে তো চলেছেই। ঠিকানা যে ঠিকানা, তারও মাথামুণ্ডু নেই। ঠানদিদি বলেছিল, 'ওসব বনেদি বাড়ির কি আর ঠিকানা-মিকানা থাকে? রেলের লাইনের ওপারে, মজাদিঘির ধারে বড়বাহাদুরের থান, যাকে শুধোবে সে-ই বলে দেবে। ওনারা যেমন-তেমন লোক নন, বাছা। এখন সময় মন্দা যাচ্ছে। বাক্স ওখানে না থাকলেও, বুড়োকে ওখানেই পাওয়া উচিতই এক যদি— এক যদি— ' এই অবধি বলে ঠানদিদি শয্যা নিল।

সে যাই হোক, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। শহর শেষ হয়ে কোনকালে গাঁ শুরু হয়ে গেছে। পড়তি সব গাঁ, জনসংখ্যা নেই বললেও চলে।

মণি থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখানে নতুন পৃথিবী তৈরি হচ্ছে। পুকুর বিল মজা-নদী বুজিয়ে নতুন ডাঙা বানাচ্ছে দ্যাখ।'

লোকজন খাটছে। ইস্টিম রোলারের মত বড় বড় যন্তর। একজন ভাল মানুষকে জিজ্ঞেস করতেই শাবল নামিয়ে সে বলল, 'বড়বাহাদুরের থান তো কখনোও শুনিনি বাছা। এইখানেই জন্মালাম, বড় হলাম, মরবও বটে। তবে মুখ্যু মানুষ, নেকাপড়া শিখিনি, আছে নিশ্চয় ও জায়গা, বলছ যখন।'

তারপর 'হাফপেন' পরা একজন মোটা লোককে দেখিয়ে বলল, 'বরং ওনাকে শুধাও। উনি ওভারসিয়র, মস্ত বড় জ্ঞানীগুণী। এখন মাপের হদিস মিলছে না বলে মেজাজটা একটু বিগড়ে আছে, তবে ওনার অজানা কিচ্ছু নেই। ওই হিসেবটি ছাড়া। তোমাদের একজনা সেটি মিলিয়ে দাও তো উনিও বাঁচেন, আমরাও বাঁচি, তোমরা গন্তব্যস্থল পেয়ে যাও। কিছু মনে কোরো না, কিন্তু আমার ভগ্নীপোত বীরভূমের মানুষ কিনা, তাই

আমাদের একটু বিশুদ্ধ বাংলা বলতে হয়। তা ওনার কাছে গিয়েই দ্যাখো না। লোক খারাপ নন।'

ওভারসিয়ার সব শুনে বললেন, 'দ্যাখো, একটা জটিল সমস্যায় পড়ে গেছি। এই জমিটা সমান দু'ভাগ হবে। অথচ এ-দিকটা সরু লম্বা, ও-দিকটা মোটা বেঁটে। তা কেমন করে হতে পারে বল দেখি।'

তাই শুনে বগাই-সুদ্ধ সবাই চ্যাঁচাতে লাগল, 'কই দেখি দেখি, সরু লম্বা মোটা বেঁটেরে নকশা দেখি!'

টানাটানিতে কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। তার মাঝখান থেকে একটা চার ভাঁজ করা বড় নীল পুরু কাগজ ছিটকে প'ল। ওভারসিয়ার লাফিয়ে উঠলেন, 'পেয়েছি! পেয়েছি! নকশাটা করাই আছে। থ্যাংকু, থ্যাংকু। একশো বছর পরমাই হোক তোদের। এবার বল, কী জানতে চাইছিলি। এই ঢিপিটার ওপর আরাম করে বস সবাই। আর ওই সামনে ফোকলা ধেড়ে ছেলেটাকে কাঁধে নিয়েছিস কেন? দেখে তো মনে হচ্ছে বিচ্ছু!'

বগাই বলল, 'বিচ্ছু না, বগাই। দাঁত পড়ে গেছে।'

নকশা পেয়ে ওভারসিয়ার মহা খুশি, 'অ্যাঁ বগাই বুঝি? আহা মরে যাই। সবাই চিনেবাদাম খা রে, বাপ।'

খবরের কাগজ দিয়ে পানের খিলির মত বানিয়ে তাতে চিনেবাদাম ভরে বাদামওয়ালি সবার হাতে একটা করে দিল।

তারপর সব শুনে ওভারসিয়ার বললেন, 'বলিস কী রে, সেই আকবরের আমলের বড়বাহাদুরের বাগানবাড়ি? সে তো যাট বছর আগেই খসে ধসে মাঠ হয়ে গেছে। তাতে কতবার ফসল তুলেছে লোকে। কড়ি, বরগা, খুদে-খুদে ইঁট যার খুশি তুলে নে গেছে। এইসব অধিগ্রহণ করা জমির মধ্যে সে জমিও পড়েছে। মালিকরা মোটা ক্ষতিপূরণ পাবেন, সুখে থাকবেন। তাঁদের নাম-ঠিকানা দিয়ে যেও। দলিল দস্তাবেজ আছে নিশ্চয়। তা তোমরা আরও কিছু খুঁজছিলে নাকি?' কালো বাক্সের কথা শুনে ওভারসিয়ার রোমাঞ্চিত। তিনি ডিটেকটিভ বই পড়েন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে তিনি বললেন, 'গুপ্তধনের ব্যাপার নাকি? কত বড় বাক্স? গোল, না লম্বাটে?'

মণি বলল, 'শুনেছি এক বিঘতমত চৌকো।'

'হীরে দিয়ে ঠাসা নাকি? অমন বাক্সের আমি স্বপ্ন দেখি গো! আচ্ছা, ওপরে কি ড্রাগন আঁকা আছে?'

মণি হকচকিয়ে গেল, 'ড্রাগন আঁকা কিনা জানি না, তবে হীরে নেই। নাকি একটা মূল্যবান দলিল আছে ওতে। আমার রুপোদাদু সেটা খুঁজতে বেরিয়েছেন, তা মুখে জলটুকু পর্যন্ত দেননি, তাই আমরা তাঁকে খুঁজছি।'

'আমার লোকজনরা দেখতে পেলে জানাবে এখন, কিচ্ছু চিন্তা কোর না। আচ্ছা, দলিলটাই বা কম কী? অবিভক্ত বাংলার সর্বস্বত্বের দলিল নাকি?'

মণি ঘাবড়ে গেল, 'কী জানি, কাকাবাবু, তবে শুনেছি উটি পেলে বড়বাহাদুর

ঘোড়দৌড়ের মাঠের মালিক হবেন।'

'বাঃ! বাঃ! তোমরাই বা কম যাও কীসে। ওটি পাওয়া গেলে, এই গরিব বন্ধুকে ভুলে যেও না কিন্তু। দ্যাখো, ওই জমিদুটোর কোনা দিয়ে একটা তিনকোনা চিলতে বেরুচ্ছে, সেটা কারও কোনও কাজে লাগবে না। ওইটি আমাকে পাইয়ে দিতে হবে, ভাই। আমিও বাক্স পেলে অমনি পৌঁছে দিয়ে আসব, কেমন? চেতলা, কালীঘাট সব আমার চেনা। আচ্ছা এখন একটু চা দিয়ে গলা ভিজিয়ে বেলা আরও বাড়ার আগে বাড়ি ফিরে যেও, কেমন দেখি, নাম-ঠিকানা লিখে রাখি আমাদের মালের খালি নৌকো তোমাদের কালীঘাটে নামিয়ে দেবে।'

ওরা বাড়ি ফিরে দেখে ঠানদিদি সন্ধ্যা দেবার যোগাড় করছে।

চার

সে রাতে ঠানদিদি সবার জন্য ছাতু মেখেছিল, সে ছাতুমাখা যে খায়নি তার মানবজন্মই বৃথা। ঠানদিদি বলল, 'মিছিমিছি এত কষ্ট পেলি। সে যে ও-বাড়িতে যায়নি, তা তো আমিই বলে দিতে পারতাম। তখন ভাবলাম ছেলেরা জায়গাটা একবার দেখে আসুক, কী বাড়ি, কী বাগান!'

ফণী বলল, 'বাড়িও নেই, বাগানও নেই, পুকুর বিল সবসুদ্ধ স্রেফ অদর্শন। তা ওখানে বাক্স থাকবে না কে বলল?'

ঠানদিদি বললেন, 'দলিল করেছিলেন বড়বাহাদুরের ঠাকুরদা সত্তর বছর আগে। তার আগেই ঝগড়াঝাঁটি হয়ে ওই দুই পরিবারের ছাড়াছাড়ি। ও জায়গাটি ছোট শরিকের ভাগ। এঁরা হলেন বড় শরিক।'

মণি বলল, 'মনে করে দ্যাখো আর কোথায় থাকতে পারে। বেরিয়েছি যখন তখন একটা এসপার-ওসপার না করে ছাড়ছিনে। মেয়েরা কোথায়?'

ঠানদিদি হাসল, 'কোথায় আবার? মানুষজন নেই, বাহাদুরনি কেঁদেকেটে নটে ঝাড়ুদারের বউকে পাঠিয়েছিল। কর্তা বড্ড চোটপাট কচ্ছে, গিন্নি নাকি রুপো চক্কোত্তির চাকরি খেয়ে দেবে। তা যেমন চাকরি, খাবেও তেমনি। একবার গিয়ে ভাতটে রেঁধে দিয়ে এসেছি। মেয়েগুলো আলবোলা ধরাচ্ছে, ঘরে ঘরে ধুনো দিচ্ছে। ঝাঁট পড়েনি, ঝুলঝাড়া হয়নি, দরজা-জানলা খোলাও না, বন্ধও না। ভেবেও দুঃখু লাগে। তোরা যা, টিপকলে গা ধুয়ে আয়, বেগুনপোড়া দিয়ে হাতরুটি করেছি আর নলেন গুড় দিয়ে আস্কেপিঠে। আছে অবিশ্যি আরেকটা জায়গা। কাল সকালে বলবখন। বুড়োর কপালে যা আছে তাই হবে।'

রাতে যে যার কুঁড়ঘরে শুতে গেল। ভোরে উঠে রাখু বলল, 'বড়গাঙের পাড়ির ওপর কোথায় যেন যাবার কথা বলেছিলে ঠানদি? কী তার নাম, কোথায় তার থান? কে থাকে সেথা?'

ঠানদিদির চক্ষু চড়কগাছ, 'ওমা! সেখানে যাবি কী রে! সে যে সোঁদরবনের মুখের ওপর! সেথা গঙ্গার এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। সমুদ্দুরের হাওয়া লেগে কলকল

তরতর করে স্রোত বয়ে যায়। তিনকোনা পাখনা তুলে হাঙর আসে। আর যখন উজান ঠেলে জোয়ার আসে পাড়ের গাছ ভেঙে নিয়ে যায়। না দেখলে বিশ্বাস হয় না। স্বপ্নরাজ্যের সঙ্গে কোনও তফাত নেই। সেইখানে উঁচু পাড়ির ওপর যেখানে গঙ্গা নাগাল পায় না, চৌধুরিদের চোদ্দ পুরুষের ভিটে। বোম্বেটেদের সঙ্গে বখরা করে তারা অঢেল জমিজমা করেছিল। নদীর এপার ওপার শেকল বেঁধে সদাগরদের জাহাজ আটকাত। সে একদিন গেছে। আম-কাঁঠালের বাগান ছিল ; বাগান তো নয় বন। গোমস্তা চিঁড়েমুড়ি গামছায় বেঁধে তদারকিতে বেরুত। অত পাপ সয় না, বাছা। তার মধ্যে এখন বাকি আছে বড় জোর আটদশ বিঘে বাগিচা। কেউ কোনও কাজকম্ম করবে না, খালি বসে বসে খাবে! খুরখুর করে অমন রাজ্যপাট কপ্পুর হয়ে গেল।' জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে ঠানদিদি থামল।

ওরা বলল, 'বলো, বলো, আরও বলো।'

রাখু বলল, 'বানিয়ে বলছ না তো ঠানদি? বাড়ি থেকে এক পা নড়ো না, অত জানলে কী করে?'

'ওমা, আমি জানবনি? ওখানকার হাওয়া-মাটি দিয়ে যে আমার হাড়-মজ্জা তৈরি। অমন জায়গা আর কই রে। মাছ কচ্ছপগুলো পর্যন্ত অন্যরকম দেখতে,' এই বলে চমকে উঠে ঠানদিদি বলল, 'চল্লিশ বছর অদেখা রে, আছে কি নেই, তাও জানিনে। তবে সেখানেই গেছে নিচ্চয়। আমবাগানটে আছে। বুড়ো গোমস্তা ফলগাছ জমা দেয়, অদ্ধেক টাকা পাঠায়, অদ্ধেক রাখে। তাইতেই এনাদের চলে। আমার বাপের ভিটেও তারই লাগোয়া। বিয়ের সময় তোদের রুপেদাদু আদর পায়নি, তাই জন্মে আর যায়নি, আমিও যাইনি। কী আছে কী নেই জানিনে। তবে বড়বাহাদুরের ঠাকুরদার দলিল ওখানে থাকাও বিচিত্র নয়।'

মণি বলল, 'বোধহয় লোহার সিন্দুকে বন্ধ আছে, দামি জিনিস তো, চাবিটে কার কাছে ঠানদি?'

ঠানদিদি বলল, 'দূর বোকা। লোহার সিন্দুক ভাঙতে কতক্ষণ? থাকলে, নিরামিষ ঘরের উনুনের ওপরের কুলুঙ্গিতে, গুচ্ছের ঠিকুজি পাঁজির সঙ্গে মিলেমিশে আছে। আমি হলে তাই রাখতাম। নিতান্তই যদি যাস্ তো হাতড়ে দেখিস।'

ফণী বলল, 'ঠিকানা বললে না?'

'ওমা! গ্রামগঞ্জের আবার ঠিকানা হয় নাকি? পোস্টাপিস নামখানা দিলেই চিঠি যায়। তোরাও তাই গেলেই সুবিধে হবে।'

নৌকোতে যাওয়াই ভাল। হাঁটা পথে নানা বিপদ। বাঘের ভয় তো থাকতেই পারে, আজকাল নাকি আবার বাঘেরও চাষ হচ্ছে, সংখ্যা বাড়ছে। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ওদিককার গ্রামবাসীদের বদমেজাজি পোষা ছাগলি। যাকে দেখে তাকেই নাকি তাড়া করে দেশছাড়া করে। এ-সব শোনা গেল সুধনের কাছে। তার ভাই বুধন মাঝিগিরি করে। একেবারে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সুধনের খাঁটি সরিষার তৈল ঘানি থেকে পড়বামাত্র চালান যায়। কী

তার তেজ! বুধন বলল একবার নাকি ঝড় উঠে নদী টালমাটাল হল। চারদিকে বদর বদর ডাক আর কান্নার রোল উঠল। সুধন তখন পিপের মুখ খুলে সব তেল গঙ্গায় ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ শান্ত হল, সকলের প্রাণ বাঁচল। সেই অসমসাহসিক কাজের জন্য সুধনকে নাকি সরকার থেকে পদ্মছিরি দিতে চেয়েছিল। সুধন হাত জোড় করে বলেছিল, 'দয়া করে ওইটে বাদ দিন, স্যার পদ্মের গন্ধে আমার গিন্নির হাঁপনিটে চাগিয়ে ওঠে।'

যে যাক গে, মোট কথা, এখন ঝড়-ঝাপ্টার সময়ও নয়, তা ছাড়া খোলের মধ্যে না নামলেই হল ; সেখানে তেল জবজব করছে। ওপরের পাটাতনে তিরপল বিছিয়ে, বুধন ছেলেদের আদর করে বসাল। ঠানদিদিদের গাঁয়ের লোক ওরা, ভারী মান্যি করে। মেয়েদেরও নৌকা চাপার শক। নিজেদের ঠ্যাং দুটো আর মাঝে-মধ্যে করিমচাচার গোরুর গাড়ি ছাড়া কিচ্ছুতে চড়েনি ওরা।

মণি-ফণী বুঝিয়ে বলল, 'তাই চল তোমরা আর বুড়িঠানদি না খেয়ে মরে থাকুক। তুলে না দিলে তো উঠতে পারে না। আমাদের ফিরতে একদিনও হতে পারে, আবার এক বছরও হতে পারে। এসব বিপজ্জনক কাজ মেয়েদের কম্মও নয়। তা ছাড়া বুড়োটার এতক্ষণে সাঙঘাতিক কিছু হয়ে থাকলে—' এই বলে গামছায় চিঁড়ে-মোয়া বেঁধে নিয়ে ছেলেরা রওনা দিল।

যাবার মুখে রাখু আবার বলল, 'মেয়েরা রাঁধবে বাড়বে, কাচবে কুচবে, ঘর নিকোবে, বাসন মাজবে, দলিল খোঁজা, রত্ন পাওয়া তাদের জন্যে নয়।'

এই বলে খালের ঘাটে নৌকো চেপে ছেলেরা রওনা হয়ে গেল। খাল থেকে ছোট গঙ্গায়, তারপর ক্রমে বড়গাঙের দিকে বুধনের নৌকো কেবলই দখিনমুখো পাড়ি দিল। ছেলেরা একদৃষ্টে দুই তীর দেখতে দেখতে চলল। খালি বগাই গুটিসুটি হয়ে মণির কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে কাদা।

বুধন বড় ভাল লোক, একটা পয়সা নেয়নি। খালি চিঁড়ে-মোয়ার ভাগ আর দরকার হলে দাঁড়ে হাত। ভারী গোপ্পে বুধন। বলল, নাকি অমাবস্যার রাতে সব ডুবোজাহাজ ভেসে উঠে এগুবার পথ বন্ধ করে। এ-ওর নিজের চোখে দেখা তখন তীরের কাছে নৌকো নোঙর করে চোখ বুজে বসে থাকতে হয়। তা ছাড়া ওদের সকলের কোমরে রুদ্রাক্ষের মাদুলি বাঁধা থাকে, তাই মেলেচ্ছ অশরীরীরা কিচ্ছু করতে সাহস পায় না।

পাঁচ

রাখু বধনকে নমো করে বলল, 'তুমি বোধহয় অনেক লেখাপড়া জানো, না খুড়ো? তাই ভয় পাও না।'

বুধন তখন হাতে বাঁধা আরেকটা কালো বিচি দেখিয়ে বলল, 'যত বিদ্যে তত ভয়। আমি নিজের নামটেও লিখতে জানিনে বাপ। তবে এই বিচিটে হল পীরের মন্তর দিয়ে বাঁধা। পীরের কথায় আছে, যতক্ষণ এতে বিশ্বাস রাখবে, সময়-অসময়ে এ তোমাকে সব বিপদ থেকে বাঁচাবে। বিশ্বাস হারালেই বিচি নির্গুণ হয়ে যাবে। বড় ভারী গুণধর

পীর আমার।' এই বলে আকাশের দিকে চেয়ে কাকে যেন নমো করল বুধন। দেখাদেখি ওরাও তাই করল। খুশি হয়ে বুধন বলল, 'আসল কথা ভগমান করল তো হল, আর না করল তো কারও বাপের সাধ্যি নেই যে করায়।'

এক সময় বাঁ দিকের পাড়ি নিচু হয়ে এল। খানিকটা ভাঙা পাথরের ঘাটের মত দেখা দিল। সেইখানে লোহার খুঁটিতে নৌকো বেঁধে বুধন বলল, 'এখেনে তোমাদের নামতে হবে। ওই দ্যাখো, পোস্টাপিসের পথ। সেখানে বড়বাহাদুরের গোমস্তার খবর কর। তার নাম হল গিয়ে অম্বিকা মল্লিক। সবাই চেনে, ভাল লোক। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলো। কাল ভোরে জোয়ারের মাথায় ফিরব আমি। তোমাদের তুলে নিয়ে যেতে ঠানদিদি বলে দেছেন।'

ওদের এ-ওর মুখের দিকে চাইতে দেখে বুধন বলল, 'কোনও ভয় নেই। রুপোদাদা দেবতার মত মানুষ, তার কোনও অনিষ্ট হতে পারে না। দোষের মধ্যে খায় বড্ড বেশি। ওইটে তার ছাড়তে হবে। আচ্ছা, পীরের মাদুলিটে কাছে রাখবে নাকি? সাহস পাবে।'

মণি-ফণী বলল, 'না খুড়ো, এমনিতেই সাহস পাচ্ছি।'

বাঁক ঘুরে নৌকো অদৃশ্য হলে ঘাটটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হল। এই নির্বান্ধবপুরে রুপোদাদার কী হল কে জানে। এমন সময় তিন বাঁকা খেজুর গাছে বসে ছোট্ট একটা হলুদ পাখি বলে উঠল, 'কে ও? কে ও? এসো, এসো, এসো!' বলে ফুড়ত করে উড়ে গেল আর ওদেরও মন ভাল হয়ে গেল। খালি বগাই নাকি-সুরে বায়না ধরল, 'কেউ খাঁবার দিচ্ছে না, জঁল দিঁচ্ছে না!'

ওপর থেকে তির তির করে ছোট্ট এক ঝরনা নেমে এসেছে। তারই জলে হাত-মুখ ধুয়ে, সবাই চাঁটি করে মুড়ি-মোয়া খেয়ে পাড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। বগাই অত পথ পাড়েটাড়ে না, সে বাঁদর-ছানার মত মণির গলায় ঝুলে রইল। তবে পিঠের দিকে ; পেটের দিকে নয়। চারদিকেব দৃশ্য দেখতে দেখতে উঠে এল ওরা। একটা লোক গাছের গোড়ায় ব্যাঙের ছাতা কুড়োচ্ছিল, তাকে পোস্টাপিসের পথ জিজ্ঞেস করতে যাবে, সে বলল, 'রোসো, এসব জিনিস নাক-চোখ দিয়ে পরখ করে নিতে হয়। বিষাক্ত হলে খেলেই অক্কা। তবে গড়াইকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। আমি হলাম গিয়ে গড়াই।' তারপর একটা চটের থলিতে ব্যাঙের ছাতা ভরতে ভরতে বলল, 'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে?'

রাখু বলল, 'বলিনি, তবে এখন বলছি। পোস্টাপিসটা কোথায়?'

লোকটা বলল, 'অ মল্লিকের খোঁজে এসেছ বুঝি? বিদেশি মুখ দেখেই টের পেইছি। তা সেথা গিয়েই বা কী করবে? সে লোকটা কি আর এতক্ষণ আছে?'

মণি-ফণী ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কোন দিকে? কোন্ দিকে?'

আমগাছের পেছন দিয়ে লাল টালির ছাদ দেখা যাচ্ছে দেখে মন কেমন করে। তা গিয়ে দেখে তার দোর বন্ধ, ভেতরে সাড়াশব্দ নেই। বুকটা টিপ-টিপ করে উঠল। দমাদ্দম দরজা পিটিয়ে, ভাঙা গলায় রাখু চ্যাঁচাতে লাগল, 'ও পোস্টমাস্টারমশাই, বড়বাহাদুরের কুঠিবাড়িটে কোন দিকে বলে দিন। বড় বিপদ।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা হাট করে খুলে, খোঁচা দাড়ি ফরসা মোটা বেঁটে আধাবয়সী কে যে তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এসে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'শ্-শ্-শ্ চুপ: লোকটা বাঁচে কি মরে তার ঠিক কী, আর তোরা এমনি হল্লা কচ্ছিস, অ্যাঁ! পেরানে মায়া-দয়া কিচ্ছু নেই?'

হাট করা দোরের ফাঁক দিয়ে ওরা চেয়ে দেখে, হা ঠাকুর, রুপোদাদা হাত-পা এলিয়ে উপুড় হয়ে কাঠের মেঝের ওপর আছাড়িপিছাড়ি করছে আর বলছে, 'হেই বাবা! ফিরে এসো! ফিরে এসো! আমাদের ঢের শিক্ষে হয়েছে! এমন কাজ আর করব না!'

কাণ্ড দেখে মণি ফণী রাখু বগাই তাজ্জব বনে গেল। তারপর তাদের হিড়হিড় করে টেনে তুলে বলল, 'ঢং রাখো, খুড়োরা। নইলে তোমাদের পাঁচমণি দেহের চাপেই তো ওর প্রাণ বেরুবে।'

সহজে কি ওঠে তারা, 'ওরে ছাড়, হতভাগারা! বুড়ো বাপের জন্যে চাট্টি শোক করতেও দিবিনে নাকি? কী রকম পিচাশ রে তোরা, অ্যাঁ।'

মণি চটে গেল, 'ন্যাকামো ছাড়ো, খুড়ো। জ্যান্ত মানুষটার জন্যে শোক না করে মুখে এট্টু চা জলখাবার দিলেই কেমন চাঙা হয়ে ওঠে দ্যাখো। ঘড়ি ঘড়ি না খেলে ওনার যে দুব্বল দুব্বল লাগে। যা সন্দ কচ্ছি, তাই যদি ঠিক হয় তবে এটুকু তো তোমাদের জানা উচিত ছিল। কালা ধলা কই?' নিজেদের নাম শুনে কারা যেন পোস্টাপিসের লম্বা বেঞ্চির তলা থেকে কুঁই কুঁই করে সাড়া দিল।

ততক্ষণে পোস্টমাস্টারমশাই অনেকটা সামলে নিয়ে ডাক দিলেন, 'হরবিলাস। একটা বড় চা আর মিঠে জলখাবার।'

অমনি একটা ন্যাড়ামাথা লোক বড কাপে চা আর শালপাতায় মুড়ে দুটো ফুলকো কচুরি, আর দু-চামচ মোহনভোগ নিয়ে এল। নাকে তার গন্ধ যেতেই রুপোদাদাও উঠে বসলেন। 'কঁই রে, দে দে, মুখে চাঁট্টি না গুঁজলে প্রাণ যায়!' তারপর সেই দাড়িমুখো হোঁতকা লোকদুটোর মুখের দিকে তাকিয়ে 'ওরে আমার বাছা রে!' বলেই আবার মুচ্ছো! পোস্টমাস্টার এমনি চমকে গেলেন যে নিজেই চা জলখাবারটে খেয়ে-টেয়ে একাকার কাণ্ড করলেন।

হোঁতকারা মণি-ফণীর মুখ দেখে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'ভয় নেই, ভয় নেই, আপিসের গায়ে লাগা চায়ের দোকানই বলো হোটেলই বলো আর রেস্টুরেণ্টই বলো।' তারপর খাবার এলে রুপোদাদুর নাকের সামনে ঠোঙা ধরতেই দাদু উঠে কাপটা হাতে নিলেন। এদের দিয়ে বিশ্বাস কি?

তখন বগাই কেঁদে বলল, 'অত খেও না। আমায় এট্টু দাও।'

হোঁতকা লোকদুটো অমনি উঠে পড়ে হাঁক পাড়তে লাগল, 'সকলের জন্য চা জলখাবার, ও হরবিলাস!'

বগাই বলল, 'উপোদাদুকে মেরেছ? কানচে কেন?'

ওরা বলল, 'ওরে না রে, আমরা ওনার ছেলে, ওই আমাদের কলো ধলো।' বলতে

বলতে বেঞ্চির তলা থেকে দুটো ছোট ছোট পাহাড়ি কুকুর বেরিয়ে এসে রুপোদাদুকে চেটে-ফেটে একাকার করল।

পোস্টমাস্টার বললেন, 'দুঃখ করবেন না, দাদা। ওদের স্বভাব বদলে গেছে। এ ডাকঘরটাকে ওরাই ঠেকিয়ে রেখেছে। আমি পেন্সিল নিয়েছি। বাড়িটাও ওদের, মাস মাস পঞ্চাশ টাকা ভাড়া পায়।'

রুপোদাদা গুপো ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে বললেন, 'ওদেরই বটে।' তখন শিবু শম্ভু বেঞ্চির তলা থেকে ছোট একটা কালো বাক্স বের করতেই, মণি-ফণী-রাখু বগাই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চ্যাঁচাতে লাগল, 'পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে! দলিলের বাক্স পাওয়া গেছে!'

পোস্টমাস্টার মাথা চুলকে বললেন, 'না গো, দাদা, কিচ্ছু ছেল না ওতে। ভাঙা ঢাকনি অবস্থায় ভাঙা সিন্দুকে পড়ে ছেল। বিশ বছর ডাকঘর করছি, তাই দেখে আসছি। পাঁচ বছর আগে এরা এসে সারিয়ে নিয়েছে। খুলেই দ্যাখো না খুড়ো।'

বাক্স খুলে রুপোদাদু দেখে অবাক হলেন, পঞ্চাশ টাকার নোটে ঠাসা। পাঁচ বছরের বাড়িভাড়া জমা রেখেছে ছেলেরা, বাপকে দেবে বলে।

ছয়

রুপোদাদু তখন নাক টেনে চোখ মুছে ওই দাড়িমুখ হোঁতকা লোকদুটোকে কাছে টেনে তাদের গালে চকচক করে দুটো হামি খেয়ে দিলেন। মণি-ফণীরা দেখে একেবারে থ'! গলা খাঁকরে দাদু বলল, 'হয় এ বাক্স নয়। আর যদি এই বাক্সই হয়, তবে দলিল খোয়া গেছে।'

রাখু বলল, 'এতো ইস্টিলের বাক্স নয়, দাদু। এ যে সিরেফ জাপানি টিনের ক্যাশবাক্স। এর জোড়াটা ঠানদির কাছে আছে। দলিলের সে অন্যরকম বাক্স। তাকে খুঁজে বের করতে হবে। কুঠিবাড়িটে কোথায় খুড়ো? তার রান্নাঘরের উঁচু কুলুঙ্গিতে দেখতে হবে।'

তখন অম্বিকে মল্লিক পোস্টমাস্টার বুক চাপড়ে বলল, 'সে কি আর আছে যে খুঁজবি তোরা? চল্লিশ বছর হল বড় ভূমিকম্পে সে মাটি নিয়েছে। আমিই বাহাদুরের গোমস্তা, দাদাবাবু। দুঃখের কথা আর কী বলব, শুধু আমগাছ জমানির টাকায় কি কারও চলে? তাই বিশ বছর ধরে ডাকঘরও চালিয়েছি। আর পারিনে, বয়স হয়েছে। তাই এরাই সব করে দেয়। ওদের নিয়োগপত্রও হয়ে গেছে। ওদের কাছেই থাকি খাই। আর সত্যি কথা বলতে গেলে আমি ওদের আপন মামা। তোমাদের বিয়ের দিন চড়ায় নৌকো আটকে ছিল, তাই পৌঁছতে পারিনি, নয়তো সেদিন অনাদর পেয়ে তোমাকে ফিরতে হত না। আমি তোমার ছোট শ্যালা। তোমার নাম শুনে তখনি চিনেছি।' এই বলে অম্বিকেও মিছিমিছি খানিকটা কেঁদেকেটে নিল। এত কান্নাকাটি মণি-ফণী জন্মে দেখেনি।

এই সব করতে করতে সুয্যি পাটে নামল, দিন কাবার হল। গাঁয়ের বাড়িতে শাঁক বাজল। তখন অম্বিকে মল্লিকে উঠে পড়ে, পাম্পু করা ইস্টোভে খিচুড়ি চাপাল। ওদের ডেকে বলল, 'ওরে তোরা তফাতে থাক, মনের আনন্দে কী করতে কী করছি তার ঠিক

নেই। ইস্টোভ ফেটেফুটে যেতে পারে। তোরা বরং টিপকলে গা ধুয়ে ফ্যাল। আমাদের তালপুকুরে ডুব দিয়ে কাজ নেই। শুনেছি রাতে সেথা মকর ভেসে ওঠে। আমি নিজে দেখিনি বটে, তবে বিশ্বস্ত লোকের কাছে শুনেছি।'

এই সব বলছে অম্বিকে আর চটপট হাঁড়ি চাপিয়ে, তেল চড়িয়ে, তেলে তেজপাতা-গরমমশলা ছেড়ে চালডাল কষতে লেগেছে। তার সুগন্ধে চারদিক ম-ম করছে। খিচুড়িতে আলু-পেঁয়াজ কচি কুমড়োর ফালি ছাড়া হল। হরবিলাস এক ভাঁড় গাওয়া-ঘি নিয়ে এল। তার পরে লাল চিনি ছড়ানো এক পরাত এই পুরু দুধের সর, তাতে চাঁদের পাহাড়ের মত গোল-গোল টোল খাওয়া। শিবু-শম্ভু মেঝে মুছে, কলকাদাতা কেটে এনে খাবার জায়গা করল। হরবিলাস বলল, 'নড়ায়ের সময় সায়েবরা এখানে ক্যাম্পু করেছিল। রোজ রাতে তারা জন্মদিন করত আর গান গাইত। আজ অম্বিকেদাদার জন্মদিন মনে করে আমিও সে গান গাইছি শোনো,' এই বলে গলা ছেড়ে গান ধরল, 'অ্যাপি বার্থডে টু ইউ।' সে বড় ভাল গান, যে শুনেছে তারই মন ভাল হয়েছে। সব যেন কেমন স্বপ্ন দেখা মনগড়া পরীদের গল্পের মত মনে হচ্ছিল। গান শেষ হবার অনেক আগেই বগাই ঘুমিয়ে কাদা। তারপর গাঁয়ের হরিসভা থেকে ধূপধুনো আর কুকুরের গায়ের গন্ধ লাগা মস্ত এক শতরঞ্চি এনে যে যার শুয়ে ঘুম।

কাকভোরে উঠে বুধনের ফিরতি নৌকোয় চেপে সোজা কালীঘাট। মাল খালাস করে খোলে খোয়া বোঝাই করে নৌকো ফিরছিল। তলা বেশি হালকা হলে নৌকো উলটোবার ভয় থাকে। তা এদের সবাইকে ভাঙা ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুধনের স্ফূর্তি দেখে কে, তার ওপর হরবিলাস সবাইকে টিপিন দিল। দিনের আলায় সব অন্যরকম লাগছিল। অম্বিকেমামাকে, শিবু-শম্ভুকে পাওয়া গেছে, তাই মনভরা খুশি থাকলেও ইস্টিলের বাক্সটির হদিস মিলল না বলে সবাই হতাশ! শনি-রবি দু'দিন হরবিলাস ডাকঘর আগলাবে, তায় শনিবার নববর্ষের ছুটিও বটে। এর মধ্যে বাক্সটি খুঁজে বের করতেই হবে। নিশ্চয় চেতলার বাড়িতেই আছে।

সবাইকে ধরে গেল নৌকোয়। চুল আঁচড়ে দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে সাফ জামা-পাজামা পরে শিবু-শম্ভুর ভোল বদলে গেছে। কারও মুখে রা কাড়ছে না। রুপোদাদু খালি থেকে থেকে ছেলেদুটোর গায়ে হাত বুলুচ্ছেন আর বলছেন, 'তা হলে স্বপ্ন নয়, সত্যি এইছিস?' আবার নিজের কড়ে আঙুল কামড়ে দেখেছেন সত্যি কিনা। মাঝে-মাঝে অম্বিকেমামাকে বলছেন, 'অ্যাঁ, তুই সত্যি শ্যালা নাকি রে? কত লোককে কত সময় রাগ করে এমনি বলেছি। তুই যে সত্যি আছিস জানিওনি।'

মণি-ফণী বলল, 'এতজনকে দেখে ঠানদি মুচ্ছো যাবে।' কালীঘাট পেরিয়ে এক আঘাটায় নেমে প'ল ওরা। যখন পৌঁছল, তখন বেলা পড়ে এসেছে। গাছের ছায়া লম্বা হয়েছে। দূর থেকে দলবল দেখে মেয়েগুলো বাহাদুরনির কাজ সেরে ফেরার পথে হৈচৈ লাগিয়ে দিল। কাঁথা সেলাই নামিয়ে রেখে ঠানদিদিও বেরিয়ে এল। ওদের দেখে মুখে কথা সরে না। সবাই পিছু হটে গেছে, মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে অম্বিকেমামা, শিবু আর

শম্ভু। ঠানদিদি দেখছে তো দেখছেই। তারপর দুই হাত মেলে দিয়ে বলল, 'আয়, ঝড়ের পাখিরা, আমার বুকে আয়।' অমনি ওই ধাড়ি তিনটে মানুষ খুদে ঠানদিদির ছোট্ট বুকে যে যার জায়গা করে নিল। তখন কী আনন্দ, কী আনন্দ!

শেষে মণি বলল, 'তা না হয় হল। আসল কাজের কী ব্যবস্থা হবে?'

রাখু বলল, 'ওরে টেঁপি পুঁটি খেন্তি, রুপোদাদুর ইস্টিলের বাক্সের খোঁজ পেলি?'

টেঁপি বলল, 'খোঁজ ঠিক পাইনি, তবে বড়বাহাদুরে বাহাদুরনিতে কী ঝগড়া, কী ঝগড়া। কর্তা বলল, রুপো যদি গয়া পায় তবে সে তোমার দোষে! তখন গয়নার খালি পেটি থেকে বাহাদুরনি, এই চিঠি বের করে দিল।' এই বলে কোঁচড় থেকে টেঁপি এক হলদে হয়ে যাওয়া, ধারে ধারে আরশুলোতে চেবানো চিঠি বের করে ঠানদিদির হতে দিল, 'বড়বাহাদুর বলছেন, যার জিনিস তাকেই দেওয়া গেল। এরপর কেউ যেন কোনও কথা না বলে।'

ঠানদিদি এমনি চোখে কম দেখে, তার ওপর যুক্তাক্ষর দেখলে ভয় খায়। সঙ্গে-সঙ্গে চিঠিটে সে রুপোদাদুর হাতে তুলে দিল। দাদু পাটিতে শুয়ে আরাম করছিলেন, উঠে বসে চিঠিটে দুই হাত দূরে ধরে যা পড়লেন, তার মানেটা এইরকম দাঁড়াচ্ছে।

বড়বাহাদুরের ঠাকুরদা সূর্যনারায়ণ লিখছেন তাঁর একমাত্র ছেলে বড়বাহাদুরের বাবা চন্দ্রনারায়ণকে, তুমি পায়রা উড়াইয়া আর ঘোড়দৌড় করাইয়া আমাকে পথে বসাইয়াছ। আজ তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করিলাম। যাকে যাহা দিবার বিধিমতে দলিল করিয়া নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখিতেছি। আমার হাতের নাগালের মধ্যেই রহিল, গৃহদেবতার নামে উৎসর্গ করা স্থানে। গুপ্ত জায়গার ইঙ্গিত উকিল জগদানন্দ সরকার জানেন। তোমাকে দিয়া বিশ্বাস নাই। মোট কথা তুমি কিছু আশা করিও না। ইত্যাদি।

চিঠি পড়ে সবাই হাঁ। এর পরেও বড়বাহাদুরনি ঘোড়দৌড়ের মাঠের আশা রাখেন কী বলে? সে যাই হোকগে ইস্টিলের চৌকো বাক্সটার মধ্যেকার দলিলে যাই লেখা থাকুক, সেটি খুঁজে বের করা দরকার। কে পাচ্ছে না জানা গেলেও, যতদিন না কে পাচ্ছে জানা যাচ্ছে আর তাকে সে জিনিস দেওয়া যাচ্ছে, ততদিন কর্তব্যপালন হচ্ছে না।

অম্বিকামামা একবার বললেন, 'কিন্তু এসব করছে কে বা কারা?'

তাই শুনে টেঁপি পুঁটি খেন্তি মণি-ফণী রাখু বলল, 'কেন আমরা।' বগাই বলল, 'আমুও।'

ঠানদিদি কতকগুলো পুরনো বালিশ বের করে বলল, 'তোরা সব আজকের মত এখানেই শুয়ে পড়। কালকের কথা কালকে হবে। এর মধ্যে তোদের পাতানো মা-বাবার পাটনা বদলি হয়ে যাচ্ছে বলে গবরমেন্ট চিঠি দিয়েছে। তাই সকলের এখানেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।' তাই শুনে সবাই খুশি।

সাত

রাতে খুব হাওয়া দিল। বৃষ্টি হল সামান্যই, কিন্তু গাছের ডালপালায় বেজায় নাড়া

দিল। কয়েকটা প্যাঁচার ভারী অসুবিধা হল, কারণ মেঠো ইঁদুররা বাসায় সেঁদুল। তা ছাড়া কিছু কাকের বাসাও উড়ে গেল। ভাল ঘুম হল না কারও, এক বগাই বাদে। কারও ভয়ে, কারও দুশ্চিন্তায়।

ভোরে উঠে মেয়েরা গেল শাঁকালু, জামরুল, তরমুজ তুলতে ও বাকিরা বসল মিটিং করতে। এ বাড়ি ও বাড়ি তো বহুবার গোরু-খোঁজা করা হয়েছে। থাকলে, বাক্স বাইরে আছে। এমন সময়ে উঠি-পড়ি করে খেন্তি ছুটে এসে খবর দিল, 'মজাপুকুরের কিনারার তে-বাঁকা বুড়ো আমগাছ, যার গোড়ায় শেকড় উঁচু হয়ে থাকে আর সেখানে ব্যাঙের ছাতা, শামুক ঝিনুকের রাজ্যি বসেছে, সে-গাছ মাটিতে মাথা রেখে শুয়ে আছে। মগডালের খানিকটা মটকে গিয়ে পাশে পড়ে আছে। মটকাবার জায়গার ঠিক তলায় এক কোটর। তার মধ্যে থেকে মস্ত এক গোখ্‌রো সাপ আস্তে-আস্তে মাথা দোলাচ্ছে আর কিলবিল করে তাকাচ্ছে। তোমরা দেখবে তো এসো।'

আর কি কেউ চাতালে বসে থাকে। হুড়হুড় দুদ্দুড় করে ছুটল সবাই মজাপুকুরের ধারে। এমনকি গুজব শুনে বড়বাহাদুর বড়বাহাদুরনি মাটিতে যাঁদের পা পড়েনি কত বচ্ছর, তাঁরাও এসে হাজির হলেন। কিন্তু এত লোকের ভিড় দেখে হকচকিয়ে গিয়ে তফাতে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মণি ফণী রাখু হৈ-চৈ করে উঠল, 'ওই যে কোটর, ওই দেখা যায় কোটর! ওরই মধ্যিখানে বাক্স লুকানো আছে।' এই গাছই সেই উচ্ছগ্ন করা আমগাছ। এর আম মালিকরা খেতেন না, দেবতাকে দিয়ে গরিব দুঃখীকে বিলিয়ে দিতেন।

বগাই বলল, 'আমিও সেই গরিব-দুখী। আমাকেও দাও।'

শেকড়ের কাছ থেকে খচমচ করে গুঁড়ি বেয়ে উঠে কোটরের নাগাল পাওয়া যায়। রুপোদাদু বললেন, 'সামাল! সামাল! কোটরের মাথার দিকটা ভেঙে পড়েছে, সেখান দিয়ে সাপের মাথা দেখতে পাচ্ছি। ইদিক-উদিক তাকাচ্ছে দ্যাখো। গায়ের রঙের কী বাহার! ফোঁসফোঁসানি এখান থেকে শুনতে পাচ্ছি। কাছে গেলেই সর্ব্বনাশ হবে'

তখন ঠানদিদি হঠাৎ এগিয়ে এল, 'উনি যে আমার বড় চেনা রে। কাউকে কিছু বলবেন না। উনি আমাদের বাস্তুসাপ। গায়ের নকশাগুলো কেমন জোড়া-জোড়া দেখছিসনে, তাই ওঁর নাম জোড়ামণি। আমার ঠাকুমা রোজ নিজের হাতে ওনাকে এক বাটি দুধ দিতেন। যা তো মা খেন্তি, নিয়ে আয়, নিয়ে আয়।'

তীরের মত ছুটে গেল খেন্তি। পুজোর ঘর থেকে পাথরের বাটি-ভরা দুধ এনে ঠানদিদিকে দিল। ঠানদিদি দুধটে কোটরের নিচে মাটির ওপর রেখে, নমো করে বলল, 'এসো বাবা জোড়ামণি, দুধ খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা কর।'

সঙ্গে-সঙ্গে ফোঁসফোঁসানি বন্ধ হল, আস্তে-আস্তে সেই আট হাত লম্বা সাপটি গাছ বেয়ে নেমে এসে, চুকচুক করে সব দুধটি খেয়ে, এঁকে-বেঁকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে গাছ থেকে অনেক দূরে, যেখানে পুরনো ইঁটের গাদায় বড় বড় গাছ জন্মে উপবন হয়েছিল, তারই ফাটলে ঢুকে গেল।

সবাই একসঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঠানদিদির মুখের দিকে তাকাল ঠানদিদি চোখ মুছে বলল, 'ওনার পাহারাদারি শেষ হল, উনি চলে গেলেন। তোরা এবার বাখারি দিয়ে কোটরটি সাফ করে দ্যাখগে ওর মধ্যে হয়তো বাক্স পাবি। ওরে, শিবু-শম্ভু, সাহস থাকে তো গাছ বেয়ে ওঠ। এমন-এমনি হাত ঢুকুসনি বাপ। যদি কাঁকড়াবিছে থাকে।'

শিবু-শম্ভু এ-ওর দিকে তাকাল। ঠানদিদি বলল, 'হোকগে কুসংস্কার, গাছ বেয়ে ওঠ দিকিনি। এ গাছ যখন উৎসর্গ হয় তখন কোটর ছিল দেড়-মানুষ উঁচুতে, হাতের নাগালের মধ্যে। এত দিনে গাছও বেড়েছে, কোটরও উঠে গেছে। নে, গাছে চড়। বলা যায় না, ওনাদের কোন আত্মীয়-কুটুম্বকে কী দিয়ে গেছেন, তারা না পেলে আমাদের পাপ হবে।'

কোটর থেকে কিছু শুকনো পাতা ছাড়া কিছু বেরুল্ল না। তারপর ঠুক করে বাখারিটে কীসে ঠেকল। হাত ঢুকিয়ে শিবু বের করে আনল একটা ইস্টিলের চৌকো বাক্স। তার ঢাকনিটা এত্তটুকু হুড়কো দিয়ে বন্ধ করা। তাড়াতাড়ি নেমে এসে সেটি ঠানদিদির হাতে দিতেই ভেতর থেকে বেরুল একটা হলদে হয়ে যাওয়া দলিল আর একটা এই বড় নকশাকাটা সবুজ পাথর বসানো সিলমোহরের আংটি। দলিলটে ঠানদিদি বড়বাহাদুরের হাতে দিল, তিনি খুলে সবাইকে পড়ে শোনালেন। ঠাকুরদা ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। সে তার মায়ের সম্পত্তি ছাড়া কিচ্ছু পাবে না। সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ সূর্যনারায়ণের একমাত্র কন্যা সৌদামিনীসুন্দরীর একমাত্র সন্তান শতদলবাসিনী ও তার উত্তরাধিকারীগণ। বিধিমতে সাক্ষী-সাবুদ-সহ সই করা দলিল।

তারপর একবার চোখ পাকিয়ে বাহাদুরনির হাঁড়িমুখের পানে তাকিয়ে, আরও বলেন, 'কোথাও কোনও খুঁত নেই এতে, কারো ট্যাঁফুঁ করার সাধ্যি নেই। একটাই শুধু বলবার আছে আমার। সম্পত্তিটে সবখানিই কালের কবলে পড়ে কপ্পুরের মত উপে গেছে। বাকি আছে শুধু ওই মরকতের সিলমোহরের আংটিটে। কেউ উটির নাগাল পায়নি তাই আছে। তা ওর দাম যে-কোনও পাকা জহুরি পাঁচ-সাত লাখ কি তারও বেশি টাকা দেবে। ওরে খেঁদি, আমার একমাত্র পিসিমা সৌদামিনীর একমাত্র সন্তানের ওয়ারিশ হলি তুই আর ওই অম্বিকে। তোদের আমি যথেষ্ট হেনস্তা করেছি। তোকে মিনিমাগনা দাসীর মত খাটিয়েছি আর রুপোর সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যাভার করেছি, অম্বিকের মুখের দিকে ফিরেও তাকাইনি, সেরেস্তার কেরানির অধম করে রেখেছি—'

এইখানে বাধা দিয়ে টেঁপি বলল, 'হ্যাঁ, বচ্ছরের পর বচ্ছর এক পয়সা মাইনেও দাওনি, বাপু।'

অম্বিকে বলল, 'চোপ!'

বড়বাহাদুর তখন নরম গলায় বললেন, 'খেঁদি রে আমার সব অপরাধ ক্ষমা দে। আর তোদের জ্বালাব না। ছেলেমেয়েরা এদ্দিন পরে মাসোয়ারা দেওয়া ঠিক করেছে, তাই আমরা কাশীবাসী হব। তোরা ওই আংটি বেচে ভাইবোনে সেই টাকায় সুখে থাকিস। অনেক জ্বালিয়েছি, সব ভুলে যা।'

তখন অম্বিকের মুখেও কথা ফুটল, 'ও সব নিয়ে কিছু মন খারাপ করবেন না, মানা। ছোটবেলা ইস্তক এতই হেনস্তা করেছেন যে তাই-ই আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন আর আমরা কিছু আশাও করিনে, মনেও করিনে।'

বাহাদুরনি বললেন, 'তা হলে ছেলেমেয়েগুলো আমাদের সঙ্গে কাশী চলুক না। সেখানে শুনেছি টাকাকড়ি না দিলে কাজের লোক মেলে না।

ঠানদিদি চটে গেল, 'আমি থাকতে তা হচ্ছে না। গবরমেণ্ট এই সব জায়গা অধিগ্রহণ করেছেন নোটিস এয়েছে। যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। তা ছাড়া ছেলেদুটোর চাকরিবাকরি হয়েছে। অম্বিকে বড়গাঙের পুকুরে মাছের চাষ করছে। তার আপত্তি না থাকলে ওই আংটি বেচার টাকা দিয়ে নামখানার কাছে সূর্যনারায়ণ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবে। সেখানে এইসব ছেলেমেয়েগুলোও পড়বে। নইলে একেবারে বাঁদর হয়ে যাচ্ছে।' তাই শুনে ছেলেমেয়েরা 'অ্যাঁ অ্যাঁ' বলে বসে পড়ল।

ঠানদিদি বললেন, 'ওইখানেই এখন থেকে গঙ্গার উঁচু পাড়িতে বাস কার হবে।'

রুপোদাদুর বিয়েতে বড়বাহাদুরের বাবা কোনও যৌতুক দেননি বলে বড়গাঙের আমবাগান বড় বাহাদুর তাঁকে দানপত্র করে দিয়ে মনের শান্তিতে কাশীবাসী হলেন এরাও মাঝে-মধ্যে সেখানে গিয়ে কচৌরি, প্যাঁড়া আর মালাই খেয়ে আসে। এইখানে আমার গল্প ফুরোল, নটেগাছটি মুড়োল।

অশ্বমেধ কথা

শিবরাম চক্রবর্তী

ভালো আপদ হয়েছে ঘোড়াটাকে নিয়ে। পঞ্চানন কী করবে কিছুই স্থির করতে পারে না। কলিযুগ হয়ে অবধি অশ্বমেধের রেওয়াজ নেই, তা নইলে হয়ত সে একটা অশ্বমেধ যজ্ঞই করে বসত। কথাবার্তা নেই, একটা কৃষ্ণের জীবকে তো অধর্ম করে মারা যায় না অমনি। তাই পঞ্চানন ভেবে রেখেছে সুবিদা পেলেই একবার ভট্টপল্লীর দিকে যাবে— মা কালীর কাছে অশ্ববলি দেওয়া যায় কিনা তার বিধান ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করবে।

মনে মনে সে আলোচনা করেছে, কেনই বা না দেওয়া যাবে? পাঁঠা যখন দেওয়া যায়— অশ্ব তো পশুর মধ্যেই গণ্য? পাঁঠাও একটা পশু ছাড়া আর কি? পাঁঠার চারটে পা ঘোড়ারও তাই,— সব দিকেই মিল আছে, যা কিছু তফাৎ তা কেবল ল্যাজের আর আওয়াজের। তা শাস্ত্রেই যখন রয়েছে মধবাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, তখন— পাঁঠাভাবে ঘোড়াং দদ্যাতের বিধানও কি আর শাস্ত্রে নেই। নিশ্চয়ই আছে।

এককালে ঘোড়াটা অবশ্যি খুবই কাজ দিয়েছিল, কিন্তু বুড়ো হয়ে অব্দি আজকাল কোনো কাজে লাগা দূরে থাক, তার পেছনে লেগে থাকাই একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো বয়সে ভারি পেটুক হয়েছে ঘোড়াটা। জামার হাতা, নতুন ছাতা, খবরের কাগজ, ছেলেদের পুঁথিপত্তর, দরকারী চিঠি, কখন কী খায় স্থির নেই। সেদিন তো কাশ্মিরী শালের আধখানাই সাবড়ে দিলো। তাছাড়া রান্নাঘরে দিকেও নজর আছে বেশ।

এদিকে পঞ্চাননের সঙ্গে তার দস্তুরমতো প্রতিযোগিতা। রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ কিম্বা বেগুনভাজার গন্ধ এলে কার সাধ্য তাকে থামায়? পাড়াগাঁয়ের মেটে বাড়ী পঞ্চাননের— ধানের গোলাগুলো ঘুরে উঠোন পেরিয়ে গেলেই রান্নাঘর— মুহূর্তের মধ্যে অশ্ববরকে সেখানে উপস্থিত দেখা যাবে। পঞ্চাননের গিন্নীর কি পরিত্রাণ আছে ওকে বেগুনভাজা না দিয়ে? বেগুনভাজার প্রতি পঞ্চাননের দারুণ লোভ, অথচ এই ঘোড়াটার জন্যেই পেট ভরে বেগুন-ভাজা খেতে পায় না।

সেদিন পঞ্চানন-গিন্নী বেগুন না ভেজে, ঘোড়াটাকে ঠকাবার মতলবেই, বেসন দিয়ে বেগুনী ভাজছিলেন। গন্ধ পেয়েই ঘোড়াটা সেইখানে হাজির। দু-একবার সে গিন্নীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে— চিঁহিঁচিঁহিঁ।

সংস্কৃত ভাষায় তার মানে হচ্ছে— দেহি দেহি।

কিন্তু গিন্নী কর্ণপাত না করায় সে নাসিকার সাহায্যে গিন্নীকে কাত করে ঝুড়িভরা সমস্ত বেগুনী আত্মসাৎ করে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে সুরু করে দিয়েছে। সেদিন থেকে ঘোড়াটার প্রতি পঞ্চাননের আর চিত্ত নেই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে সে— ভাটপাড়া যাবেই।

গিন্নীকে সে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, ফের যদি তুমি ঘোড়াটাকে অমনি করে আস্কারা

দাও, তাহলে ওরই একদিন কি আমারই একদিন। সত্যি বলছি, একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে। ওকে খুন করে যদি ফাঁসি যেতে হয় সেওভি আচ্ছা।

ঘোড়াটা কিন্তু গ্রাহ্য করে না পঞ্চাননকে। সুবোধ বালকের মত সব খায়।

তারপরের দিনই সে কলকাতা থেকে সদ্য-আনানো পঞ্চাননের টর্চবাতিটা মুখের মধ্যে পুরেছিল, কিন্তু ভালো করে চিবিয়ে যখন টের পেল যে ওটা ঠিক বেগুনী নয় তখন বিরক্ত হয়ে ফেলে দিল।

টর্চ লাইটটার অবস্থা দেখে পঞ্চানন ত রেগে টং! সে ছুটে গিয়ে ঘোড়টার কান ধরে গালে এক চড় বসিয়ে দিল— হতভাগা, তোর কি একটুও বুদ্ধি নেই? তুই যে একটা গাধারও অধম হলি!

সত্যি, টর্চ লাইটের এমন টর্চার ভাবাও যায় না। ঘোড়া মুখ সরিয়ে নিয়ে জবাব দিয়েছে— চি হি হি! অর্থাৎ— যা বলো তুমি!

পঞ্চানন যখন মাথা ঘামাচ্ছে, এই হঠকারিতার জন্যে কী সাজা ওকে দেওয়া যায়, তখন ওর ছোট ছেলে বটকৃষ্ণ এসে পরামর্শ দিল, — বাবা, ওর লেজ কেটে দাও, তাহলে আর মশা তাড়াতে পারবে না। ঘুমোতে পাবে না। জব্দ হবে খুব।

পঞ্চানন কাঁচি নিয়ে উদ্যোগ-আয়োজন করছে। মেয়ে রাধারাণী ছুটে এসে বলল, বাবা করছো কি! মশার কামড়ে তাহলে ও আমাদের মশারীর মধ্যে এসে ঢুকবে যে!

বাধা হয়ে পঞ্চানন কাঁচি থামিয়েছে, হ্যাঁ, সে একটা ভাবনার কথা বটে। ঘোড়াটার যে রকম বুদ্ধি-শুদ্ধি আর যেরূপ কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, তাতে ওর পক্ষে সবই সম্ভব। মশারির মধ্যে ঢোকা কি, ওদের পাশে শুয়ে পড়াও কিছু কঠিন না ওর পক্ষে।— সটাং চিং পটাং।

এমনই সমস্যার মুহূর্তে জ্যোতিষ বোস এসে উপস্থিত।

"কিহে পঞ্চানন, কী হচ্ছে? হাতে কাঁচি কেন?"

"এস ভাই, এই ট্রেন করছি ঘোড়াটাকে।"

"তুমি হর্স-ট্রেনার হলে আবার কবে থেকে হে?"

পঞ্চানন মাথা নেড়ে বলে— আর ভাই, শিক্ষা না দিলে নিজের ছেলেই গাধা হয়ে যায়, তা ঘোড়া তো পরের ছেলে।

"তা বেশ। কিন্তু তোমার দেনার কথাটা একেবারে ভুলে গেছে। আমাদের পাড়াই মাড়াওনা আর। দুবছর থেকে দেখা নেই— ব্যাপার কি?"

পঞ্চানন আকশ থেকে পড়ল— কিসের দেনা?

"সেই যে একদিন বাজারে নিলে। বছর দুই আগে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, চার আনা পয়সা। পদ্মার ইলিশ এসেছিল হাটে, পয়সা কম পড়ল, তোমার কাছে নিলুম বটে। মনে ছিল না ভাই।"

জ্যোতিষ বোস ছেলেবেলা থেকেই বেশ হিসেবী, একথা পঞ্চানন জানত। কিন্তু বুড়োবয়সে সে যে এতবেশি হিসেবী হয়ে উঠবে যে চার আনা পয়সার কথা দু বছর ধরে

মনে করে রেখে ভিন্ গাঁ থেকে তিন মাইল হেঁটে তাই চাইতে আসবে, পঞ্চানন তা ভাবতে পারেনি। বাবা পাঁচশো টাকা রেখে গেছল, সুদে খাটিয়ে তেজারতি কারবারে সেই টাকা পঞ্চাশ হাজারে সে দাঁড় করিয়েছে— কিন্তু সামান্য চার আনার মায়া সে ছাড়তে পারেনি ভেবে পঞ্চানন বেশ অবাক হোলো।

'তা ভাই পঞ্চানন, প্রায় আড়াই বছর হোলো তোমার ধার নেওয়া। আমার খাতায় সমস্ত হিসাব লেখা আছে, নিজে গিয়ে দেখতে পারো একদিন। এইবার একটু গা করে ওটা দিয়ে দাও।"

"কী যে বলো তুমি! সামান্য চার আনা পয়সার জন্য আমি অস্বীকার করব? তা তুমি কষ্ট করে এতদূর এসে আমাকে লজ্জা দিলে! রাধু, তোর মার কাছ থেকে চার আনা পয়সা চেয়ে আন তো। আর বল গে তোর জ্যোতিষ কাকার জন্যে বেগুনী ভাজতে। বেগুনী দিয়ে আচারের তেল মেখে মুড়ি খেতে বেশ হে! তার সঙ্গে কাঁচালঙ্কা!"

জ্যোতিষ বোস বাধা দিয়ে বলল— "সে হবেখন! খাওয়া তো আর পালাচ্ছে না। কিন্তু একটা ভুল করছ তুমি, আড়াই বছর পরে পয়সাটা তো আর চার আনা নেই ভাই।

কিছু বুঝতে পা পেরে পঞ্চানন বলল— "চার আনা নেই কি রকম? তার মানে?"

"আহা, বুঝতে পারছ না! সুদে আসলে তো পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে দাঁড়িয়েছে। পৌনে তিন পাই দেওয়া একটু শক্ত হবে তোমার পক্ষে, তা পাবে কোথায়! তুমি পাঁচ টাকা এগারো আনাই দাও না হয় আমায়।"

"য়্যাঁ?" পঞ্চাননের মুখ দিয়ে আর কথা সরল না। পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাই! পৌনে তিন পাই দেওয়া তার পক্ষে শক্ত নিশ্চয়ই— কিন্তু পাঁচ টাকা এগারো আনাটা দেওয়াই যে তার পক্ষে এমন কি সহজ তা সে ভেবে পেল না।

পঞ্চানন ভেবে কিনারা পায় না। হ্যাঁ, জ্যোতিষটা ছেলেবেলা থেকেই খুব হিসেবী, একথা তার অজানা নয়, কিন্তু তার হিসেবিতা যে বয়সের সঙ্গে এতটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে তা কে জানত? নাঃ, জব্দ করতে হবে ওকে।

কাষ্ঠহাসি হেসে পঞ্চানন জবাব দেয়— "তা নেবেই না হয় পাঁচ টাকা এগারো আনা। তোমাকে দিলে তো আর জলে পড়বে না। বোসো, জিরোও, গল্প করো। অনেক দিন পরে দেখা।"

"হ্যাঁ, বসব বই কি! বেগুনীও খাব! কাঁচালঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেতে মন্দ হয় না— কিন্তু কচি শশা আছে তো?"

পঞ্চানন মনে মনে মতলব এঁটে বলে— এতটা রোদে তিন ক্রোশ দূর থেকে হেঁটে এসেছ, এই বয়সে এতটা পরিশ্রম কি ভালো তোমার পক্ষে? একটা ঘোড়া রাখো না কেন হে? ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে হাঁটার পরিশ্রম হয় না, তাছাড়া রাইডিং একটা ভালো ব্যায়ামও বটে। দেখছ না, আমিও একটা ঘোড়া রেখেছি।

জ্যোতিষ পঞ্চাননের ঘোড়ার দিকে কটাক্ষপাত করে জবাব দেয়— বেশ ঘোড়াটি তোমার। দেখে লোভ হয়। আমিও অনেকদিন থেকে ভাবছি কথাটা। সত্যিই, এ বয়সে

আর হাঁটা-চলা পোষায় না! কিন্তু মনের মত ঘোড়া পাই কোথায়?

'কিরকম মনের মত শুনি?'

'এই ধরো খুব তেজী হবে না, আস্তে আস্তে হাঁটবে। এই বুড়ো বয়সে যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই, তাহলে কি হাড়-গোড় আর আস্ত থাকবে?'

'তা সেরকম ঘোড়া কি আর পাওয়া যায়? কিনে শিখিয়ে নিতে হয়। এই আমার ঘোড়াটাই কি কম তেজী ছিল, অনেক কষ্টে ওকে শিক্ষিত করেছি। এখন যদি ওর পিঠে তুমি চাপো, তাহলে ও হাঁটছে বলে তোমার মনেই হবে না। এমন শান্ত, এত বিনয়ী, এরূপ নম্রস্বভাব— মানে, সুশিক্ষার যা কিছু সদ্‌গুণ, সব আছে এই ঘোড়াটার।'

'তা ভাই, তোমার ঘোড়াটির মত অমন উচ্চশিক্ষিত ঘোড়া পাই কোথায়? আমি ত আর তোমার মত ট্রেনার নই। তোমার ঘোড়াটি কতয় কিনেছিলে?'

'দাঁওয়ে পেয়েছিলাম ভাই, মাত্তর পনের টাকায়।'

'তা তুমি এক কাজ কর না, পঞ্চানন। পনেরো টাকায় ঘোড়াটা আমায় দাও। তোমার এগারো আনা পৌনে তিন পাই লাভ থাকল, তাছাড়া এতদিন চড়েও নিয়েছ। এই ধরো, একটা দশ টাকার নোট।'

'না ভাই, ঘোড়াটা শিক্ষিত যে।'

'আবার নতুন ঘোড়া সস্তায় কিনে শিখিয়ে নিতে পারবে— তোমার যখন ট্রেন করার ক্যাপাসিটি আছে।'

পঞ্চানন তবুও তেমন গা করে না। ঘোড়ার আজকাল চড়া দাম।

'ছেলেবেলার বন্ধুর কাছে বেশি লাভ নাই করলে। এই নোটখানা নাও, তোমার বাকি ধারও শোধ হয় গেল— তা নইলে ভেবে দ্যাখো, পৌনে তিন পাই যোগাড় করা তোমার পক্ষে খুব শক্ত হোতো নাকি?'

পঞ্চানন হাসি চেপে আম্‌তা আম্‌তা করে বলে— তা তুমি যখন এত করে বলছো, ছেলেবেলার বন্ধুর একটা কথা রাখলাম নাহয়। বেশ, নাও তুমি ঘোড়াটা।

'ভালোই হোলো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়েছে থানায়, যাচ্ছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। মনে করলুম পথে ত তোমার বাড়ী পড়বে, দেখা করে নিয়ে যাই টাকাটা। তা ভালোই করেছি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে হেঁটে গেলে কি ভালো দেখাতে হে?'

জ্যোতিষ বোস ঘোড়ায় চেপে থানার দিকে রওনা দিলেন। সত্যি, এমন শিক্ষিত আর শান্ত ঘোড়া দেখা যায় না প্রায়। পঞ্চানন যা বলেছিল, অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। হাঁটছে বলে মনেই হয় না। অনেক তাড়াহুড়ো দিলে এক পা হাঁটে।

এদিকে পঞ্চাননও খুসী। নিঃশ্বাস ফেলে বলে— বাঁচা গেল এতদিনে। আপদ বিদায়, সঙ্গে সঙ্গে থোক লাভ নগদ। অশ্বমেধ করতে যাচ্ছিলুম, তা জ্যোতিষ বোসকে দেওয়াও যা, অশ্বমেধ করাও তা। নইলে পৌনে তিন পাই জোগাড় করা খুব শক্ত হোতো আমার।

কেবল গিন্নী একটু দুঃখিত। তিনি মত প্রকাশ করেছেন— খেতে পেত না বেচারা, তাই অমন ছোঁ ছোঁ করত। ঘোড়ার দানা খায়, ছোলা খায়, কত কী খায়— সে সব ও

চোখেও দেখেনি কখনও। চপ খাবে, বেগুনী খেতে চাইবে তা ওর দোষ কি। কথায় বলে পেটের জ্বালায় মানুষ ঘাস খায়।

পঞ্চানন বলল— তাহলে ঘোড়াটার ভাগ্য বলতে হবে। জ্যোতিষরা বড়লোক, সুখে থাকবে ওদের বাড়ী। আমরা গরীব মানুষ, নিজেদেরই দানা পাইনে, কোথায় পাব ঘোড়ার দানা!

হেঁটে গেলে যতক্ষণে থানায় পৌঁছানো যেত, তার পাঁচ গুণ সময় লাগলো জ্যোতিষ বোসের ঘোড়ায় চড়ে যেতে। কিন্তু জ্যোতিষ ভারি খুসী। এতখানি রাস্তা তিনি অশ্বারোহণে এসেছেন, কিন্তু একবারও পড়ে যাননি, কেবল ওঠার আর নামার সময় যা একটু বেগ পেতে হয়েছে। ওঠার সময় টুলে দাঁড়িয়ে চেপেছিলেন। কিন্তু নামবার সময় তিনি অনেক চেষ্টা করলেন যাতে ঘোড়াটা হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ে আব তাঁর পক্ষে নামাটা সহজ হয় কিন্তু ঘোড়াটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, একটু কাৎ হোলো না পর্যন্ত। তাঁর আশা ছিল শিক্ষি' ঘোড়া আর কিছু না হোক অন্ততঃ নম্র হতে শিখেছে। নিশ্চয় তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবে, কিন্তু ঘোড়াটা না বুঝল তার ইঙ্গিত, না দিল কান তাঁর সাধ্য সাধনায়। বাধ্য হয়ে তাঁকে অনেকটা প্রাণের মায়া ছেড়েই লাফিয়ে নামতে হোলো, কিন্তু সুখের বিষয় তাঁর হাড়গোড় ভাঙেনি— একটুও তিনি জখম্ হন নি। চড়াই উৎড়াই দুই তাঁর নির্বিঘ্নে হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে জ্যোতিষ বোসের আগে থেকেই খাতির ছিল। জ্যোতিষ সেলাম ঠুকতেই তিনি হ্যালো মিষ্টার বোস বলে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে খানা পাঠিয়ে দেবার হুকুম হোলো আর্দালির ওপর।

ম্যাজিস্ট্রেট আর জ্যোতিষ বোস আলাপ করছেন এমন সময় আস্তাবল থেকে বিরাট এক আওয়াজ এল— চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

কী ব্যাপার? ম্যাজিস্ট্রেট এবং জ্যোতিষ দুজনেই চম্‌কে উঠলেন। ঘোড়ার আওয়াজ বটে, কিন্তু এ রকম আওয়াজ তাঁরা জীবনে কখনও শোনেনি। কোনো ঘোড়ার মুখ থেকে নয়। এমন কি, যে ডার্বি জিতেছে, সেও এহেন উচ্চনিনাদ করে না। দুজনেই আস্তাবলের দিকে ছুটলেন। সেখানে তখন অনেক লোক জড়ো হয়েছে। আর ঘোড়াটা কেবলই করছে— চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

কি করে ওর অট্টহাস্য থামানো যায় সবাই সেই ভাবনায় পড়ল। ঘোড়ার হাসি— তা থামানো কি সহজ ব্যাপার? কিন্তু বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে হোলো না কাউকেই।

হাসতে হাসতে মারা গেল ঘোড়াটা।

রাজার মন ভাল নেই

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

রাজার মন আর কিছুতেই ভাল হচ্ছে না। মন ভাল করতে লোকেরা কম মেহনত করেনি। রাজাকে গান শোনানো হয়েছে নাচ দেখানো হয়েছে, বিদূষক এসে হাজার রকমের ভাঁড়ামি করেছে, যাত্রা, নাটক, মেলা-মচ্ছব, যাগ-যজ্ঞ, পুজো-পাঠ সব হল। পুবের রাজ্য থেকে আনারস, উত্তরে হিমরাজ্য থেকে আপেল, পশ্চিম থেকে আখরোট, আঙুর, পেস্তা বাদাম, দেশ-বিদেশ থেকে ক্ষীর আর ছানার মিষ্টি এনে খাওয়ানো হয়েছে। এখন সাহেব আর চীনে রসুইকররা দু'বেলা হরেক খাবার বানাচ্ছে। রাজা দেখছেন, শুনছেন, খাচ্ছেন, কিন্তু তবু ঘণ্টায় ঘণ্টায় বুক কাঁপিয়ে হুংকারে এক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। 'না হে, মনটা ভাল নেই।"

রাজবৈদ্য এসে সারাদিন বসে নাড়ি টিপে চোখ বুজে থাকেন। নাড়ি কখনও কখনও তেজি, কখনও মোটা, কখনও সরু। রাজবৈদ্য আপনমনে হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ করেন, তারপর শতেক রকম শেকড়-বাকড় খানা বেটে ওষুধ তৈরি করে শতেক অনুপান দিয়ে রাজাকে খাওয়ান। রাজা খেয়ে যান। তারপর হুড়াস করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়। "না হে, মনটা ভাল নেই।"

রাজার মন ভাল করতে রাজপুত্তর আর সেনাপতিরা আশেপাশের গোটা দশেক রাজ্য জয় করে হেরো রাজাগুলোকে বন্দী করে নিয়ে এল। রাজা তাকিয়ে দেখলেন। তারপরই অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা। 'মনটা বড় খারাপ রে।"

তখন মন্ত্রীমশাই রাজার তীর্থযাত্রা আর দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন। লোকলস্কর পাইক-পেয়াদা নিয়ে রাজা শ'দেড়েক তীর্থ আর দেশ-দেশান্তর ঘুরে এসে হাতমুখ ধুয়ে সিংহাসনে বসেই বললেন, "হায় হায়। মনটা একদম ভাল নেই।"

ওদিকে ভাঁড়ামি করে রাজার বিদূষক হেদিয়ে পড়ার চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। রাজনর্তকীর পায়ে বাত। সভাগায়কের গলা বসে গেছে। বাদ্যকরদের হাতে ব্যথা। রসুইকররা ছুটি চাইছে। রাজ-বৈদ্যকে ধরেছে ভীমরতি। সেনাপতি সন্ন্যাস নিয়েছেন। মন্ত্রী মশাইয়ের মাথার একটু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে বলে তাঁর স্ত্রী সন্দেহ করছেন। রাজ-পুরোহিত হোম-যজ্ঞে এত ঘি পুড়িয়েছেন যে এখন ঘিয়ের গন্ধ নাকে গেলে তাঁর মূর্ছা হয়। প্রজাদের মধ্যে কিছু অরাজকতা দেখা যাচ্ছে। সভাপণ্ডিতরা রাজার মন খারাপের কারণ নিয়ে দিনরাত গবেষণা করছেন। রাজজ্যোতিষী রাজার জন্মকুণ্ডলী বিচার করতে করতে, আঁক কষে কষে দিস্তা-দিস্তা কাগজ ভরিয়ে ফেলছেন।

একদিন বিকেলে রাজা মুখখানা শুকনো করে রাজবাড়ির বিশাল ফুল-বাগিচায় বসে আছেন। চারিদিকে হাজারো রকমের ফুলের বন্যা রঙে-গন্ধে ছয়লাপ। মৌমাছি গুনগুন করছে, পাখিরা মধুর স্বরে ডাকছে। সামনের বিশাল সুন্দর দিঘিতে মৃদুমন্দ বাতাসে ঢেউ খেলছে, রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে।

রাজা চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ সিংহগর্জনে বলে উঠলেন, "গর্দান চাই।"

মন্ত্রী পাশেই ছিলেন, আপনমনে বিড়বিড় করছিলিন, মাথা খারাপের লক্ষণ। রাজার হুংকারে চমকে উঠে বললেন, "কার গর্দান মহারাজ?"

রাজা লজ্জা পেয়ে বললেন, "দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি। হঠাৎ মনে হল কার যেন গর্দান নেওয়ার দরকার।"

মন্ত্রী বললেন, "ভাবুন মহারাজ, আর একটু কষে ভাবুন। মনে পড়লেই গর্দান এনে হাজির করব।"

বহুকালের মধ্যেও রাজা কিছুই মুখ ফুটে চাননি। হঠাৎ এই গর্দান চাওয়ার মন্ত্রীর আশা হল, এবার রাজার মনমতো একটা গর্দান দিলে বোধহয় মন ভাল হবে। রাজ্যে গর্দান খুবই সহজলভ্য।

পরদিন সকালে রাজসভায় কাজ শেষ হওয়ার পর রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, "না হে গর্দান চাই না। অন্য কী একটা যেন চেয়েছিলাম, এখন আর মনে পড়ছে না।"

বিকেলবেলা রাজা প্রাসাদের বিশাল ছাদে পায়চারি করছিলেন। সঙ্গে রাজকীয় কুকুর, তাম্বুলদার, হুকাদার, মন্ত্রী। পায়চারি করতে করতে রাজা হঠাৎ নদীর ওপারর গ্রামের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "বুড়ির ঘরে আগুন দে। দে আগুন বুড়ির ঘরে।"

মন্ত্রীর বিড়বিড় করা থেমে গেল। রাজার সমুখে দাঁড়িয়ে হাত জোর করে বললেন, "জো হুকুম মহারাজ! শুধু বুড়ির নামটা বলুন।"

রাজা অবাক হয়ে বললেন, "কী বললাম বলো তো!"

"আজ্ঞে এই যে বুড়ির ঘরে আগুন দিতে বললেন।"

রাজা ঘাড় চুলকে বললেন, "বলেছি নাকি? আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি।"

সেইদিনই শেষ রাত্রে রাজা ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে বললেন, "বিছুটি লাগা। শিগগির বিছুটি লাগা।"

পরদিনই খবর রটে গেল, রাজা বিছুটি লাগাতে বলেছেন। আতঙ্কে সবাই অস্থির।

মন্ত্রী রাজার কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ কাকে বিছুটি লাগাতে হবে তার নামটা একবার বলুন, বিছুটি আনতে পশ্চিমের পাহাড়ে লোক পাঠিয়েছি।"

"বিছুটি।" বলে রাজা গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

পশ্চিমের পাহাড়ের গায়ে সূর্য ঢলে পড়ল। গরুর গাড়ি বোঝাই বিছুটি এনে রাজবাড়ির সামনের অঙ্গনে জমা করা হয়েছে। রাজার সেদিকে মন নেই।

রাজা রঙ্গঘরে বসে বয়স্কদের সঙ্গে ঘুঁটি সাজিয়ে দাবা খেলছেন। মুখ গম্ভীর, চোখে অন্যমনস্ক একটা ভাব। বয়স্করা ভয়ে ভয়ে ভুল চাল দিয়ে রাজাকে জিতবার সুবিধা করে দিচ্ছেন। কিন্তু রাজা দিচ্ছেন আরও মারাত্মক ভুল চাল।

খেলতে খেলতে রাজা একবার গড়গড়ার নলে মৃদু একটা টান দিয়ে বললেন, "পুঁতে ফেললে কেমন হয়?"

মন্ত্রী কাছেই ছিলেন। বিড়বিড় করা থামিয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, "খুব ভাল হল

মহারাজ। শুধু একবার হুকুম করুন।"

রাজা আকাশ থেকে পড়ে বললেন, "কিসের ভাল হয়? কিছুতেই ভাল হবে না মন্ত্রী! মনটা একদম খারাপ।"

মন্ত্রী! বিমর্ষ হয়ে আবার বিড়বিড় করতে লাগলেন।

পরদিন রাজা শিকারে গেলেন। সঙ্গে বিস্তর লোকলস্কর, অস্ত্র-শস্ত্র, ঘোড়া, রথ। বনের মধ্যে রাজার শিকারের সুবিধের জন্যই হরিণ, খরগোস, পাখি ইত্যাদি বেঁধে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে। একটা বাঘও আছে। রাজা ঘোড়ার পিঠে বসে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, কিন্তু একটাও তীর ছুড়লেন না। দুপুরে বনভোজনে বসে পোলাও দিয়ে মাংসের ঝোল মেখে খেতে খেতে বলে উঠলেন, "বাপ রে। ভীষণ ভূত।"

মন্ত্রীমশাই সঙ্গে সঙ্গে মাংসের হাত মাথায় মুছে উঠে পড়লেন। রাজামশাইয়ের সামনে এসে বললেন, "তাই! বলুন মহারাজ! ভূত! তা তারই বা ভাবনা কী? ভূতের রোজাকে ধরে আনছি, রাজ্যে যত রোজা আছে ধরে ধরে সব শূলে দেওয়া হবে।"

রাজা হাঁ করে রইলেন। বললেন, "ভূত! না না ভূত নয়। ভূত হবে কী করে? ভূতের কি কখনো মাথা ধরে?"

মন্ত্রীমশাই আশার আলো দেখতে পেয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, "মাথা ধরলেও বদ্যিভূত আছে। তারা ভূতের ওষুধ জানে।"

রাজা গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমি ভূতের কথা ভাবছি না। মনটা বড় খারাপ।"

কয়েকদিন পর রাজা এক জ্যোৎস্না রাতে অন্দর মহলের অলিন্দে রাণীর পাশাপাশি বসেছিলন। হঠাৎ বললেন, "চলো রাণী, চাঁদের আলোয় বসে পান্তাভাত খাই।"

রাণী তো প্রথমে অবাক। তারপর তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

মন্ত্রী এসে হাতজোড় করে বললেন, "তা এ আর বেশি কথা কী? ওরে, তোরা সব পান্তা-ভাতের জোগাড় কর।"

রাজা অবাক হয়ে বললেন, "পান্তাভাত? পান্তা-ভাতটা কী জিনিস বলো তো?"

"জলে ভেজানো ভাত মহারাজ, গরিবরা খায়। কিন্তু আপনি নিজেই তো পান্তাভাতের কথা বললেন।"

"বলেছি? তা হবে। কখন যে কী বলি। মনটা ভাল তো, তাই।"

মন্ত্রীমশাই ফিরে গেলেন। তবে সেই রাত্রেই তিনি রাজ্যের সবচেয়ে সেরা বাছা বাছা চারজন গুপ্তচরকে ডেকে বললেন, "ওরে তোরা আজ থেকে পালা করে রাজমশাইয়ের ওপর নজর রাখবি! চব্বিশ ঘণ্টা।"

পরদিনই এক গুপ্তচর এসে খবর দিল, "রাজমশাই ভোর রাত্রে বিছানা থেকে নেমে অনেকক্ষণ হামা দিয়েছেন ঘরের মেঝেয়।"

আর একজন বলল, "রাজামশাই একা একাই লাল জামা নেব, লাল জামা নেব, বলে খুঁতখুঁত করে কাঁদছেন।"

আর একজন এসে খবর দিল, "রাজামশাই এক দাসীর বাচ্চা ছেলের হাত থেকে

একটা মণ্ড কেড়ে নিয়ে নিজেই খেয়ে ফেললেন এইমাত্র।"

চতুর্থ জন বলল, "আমি অতশত জানি না, শুধু শুনলাম রাজমশাই খুব ঘন ঘন ঢেঁকুর তুলছেন আর বলছেন সবই তো হল, আর কেন?"

মন্ত্রীর মাথা আরও গরম হল। তবু বললেন, "ঠিক আছে, নজর রেখে যা।"

পরদিনই প্রথম গুপ্তচর এসে বলল, "আজ্ঞে রাজামশাই আমাকে ধরে ফেলেছেন। রাত্রে শোওয়ার ঘরের জানালা দিয়ে যেই উঁকি দিয়েছি, দেখি রাজামশাই আমার দিকেই চেয়ে আছেন। দেখে বললেন, 'নজর রাখছিস? রাখ' বলে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন।"

দ্বিতীয় জন এসে বলে, "আজ্ঞে আমি ছিলাম রাজার খাটের তলায়। মাঝরাতে রাজামশাই হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'কানে কেন্নো ঢুকবে, বেরিয়ে আয়।"

তৃতীয় জন কান চুলকে লাজুক-লাজুক ভাব করে বলল, "আজ্ঞে আমি বিকেলে রাজার কুঞ্জবনে রাজার ভুঁইমালী সেজে গাছ ছাটছিলাম। রাজা ডেকে খুব আদরের গলায় বললেন, 'ওরে, ভাল গুপ্তচর হতে গেলে সব কাজ শিখতে হয়। ওভাবে কেউ গাছ ছাঁটে নাকি? আয় তোকে শিখিয়ে দিই।' বলে রাজা নিজেই গাছ ছেঁটে দেখিয়ে দিলেন।"

কিন্তু সবচেয়ে তুখোড় যে গুপ্তচর সেই রাখহরি তখনও এসে পৌঁছয়নি। মন্ত্রী একটু চিন্তায় পড়লেন। ওদিকে রাখহরি কিন্তু বেশি কলাকৌশল করতে যায়নি। সকালবেলা রাজার শোওয়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজা বেরোতেই প্রণাম করে বলল, "মহারাজ, আমি গুপ্তচর রাখহরি, আপনার উপর নজর রাখছি।"

রাজা অবাক হলেন স্মিত হাসলেন হাই তুলে বললেন, "বেশ বেশ মন দিয়ে কাজ করো।"

তারপর রাজা যেখানে যান পেছনে রাখহরি ফিঙের মতো লেগে থাকে।

দুপুর পর্যন্ত বেশ কাটল। দুপুরে খাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে রাজা হঠাৎ বললেন, "চিমটি দে। রাম চিমটি দে।"

সঙ্গে সঙ্গে রাখহরি রাজার পেটে এক বিশাল চিমটি বসিয়ে দিল। রাজা আঁক করে উঠে বললেন, 'করিস কী করিস কি ওরে বাবা!" রাখহরি বলল, 'বললেন যে।"

পেটে হাত বোলাতে বোলাতে রাজা কিন্তু হাসলেন।

আবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। রাজা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ বলে উঠলেন, "ল্যাঙ মেরে ফেলে দে।" বলতে না বলতেই রাখহরি ল্যাঙ মারল। রাজা চিতপটাং হয়ে পড়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। রাখহরি রাজার গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে দাঁর করিয়ে রাজার পায়ের ধুলো নিল। রাজা শ্বাস ফেলে বললেন, 'হুঁ।"

রাত পর্যন্ত রাজা আর কোনও ঝামেলা করবেন না। রাখহরি রাজার পিছু-পিছু শোওয়ার ঘরে ঢুকল এবং রাজার সামনেই একটা আলমারির ধারে লুকিয়ে রইল। রাজা আড়চোখে দেখে একটু হাসলেন। আপত্তি করলেন না। তবে শোওয়ার কিছুক্ষণ পরেই রাজা হঠাৎ খুঁতখুঁত করে বলে উঠলেন, "ঠাণ্ডা জলে চান করব, ঠাণ্ডা জলে" রাখহরি বিদ্যুৎগতিতে রাজার ঘরের সোনার কলসের কেওড়া আর গোলাপের সুগন্ধ মেশানো

জলটা সবটুকু রাজার গায়ে ঢেলে দিল।

রাজা চমকে হেঁচে কেসে উঠলেন বসলেন, "আচ্ছা শুগে যা।"

রাখহরি অবশ্য শুতে গেল না। পাহারায় রইল।

সকালে উঠে রাজা হাই তুলে হঠাৎ বলে উঠলেন, "দে বুকে ছোরা বসিয়ে দে — রাখহরি কোমরের ছোরাখানা খুলে রাজার বুকে ধরল।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে রাজা বললেন, "থাক থাক, ওতেই হবে। তোর কথা আমার মনে ছিল না।'

রাখহরি ছোরাটা খাপে ভরতেই রাজা হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে রাজবাড়ির সব লোকজন ছুটে এল। রাজা হাসতে হাসতে দু' হাতে পেট চেপে ধরে বললেন, "ওরে আমার যে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে! ভীষণ হাসি পাচ্ছে।"

খবর পেয়ে মন্ত্রীও এসেছেন। রাজার বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "যাক্ বাবা! মন খারাপটা গেছে তাহলে।'

হাসতে হাসতে রাজা বিষম খেয়ে বললেন, "ওঃ হোঃ হোঃ হোঃ! কী আনন্দ! কী আনন্দ!"

তারপর থেকে রাজার মন খারাপ কেটে গেল। কিন্তু নতুন একটা সমস্যা দেখা দিল আবার। কারণ নেই কিছু নেই, রাজা সব সময়ে কেবল ফিক্ ফিক্ করে হেসে ফেলছেন। খুব দুঃসংবাদ দিলেও হাসতে থাকেন। যুদ্ধে হার হয়েছে? ফিক্-ফিক্। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে? ফিক্ ফিক্। দক্ষিণের রাজ্যের প্রজারা বিদ্রোহ করেছে? ফিক্-ফিক্।

রাজার হাসি বন্ধ করার জন্য মন্ত্রীকে এখন আবার দ্বিগুণ ভাবতে হচ্ছে।

বড় হলে কেমন হয়

শৈল চক্রবর্তী

বড় হওয়ার অনেক সুবিধে।

ছোট থাকতে মিঠুর ভাল লাগে না।

দাদা বাবার মত বেশ বড় হওয়া যেত! তাই বা কেন? জ্যাঠামণি ত খুব লম্বা, তাঁর মত হলে আরো ভাল হয়। বড় হলে কেমন উঁচু তাক থেকে বিস্কুটের টিনটা পাড়া যেত। শিকেয় ঝোলান আচারের হাঁড়িতে হাত দেওয়া কত সহজ হত।

স্কুলের মাঠে বল খেলা হচ্ছে। হরিদাস মেমোরিয়াল শিল্ডের ফাইন্যাল খেলা। মিঠুর যেতে একটু দেরি হয়েছে মাত্র। সে গিয়ে দেখে কি, মাঠের ধারে লোকে লোকারণ্য। সবাই দাঁড়িয়েছে যেন একটা পাঁচিল খাড়া করে। মিঠুর মত ছোট ছেলের পক্ষে খেলা দেখা অসম্ভব। সে যদি খুব লম্বা হত তাহলে কি আর ভাবনা? তখন সবার মাথার ওপর দিয়েই ওর চোখ চলে যেত মাঠের ওপর। দিব্যি মজা করে সবই দেখতে পেত সে।

দৈত্যদের গল্প শুনতে শুনতে মিঠু কান খাড়া করে থাকে। দৈত্যদের মস্ত বড় বিরাট দেহ— কত বড় হবে? হয়ত তিনতলা ছাদ পর্যন্ত উঁচু হবে। তাই বা কেন, চারতলা ছাদেও তাদের মাথা পৌঁছতে পারে। ঐ ভুতো আমগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সে কেমন হাত বাড়িয়ে আমগুলো পাড়বে আর খাবে। কী মজা!

তাছাড়া বড় হলে কেমন বকুনি শুনতে হয় না। মা বাবা আমাকে যত বকা দেয়, দাদাকে কি দিদিকে তো তত বোকা দেয় না। তারা যে বড়।

বড় হওয়ার যে কত সুবিধে তা আর ভেবে শেষ করা যায় না। শুয়ে শুয়ে সেদিন মিঠু এই সব কথা ভাবছিল।

গভীর রাত তখন। মিঠু বিছানায় শুয়ে। সবে মাত্র তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় হঠাৎ দরজায় কে যেন টোকা দিলে— টক্ টক্ টক্।

মিঠু ভয়ে ভয়ে দরজার ছিটকানি খুলে দিল। ওমা. দাঁড়িয়ে কে ও? লম্বা দাড়িওয়ালা— ও কে? মিঠুর ভয় হয়ে গেল, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারল ভয়ের কিছু নেই, কেননা দাড়িওয়ালার কথাগুলো শুনে মনে হল, সে চোর বা ডাকাত নয়। আসলে সে একজন সাধু। ঘরে ঢুকে সাধু বললে, দেখো খোঁকা—

ইস্, মিঠুকে খোঁকা বলে ডাকছে! কী আস্পর্ধা।

আচ্ছা, দেখাই যাক. কি বল।

দেখো খোঁকা, হামি এক সাধু আছে, হামি কুছু যাদু ভি জানে—

ওমা, এ যে হিন্দি বাংলা মিশিয়ে বলছে, যেমন বলে আমাদের কয়লাওয়ালা লছমন। সাধু আবার জাদু জানে! সে আবার কি? হতেও পারে। সাধুরা তো অনেক ম্যাজিক জানে শুনেছি। আচ্ছা শোনাই যাক্— কি বলে ঐ সাধু।

সাধু বলে, হামি তোমায় একঠো মজার ওষুধ দিতে পারি—

কথাটা শুনে মিঠুর ভীষণ খারাপ লাগল, সে বলে উঠল, না, আমি ওষুধ খেতে মোটেই ভালবাসি না।

সাধু বললে, শোনো খোঁকা, এ তেতো ওষুধ নেহি। হামার কাছে দু'রকম সিরাপ আছে, মিষ্টি সিরাপ! একটা খেলে মস্ত বড় হয়ে যাবে, আউর একটা খেলে একদম ছোট্ট হয়ে যাবে। কোন্‌টা তোমার চাই, বল—

এইবার মিঠুর খুব অবাক লাগল। বা-রে! আমি যা চাই ঠিক তাই এসে গেছে হাতের কাছে। সিরাপ খেলে বড় হওয়া যায়? তাহলে, এটাই নেব আমি। দেখি না কেন, সত্যিই বড় হই কি না!

সে বললে, 'সিরাপ খেলে সত্যিই বড় হয়ে যাব?'

সাধু বললে, 'জরুর। ইসমে মন্তর হ্যায়। পরীক্ষা করকে দেখো।'

মিঠু বললে, 'তাহলে আমায় বড় হওয়ার সিরাপটাও দাও।'

'আচ্ছা, বহুৎ ঠিক আছে।' বললে সাধুজি, 'চাটকে চাটকে খানে হোগা, সমঝা তো? এহি লে লেও।' এই কথা বলে সাধুজি তার ঝুলি থেকে বেছে একটা বেঁটে শিশি বার করে মিঠুর হাতে দিল। মিঠু ঐটা নিয়ে রাখল টেবিলে। রেখে যেমন সে পেছন ফিরেছে অমনি দেখে সাধুজি কোথায় মিলিয়ে গেছে। দরজার ফাঁক দিয়ে আর তাকে দেখা গেল না। ওমা, কী আশ্চর্য! সাধু গেল কোথা? সে দরজা দিল বন্ধ করে।

মিঠু শিশিরটার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল। বেশ গোলগাল ছোট্ট শিশি। ইচ্ছা হল, ওষুধটা একটু খেয়ে দেখে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল না, এখুনি খেয়ে কাজ নেই। হতেও পারে, ওটা খারাপ ওষুধ! যদি বিষ হয়! শুনেছি, অনেক দুষ্ট লোক ছেলেদের ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলে তারপর নিয়ে যায় ঝুলিতে ভরে। তার চেয়ে এক কাজ করি না কেন— একটা পরীক্ষা করে দেখি।

জানলার ধারে ছোট্ট মাটির টব ছিল একটা ডালিয়া গাছের চারা, গাছটা ছোট্ট রোগা মত। তাতে ছোট্ট একটা ফুল ধরেছে সবে। মিঠু করল কি, শিশিটা নিয়ে সেই গাছের গোড়ায় ক'ফো'টা সিরাপ ঢেলে দিলে। তারপর ছিপ লাগিয়ে টেবিলের ওপরে শিশিটা রাখতে গেল।

ঠিক সেই সময় পায়ের ওপর দিয়ে লাফাল একটা নেংটি ইঁদুর। মিঠু যেই পা সরাতে যাবে অমনি মিঠুর হাত ফস্‌কে সিরাপের শিশিটা পড়ল মাটিতে। আর চুরমার হয়ে গেল— সিরাপটা গেল মেঝেতে গড়িয়ে। আহা, কি হবে! আমার এত সাধের ওষুধটা নষ্ট হয়ে গেল!

মিঠুর কী দুঃখ! সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। চোখ ঝাপসা হয়ে এল তার। তার কান্না পেল। যাঃ এত আশার জিনিসটা এমনভাবে নষ্ট হল! কেন একটু সাবধান হলাম না! আর, ইঁদুরটাও অমনি পাজি, ওর জন্যেই তো সব গেল।

মিঠু এইসব ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ মনে হল, তার মাথায় কে যেন আঙুল দিয়ে ছুঁয়েছে। কে? বলে সে চমকে পেছন ফিরল।

ও হরি! এ যে ডালিয়া ফুল! জানালার ধারের টবটা থেকে গাছের লম্বা ডাঁটিটা

এতদূরে এগিয়ে এসেছে! আরে একি! গাছটার মাথায় যে দেখছি ধামার মত মস্ত একটা ডালিয়া ফুল! এত বড় ফুল সে জীবনে দেখেনি। আর এত বড় গাছও নয়। এ গাছ আর ফুল কোথা থেকে এল?

তখনই তার মনে পড়ল, এই গাছের গোড়াতেই ত সে ঐ শিশির সিরাপ ঢেলে দিয়েছিল।

ওষুধটার তাহলে সত্যি বড় হয়! কী ম—

কী মজা! বলতে গিয়ে সে থেমে গেল। তার ভীষণ দুঃখ হল, এমন সুন্দর ওষুধটা পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেল! আমিও তো গাছটার মত হতে পারতুম!

কিন্তু সত্যি কি নষ্ট হয়েছে? কেননা, তখনি মিঠুর চোখে পড়ল মস্ত বড় ইঁদুরের মত কি একটা ঠিক বেড়ালের মত বলা যায়, কি একটা ঘোরাফেরা করছে ঘরের মেঝেতে।

এই ত সেই নেংটিটা, মেঝেতে ওষুধ চাটছিল। ও হরি! এত বড় হয়ে গেছে! ইঁদুরমশাই তখন নির্ভয়ে টেবিলের তলা, চেয়ারের তলা দিয়ে দিব্যি লাট সাহেবের মত ঘোরাফেরা করছেন। একটুও ভয়-ডর নেই। বড় বড় দাঁত দিয়ে কট কট কট কট করে বই কাটছেন আর বেতের বাস্‌কেট কেটে ফোকর করে ফেলেছেন। মিঠু কাছে যেতে মিঠুর পায়ের আঙুলেই দিল সে দাঁত বসিয়ে।

মিঠু ত ভয়ে অস্থির। ওরকম বেড়ালের মত ইঁদুর দেখলে কারই বা ভয় না করবে? এমনি কি পুষি বেড়ালটাকে দেখেও ঐ ইঁদুরের ভয়-ডর নেই। বরং তেড়েই গেল সে পুষিকে, ইয়া বড় বড় গোঁফ ফুলিয়ে আর দাঁত বার করে। ওমা! পুষি তাই দেখে দে ছুট। এমন সময় হঠাৎ মিঠু দেখে, নেংটি ইঁদুরের মত অনেকগুলো কি যেন সব মেঝেরওপরে ঘোরাফেরা করছে। এগুলোকে দেখতে পিঁপড়ের মত। কিন্তু ডেঁয়ো পিঁপড়ে ত এত বড় হতে দেখেনি সে কখনো! ও হরি! পিঁপড়েই ত ওরা! মাটির সিরাপ খেয়েই ওরা অত বড় হয়ে গেছে। ইস্, যদি কামড়ে দেয়— মিঠু ভয়ে ভরে ঘরের বাইরে এল, চলে গেল সোজা একেবারে উঠোনে।

ইতিমধ্যে ছোটকা চেঁচাতে শুরু করেছে, 'ওরে, তোরা দেখে যা, দেখে যা, খরগোশের মত অদ্ভুত একটা কি জন্তু বাড়িতে এসে ঢুকেছে।'

মিঠুর ত জানতে বাকি নেই। ওটা সেই নেংটি ইঁদুরটা, যাদু সিরাপ খেয়ে বিরাট বড় হয়েছে।

মিঠু উঠোনের বেল ফুলের ঝাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু একটু পরেই তার কানে এল একটা ঘড়-ড়-ঘড় করে গর্জন।

ওরে বাব্বাঃ ও কিসের আওয়াজ? বাড়িসুদ্ধ সবাই কান খাড়া করে শুনছে, এমন সময় দেখা গেল, সেই বিরাট নেংটি ইঁদুরকে তাড়া করছে একটা বাঘের মত কি জন্তু। গায়ে ডোরা নেই, তবে হলদে-কালোর ছোপ আছে, ল্যাজটায় আছে ডোরা নেই, তবে হলদে-কালোর ছোপ আছে, ল্যাজটায় আছে ডোরা। বাড়ির সবাই ভয়ে জড়সড়, মিঠুর হঠাৎ মনে হল এ ত আমাদের পুষি! নিশ্চয়ই সে ঐ সিরাপ চেটেপুটে খেয়েছে। কিন্তু কী সাংঘাতিক কাণ্ড! কত মস্ত বড় হয়ে গেছে! ঠিক যেন রয়াল বেঙ্গল টাইগারের মত মনে

হচ্ছে। আমাকেই হয়ত 'হালুম' করে ধরবে আর একগালে খেয়ে ফেলবে।

কিন্তু পুষি-টাইগার তা করল না। সে নেংটির পেছনে ছুটল লাফ দিয়ে। নেংটিও কম যায় না, সেও লাফ দিয়ে ছোটে। উঠোন থেকে সে ওর থাবা এড়িয়ে ছুটল ঘরের দিকে। দালানে বালতি ওল্টাল, কুঁজো ভাঙল। জলে একাকার হল চারিদিক।

দুদ্দাড় করে ওরা ঢুকল আবার সেই মিঠুর ঘরে। দুই বিরাট জানোয়ারের তখন কী দাপাদাপি যুদ্ধ! মিঠুর পড়বার টেবিল কাত্ হয়ে পড়ে, আলোটা ভেঙে চুরমার। তাক থেকে পড়ে ক'টা পুতুল ভাঙল।

মিঠুর একটা প্রিয় ফুলদানি ছিল টেবিলের ওপর। সেটা কখন যে ফুলসুদ্ধ পড়েছে আর ভেঙে চুরমার হয়েছে। তার ওপর পড়েছে একগাদা বই। বইগুলো ছিল তাকের ওপর। ঘরময় ছত্রাকার।

পুষিটা তখনও এক জায়গায় বসে রাগে গর্ গর্ করছে আর ফুলছে, তার মস্ত ল্যাজটা মাটিতে আছড়াচ্ছে। আসলে সে আলমারির পেছনে দেয়ালের গায়ে যে ফাঁকটা আছে তার ভেতরে গলতে পারছে না। আর সেই ফাঁকের ভেতরই লুকিয়ে বসে আছেন নেংটি ব্যাটা।

কিছুক্ষণ পরে পুষি-টাইগার এর লাফ দিল, আর সেই ধাক্কায় মিঠুর কাঁচের সুন্দর জারটা ডিগবাজি খেয়ে পড়ল। আহা রে! জারে ছিল ভর্তি জল আর তিনটে সুন্দর সোনালি মাছ।

মিঠু তাড়াতাড়ি মাছগুলোকে মাটি থেকে তুলতে গেল, কিন্তু কোথায় রাখবে? রাখবার জায়গা কোথা? সব ত ভেঙেচুরে একাকার।

হতচ্ছারা পুষিটার জন্যেই এত সব কাণ্ড! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা! সে একখানা বিরাট মোটা অভিধান বই নিয়ে ছুঁড়ল তার দিকে—

কিন্তু কী আশ্চর্য! পুষি-টাইগার যেন ছোট হয়ে গেছে অনেক। এইটুকু সময়ের মধ্যেই সে প্রায় আগের চেহারায় ফিরে আসছে। এ যেন সেই আগের পুষি।

আলমারির ফাঁক দিয়ে মিঠু দেখল, নেংটিটাও এত্তোটুকু হয়ে গেছে, যেমন সব নেংটিই হয়। ঐ ত, নর্দমার গর্ত দিয়ে ফুড়ুৎ করে পালাল নেংটিটা।

ধেড়ে ধেড়ে ডেঁয়ো পিঁপড়েগুলোকেও আর দেখা গেল না। মিঠু ভাবল, ওষুধের কাজ তাহলে ফুরিয়ে গেল নাকি? তাই এরা সব বড় থেকে আবার ছোট হয়ে গেল। বিরাট রাক্ষুসে ডালিয়া ফুলটাও ত দেখছি কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে। আগে যেমন ছিল তেমনি।

যাক্, বাঁচা গেল। মিঠু যেন আরামের নিঃশ্বাস নিল। ওঃ ঘরখানা আমার তচ্নচ্ করেছে ওরা। ধেড়ে ধেড়ে জিনিসগুলো মোটেই ভাল নয়। ঐ ত, এখন পুষিটাকে ত বেশ ভালই লাগছে। এখন আর ও পুষি-টাইগার নয়, সত্যিকার ছোট্ট সেই পুষি। এখন ওকে আদর করা যায়। অথচ পুষি-টাইগারকে কী ভয়ই করছিল! অত বড় কি ভাল? যে যেমন আছে তার তাই থাকাই ত ভাল দেখছি।

বড়দার বেড়াল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমার বড়মামার দুটো বেড়াল। একটার নাম চাঁদিয়াল, আর একটার নাম ঘোড়েল। চাঁদিয়াল নামটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত। কারও কোনও প্রতিবাদ ছিল না। সাদা ধবধবে বেড়াল, একপাশে পেটের কাছে গোলমত কালো একটা ছাপ, যেন কম্পাস ফেলে আঁকা। বেড়ালের আকাশে কালো চাঁদ। বেড়ালটার স্বভাবচরিত্র খুবই ভাল। সর্বক্ষণ একপাশে চোখ বুজিয়ে বসে থাকে, যেন ধ্যানমগ্ন। মাসিমা যখন খেতে দেন, তখন খায়। তারপর সামনের ডান থাবায় মুখটুখ মুছে আবার ধ্যানে বসে পড়ে। কোনওদিন ইচ্ছেটিচ্ছে হলে গা-হাত-পা একটু চাটাচাটি করে। নয় তো ওইসব ঝামেলার মধ্যে একেবারেই যেতে চায় না। বড়মামার থিয়োরি হল, বেড়ালের লোমে এমন একটা কেমিক্যাল আছে যাতে অটো ক্লিনিং হয়ে যায়, টেপ রেকর্ডারের অটো স্টপের মত, রেফ্রিজারেটারের অটো ডি ফ্রস্টিং-এর মত।

মাসিমা শুনে বলেছিলেন, 'রাখো তো! বেড়ালের মত অলস প্রাণী আর দুটি নেই। লেজি ক্যাট।'

বড়মামা বেড়াল গবেষণায় আরও কিছুটা এগিয়েছেন। তাঁর ধারণা, চাঁদিয়াল হল ছদ্মবেশী সাধক। রূপ গোপন করে আছে। সারাদিন ধ্যানমগ্ন। এক কড়া দুধ খোলা পড়ে আছে। একটু চেখে দেখার সামান্যতম ইচ্ছে নেই। মাছ পড়ে আছে, মানুষেরও একদিন চুরি করার ইচ্ছে হয়! চাঁদিয়াল নির্বিকার। কার্নিসে বসে স্পেশ্যাল কোনও ধ্যান করছে, নিরালম্ব সাধনপ্রণালী অনুসারে। দুটো পরশ্রীকাতর, ছোট লোক শ্রেণীর কাক এসে প্রলম্বিত লেজে প্যাঁক প্যাঁক ঠোকর মারছে। চাঁদিয়ালের কী সহিষ্ণুতা। ভুরু কুঁচকে মাঝেমাঝে ক্যাঁক শব্দ ছাড়া আর কিছুই করছে না। মাঝেমধ্যেই চড়াই পাখি এসে মাথা চুলকে দিয়ে যায়।

এ বেড়াল বেড়াল নয়, লুক্কায়িত সাধক। হিংসা, লোভ, ক্রোধ সব জয় করেছে। এ বেড়াল ইঁদুরের চৌকিদার হতে পারে। এ বেড়ালকে ভাঁড়ারের চার্জে বিশ্বাস করে বসানো যায়। আস্থাভাজন বেড়াল।

মেজোমামা এইসব শুনতে-শুনতে একদিন বললেন, 'আমার একটা ছোট্ট প্রতিবাদ আছে ভারতীয় সাধক সমাজের তরফ থেকে। তাঁরা বৃন্দাবনে বৃক্ষ হয়ে থাকতে পারেন, তাঁরা কোন দুঃখে বড়দার বেড়াল হতে যাবেন! আই রেজিস্টার মাই আম্বল প্রোটেস্ট ইন দিস রিগার্ড।' মেজোমামা আজকাল পাইপ ধরেছেন। সায়েবি চালচলন। টিভিতে টেনিস খেলা দেখেন। শোনা যাচ্ছে গল্‌ফ খেলবেন। খেতে বসে এক চুমুকে এক বাটি ডাল সাবাড়। ওইটাই হল স্যুপ।

মেজোমামা পাইপ পরিষ্কারে মন দিলেন। মাসিমা বসে আছেন। বড়মামা বহুক্ষণ ধরে একটা ওষুধের শিশির ছিপি খোলার চেষ্টায় জেরবার। যা হয়, প্যাঁচ ঘুরে গেছে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কেবলই বলছেন, 'ধ্যাত তেরিকা।'

মাসিমা বললেন, 'মেজদার কথাটা শুনলে?'

'শুনেছি।'

'কিছু বলার আছে!'

'জাস্ট উলটে দিলুম। সাধক বেড়াল হয়েছে বললে আপত্তি, বেশ, তা হলে বলি, বেড়াল সাধক হয়েছে। এতে তো আপত্তি নেই!'

মেজোমামা বললেন, 'অর্থাৎ, বেড়াল তপস্বী।'

বড়মামা উঠে চলে গেছেন। বাইরে থেকে আমাকে হেঁকে বললেন, 'ছুরি, কাঁচি, দা, কাটারি, যা পাস নিয়ে আয়। শিশির ছিপি খুলব, তবে জলস্পর্শ করব।'

মেজোমামা যোগ করলেন, 'চিতোর রানার পণ। ফ্রি স্যাম্পেলের ওই দশাই হয়। ওষুধ খেতে হলে আমাদের মত পয়সা খরচ করে খেতে হয়। এ যেন মানুষ মারা হচ্ছে। ওরে, আগে একটা এ টি এস দিয়ে দে। রক্তারক্তি তো হবেই।'

বড়মামার যাবতীয় কেরামতিকে আমরা সকলেই ভয় পাই। একবার পাখার ব্লেড পরিষ্কার করার জন্য ঘড়াঞ্চিতে উঠেছিলেন। সবসুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ে তিন মাস পায়ে প্লাস্টার। ছবি টাঙাবেন, দেওয়ালে পেরেক মারছেন। সেখানেও অধৈর্য, ধ্যাত তেরিকা। বুড়ো আঙুলের মাথা হাতুড়ির এক ঘায়ে থেঁতো। এতখানি ব্যান্ডেজ। আঙুল ফুলে কলাগাছ।

মাসিমা শিশিটা বড়মামার হাত থেকে কেড়ে নিয়েই লাফিয়ে উঠলেন, 'এ কী! এ তো তরল আলতা! আলতার শিশি নিয়ে তুমি এতক্ষণ ধরে কী করছ!'

বড়মামা ঘাবড়ে গেছেন, 'আলতা! আমি তো ভেবেছি কাফ মিকশ্চার।'

'এটা তোমার কাফ মিকশ্চার? একবার পড়ে দেখবে তো! খুলে গেলে কী করতে?'

'দু' চামচে পরিমাণ গালে ঢেলে দিতুম।'

মেজোমামার ঠোঁটে পাইপ। উঠে এসেছেন বারান্দায়। বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'একটা জিনিস। মুকুজ্যে ফ্যামিলিতে এই এক পিসই পাবি। আলতা খেয়ে সতী সাবিত্রী হওয়ার ইচ্ছে। তোর মনে আছে কুসি, সোদপুরের মেলা থেকে একবার একটা এঁড়ে বাছুর কিনে এনেছিল। রোজ খাঁটি দুধ খাবে!'

বড়মামা দমে না গিয়ে বললেন, 'তুই আর কথা বলিসনি। একবার লেবেল না পড়ে টিংচার আইডিন খেয়েছিলিস। মনে আছে কুসি? আর হাতিবাগান থেকে কিনে এনেছিল অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চা। হঠাৎ একদিন শেষ প্রহরে ডাক ছাড়ল, হুক্কা হুয়া, কেয়া হুয়া। তাড়া তাড়া, ব্যাটা শেয়ালের পো।'

মাসিমা রায় দিলেন, 'একপিস মুকুজ্যে নয়, দু'পিস। দুটি ভারতরত্ন। এ বলে,

আমায় দ্যাখ, ও বলে, আমায় দ্যাখ।'

বড়মামা একগাল হেসে বললেন, 'আমরা ওই রকমই, কী বলো মেজো? ভোলেভালে।'

মেজোমামা বললেন, 'আমি অনেকটা চেঞ্জ করে গেছি। সম্প্রতি সিডনি থেকে ঘুরে আসার পর একেবারে পাক্কা সায়েব। তুমি এখনও যে গেঁইয়া, সেই গেঁইয়াই। মানুষ আর হতে পারলে কই! আঙুল চেটে-চেটে ভাত খাও, চেয়ারে ঠ্যাং তুলে বসার অভ্যাস, ঢ্যাড়স করে ঢেকুর তোলো। গামছা দিয়ে গা মোছো। লজ্জা, লজ্জা, শেম, শেম।'

বড়মামা ফুঃ করে একটা আওয়াজ করলেন, 'অস্ট্রেলিয়ার সায়েব! বলিসনি, বলিসনি, লোকে হাসবে। সায়েব একমাত্র ইংল্যান্ডেই পাওয়া যায়। সাদা, সাদা। তাদের কথা তুই একবর্ণও বুঝতে পারবি না। সাধারণ একটা ইংরিজি, যেমন ধর ওয়াটার, কীভাবে উচ্চারণ করবে জানিস, ওটাররর। ওরা দি বলে না, বলে দ্যা। সায়েব অত শস্তা নয়। থ্রি পিস স্যুট পরে। গলায় টাই। গাঁট দেওয়ার কায়দা জানিস, টানলেই ফস্। তুইও তো পরিস, কাঁচি দিয়ে কেটে খুলতে হয়। সায়েব হয়ে জন্মাতে হয়, জন্মে সায়েব হওয়া যায় না।'

কাজিয়া আরও এগোত। বড়মামার কম্পাউণ্ডার হুড়তে পুড়তে এসে হাজির। বৃদ্ধ হাঁপাচ্ছেন আর হায় হায় করছেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেল, নৃশংস হত্যাকাণ্ড।'

শুদ্ধ বাংলা শুনে শুদ্ধ বাংলায় বড়মামার প্রশ্ন, 'কোথায় সঙ্ঘটিত হল?'

'আপনার চেম্বারে।'

'চেম্বারে! সে কী! আপনি অ্যালাউ করলেন কেন?'

'হ্যাট-হ্যাট করতে-করতেই ওষুধের বড় আলমারিটার তলায় চলে গেল।'

'কে গেল, খুনি?'

'আপনাদের ধুমসো বেড়ালটা। এই এত বড় একটা পায়রা ধরেছে। ধড়ফড় ধড়ফড় করছে। গোলাপি রঙের, জলজ্যান্ত, টাটকা একটা পায়রা।'

বড়মামা সঙ্গেসঙ্গে বললেন, 'এ ওই ঘোড়েলটার কাজ। মেজোর আদরে একটি বানর তৈরি হয়েছে। এত খাচ্ছে, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার, তবু জীব হিংসা, তবু জীব হিংসা। চলুন চলুন, কোনওরকমে বাঁচানো যায় কিনা দেখি। আপনি স্যালাইন রেডি করুন। ইল্লিটারেট ক্যাট। ওটাকে আজই বিদায় করব। বস্তায় ভরে সোজা ব্যারাকপুরে। জানোয়ার।''

দলবল বড়মামার চেম্বারে। মেজোমামাও আছেন। বড়মামার পেয়ারের সাকরেদ মণিদার হাতে একটা লাঠি। মাসিমার মুখের চেহারা করুণতম। রোজ সকালে পায়রাদের দানা খাওয়ান। চারপাশে ফট ফট করে ওড়াউড়ি করে। কাঁধে এসে বসে।

কম্পাউন্ডারবাবু বললেন, 'ফেরোসাস বেড়াল মশাই। আমি তাড়া দিতেই গোঁ-

গোঁ করছিল। পারলে পায়রা ছেড়ে আমাকেই ধরে।'

তাড়া খেয়ে আলমারির তলা থেকে বেড়ালটা পায়রামুখে বেরিয়ে এল।

মেজোমামার চিৎকার, মুখ থেকে পাইপ পড়ে গেল, 'লুক হিয়ার, এ আমার ঘোড়েল নয়, আমাদের ওয়ান পিস বড়দার সাধক বেড়াল চাঁদিয়াল। আজ তার ধ্যান ভেঙেছে, আজ তার পতন হয়েছে।'

ধর, ধর, মহা ছোটাছুটি। তাড়া খেয়ে চাঁদিয়াল পায়রা ফেলে সোজা মিটার ঘরের ছাদে। ক্ষিপ্ত বড়মামা মণিদাকে বলছেন, 'আজ ব্যাটাকে কিমা কর। আমার প্রেস্টিজ পাংচার করে দিয়েছে।'

মেজোমামা বললেন, 'প্রেস্টিজ পাংচার করেনি বড়দা, তোমার বেড়ালটা এতদিনে বেড়াল হল। ছিল একটা ভ্যাবা গঙ্গারাম। ভেবে দ্যাখো বাঘ যদি মানুষ না খেয়ে ছাগলের মত বটপাতা খায় তাকে কেউ টাইগার বলবে? বেড়াল যদি ফলাহারী হয় তাকে তুমি বেড়াল বলবে! বেড়ালের যা করা উচিত এতদিনে তাই করে জাতে উঠল। ব্র্যাভো চাঁদিয়াল ব্র্যাভো!'

মাসিমা পায়রাটাকে কোলে তুলে নিয়েছেন। চাঁদিয়াল গলায় একটা দাঁত বসিয়েছে। রক্ত বেরোচ্ছে। এতটুকু একটা নরম বুক ধড়ফড় করছে। চোখ দুটো আধবোজা। বড়মামা ছোটাছুটি করছেন। একবার বলছেন, স্যালাইন চালাবেন। একবার বলছেন, ব্লাড দেবেন।

মেজোমামা বললেন, 'ব্লাড যে দেবে, ওর ব্লাড গ্রুপ জানো?'

বড়মামা বললেন, 'পায়রা গ্রুপ।'

'তা হলে আর একটা পায়রা ধরে এনে রক্তদান নয়, রক্তপাত করো।

কিছুই করতে হল না, পায়রাটা আস্তেআস্তে মাসিমার কোলে নেতিয়ে পড়ল। বাড়িতে শোকের ছায়া। গোটাকতক পায়রার পালক বাতাসে উড়ছে।

বড়মামা বললেন, 'সঙ্গদোষ।'

মেজোমামা বললেন, 'তার অর্থ?'

'চাঁদিয়াল ঘোড়েলের সঙ্গে মিশে স্বভাব হারিয়েছে। মাস্তান হয়ে গেছে। ওর কালো হাত আমি ভেঙে দেব, গুঁড়িয়ে দেব।'

ব্যাপারটা আর বেশিদূর গড়াল না। বড়মামার রুগিরা সব এসে গেছেন। চেম্বার ভর্তি।

দুপুরে আমরা সবাই খেতে বসেছি। বেড়ালের মেমোরি খুব কম। বড়মামার সামনে চাঁদিয়াল রোজ যেমন এসে বসে, সেইরকম বসেছে, চোখ বুজিয়ে থুপ্পি মেরে।

বড়মামা বললেন, 'মণি, এটাকে সামনে থেকে হাঁটা, এটার আমি মুখদর্শন করতে চাই না।'

আশ্চর্য! সঙ্গেসঙ্গে বেড়ালটা পেছন ফিরে বসল।

মেজোমামা বললেন, 'কী সেন্স দেখেছ! মানুষের মত।'

মাসিমা ঘোষণা করলেন, 'আজ সব নিরামিষ, ঘোড়েল মাছ খেয়ে হাওয়া হয়েছে। আমরা যখন পায়রা নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় সাবাড় করেছে।'

বড়মামা মেজোমামাকে বললেন, 'শুনলি, শুনলি, যত চোর ছ্যাঁচড় নিয়ে কারবার।'

'বেড়াল মাছ খাবেই, এটা তাদের ধর্ম। সুযোগ পেলেই খাবে।'

বড়মামা হঠাৎ যেন একটা ক্লু পেলেন, ডিটেকটিভরা যেমন পায়, 'বুঝেছি, বুঝেছি চাঁদিয়াল কেন পায়রা ধরেছে।'

'কেন ধরেছে!'

'যাতে তোর বেড়াল মাছ চুরি করতে পারে। কায়দা করে আমাদের সব ব্যস্ত করে রাখলে, রান্নাঘর অরক্ষিত, তখন তোর নিকৃষ্ট বেড়ালটা সব সাবড়ে দিলে।'

মেজোমামা বললেন, 'বড়দা, একেই বলে ফ্রেন্ডশিপ। বেড়ালে বেড়ালে সহমর্মিতা, যেটা মানুষের মধ্যে নেই। বুঝলে ভায়া!'

মাসিমার পরবর্তী ঘোষণা, 'দুধও সাবাড়, বিকেলে র' চা।'

আশ্চর্য কবিতা

সুকুমার রায়

আমাদের ক্লাশে একটি নূতন ছাত্র আসিয়াছে। সে আসিয়া প্রথম দিনই সকলকে জানাইল, 'আমি পোইটরি লিখতে পারি!' একথা শুনিয়া ক্লাশের অনেকেই অবাক হইয়া গেল ; কেবল দুই-একজন হিংসা করিয়া বলিল, 'আমরাও ছেলেবেলায় ঢের-ঢের কবিতা লিখেছি।' নূতন ছাত্রটি বোধহয় ভাবিয়াছিল, সে কবিতা লিখিতে পারে শুনিয়া ক্লাশে খুব হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে এবং কবিতার নমুনা শুনিবার জন্য সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিবে। যখন সেরূপ কিছুরই লক্ষণ দেখা গেল না, তখন বেচারা, যেন আপন মনে কি কথা বলিতেছে, এরূপভাবে, যাত্রার মতো সুর করিয়া একটি কবিতা আওড়াইতে লাগিল—

ওহে বিহঙ্গম তুমি কিসের আশায়
বসিয়াছ উচ্চ ডালে সুন্দর বাসায়?
নীল নভোমণ্ডলেতে উড়িয়া উড়িয়া
কত সুখ পাও, আহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
যদ্যপি থাকিত মম পুচ্ছ এবং ডানা
উড়ে যেতাম তব সনে নাহি শুনে মানা —

কবিতা শেষ হইতে না হইতে, ভবেশ তাহার মতো সুর করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—

আহা, যদি থাক্‌ত তোমার
ল্যাজের উপর ডানা
উড়ে গেলেই আপদ যেত —
করত না কেউ মানা!

নূতন ছাত্র তাহাতে রাগিয়া বলিল, 'দেখ বাপু, নিজেরা যা পার না, তা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া ভারি সহজ। শৃগাল ও দ্রাক্ষা ফলের গল্প শোননি বুঝি?' একজন ছেলে অত্যন্ত ভালমানুষের মত মুখ করিয়া বলিল, 'শৃগাল ও দ্রাক্ষা ফলের গল্প শোননি বুঝি?' একজন ছেলে অত্যন্ত ভালমানুষের মত মুখ করিয়া বলিল, 'শৃগাল এবং দ্রাক্ষাফল! সে আবার কি গল্প?' অমনি নূতন ছাত্রটি আবার সুর ধরিল —

বৃক্ষ হতে দ্রাক্ষাফল ভক্ষণ করিতে
লোভী শৃগাল প্রবেশিল এক দ্রাক্ষা ক্ষেতে
কিন্তু হায় দ্রাক্ষা যে অত্যন্ত উচ্চে থাকে
শৃগাল নাগাল পাবে কিরূপে তাহাকে?
বারম্বার চেষ্টায় হয়ে অকৃতকার্য্য
'দ্রাক্ষা টক' বলিয়া পালাল ছেড়ে রাজ্য।

সেই হইতে আমাদের হরেরাম একেবারে তাহার চেলা হইয়া গেল। হরেরামের

কাছে আমরা শুনিলাম যে ছোকরার নাম শ্যামলাল। সে নাকি এত কবিতা লিখিয়াছে যে, একখানা আস্ত খাতা প্রায় ভর্তি হইয়াছে আর আট দশটি কবিতা হইলেই তাহার একশোটা পুরা হয় ; তখন সে নাকি বই ছাপাইবে।

ইহার মধ্যে একদিন এক কাণ্ড হইল। গোপাল বলিয়া একটি ছেলে স্কুল ছাড়িয়া যাইবে এই উপলক্ষে শ্যামলাল এক প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার মধ্যে 'বিদায় বিদায়' বলিয়া অনেক 'অশ্রুজল' দুঃখশোক' ইত্যাদি কথা ছিল। গোপাল কবিতার আধখানা শুনিয়াই একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, 'ফের যদি আমার নামে পোইটরি লিখবি তো মারব এক থাপ্পড়।' হরেরাম বলিল, 'আহা, বুঝলে না? তুমি স্কুল ছেড়ে যাচ্ছ কিনা, তাই ও লিখেছে।' গোপাল বলিল, 'ছেড়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছি, তোর তাতে কিরে? ফের জ্যাঠামি করবি তো তোর কবিতার খাতা ছিঁড়ে দেবো।' দেখিতে দেখিতে শ্যামলালের কথা স্কুলময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাহার দেখাদেখি আরও অনেকেই কবিতা লিখিতে শুরু করিল। ক্রমে কবিতা লেখার বাতিকটা ভয়ানক রকম ছোঁয়াচে হইয়া, নিচের ক্লাশের প্রায় অর্ধেক ছেলেকে পাইয়া বসিল। ছোট ছোট ছেলেদের পকেটে ছোট ছোট কবিতার খাতা দেখা দিল। বড়দের মধ্যে কেহ কেহ শ্যামলালের চেয়েও ভাল কবিতা লিখিতে পারে বলিয়া শোনা যাইতে লাগিল। স্কুলের দেয়ালে, পড়ার কেতাবে, পরীক্ষার-খাতায়, চারিদিকে কবিতা গজাইয়া উঠিল।

পাঁড়েজির বৃদ্ধ ছাগল যেদিন শিং নাড়িয়া দড়ি ছিঁড়িয়া স্কুলের উঠানে দাপাদাপি করিয়াছিল, আর শ্যামলালকে তাড়া করিয়া খানায় ফেলিয়াছিল, তাহার পরদিন ভারতবর্ষের বড় ম্যাপের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা বাহির হইল —

পাঁড়েজির ছাগলের একহাত দড়ি,
অপরূপ রূপ তার যাই বলিহারি!
উঠানে দাপটি করি নেচেছিল কাল
তারপর কি হইল জানে শ্যামলাল।

শ্যামলালের রঙটি কালো কিন্তু কবিতা পড়িয়া সে যথার্থই চটিয়া লাল হইল, এবং তখনি তাহার নিচে একটি কড়া জবাব লিখিতে লাগিল। সে সবেমাত্র লিখিয়াছে— 'রে অধম কাপুরুষ পাষণ্ড বর্বর' — এমন সময় গুরুগম্ভীর গলা শোনা গেল— 'ম্যাপের উপর কি লেখা হচ্ছে'? ফিরিয়া দেখে হেডমাষ্টার মহাশয়! শ্যামলাল একেবারে থতমত খায়িা বলিল, 'আজ্ঞে স্যার, আগে ওরা লিখেছিল।' 'ওরা কারা?' শ্যামলাল বোকার মত একবার আমাদের দিকে একবার কড়িকাঠের দিকে তাকাইতে লাগিল, কাহার নাম করিবে বুঝিতে পারিল না। মাষ্টার মহাশয় আবার বলিলেন, 'ওরা যদি পরের বাড়িতে সিঁদ কাটতে যায়, তুমিও কাটবে" যাহা হউক সেদিন অল্পের উপর দিয়াই গেল, শ্যামলাল একটু ধমক ধামক খাইয়াই খালাস পাইল।

ইহার মধ্যে একদিন আমাদের পণ্ডিতমশায় গল্প করিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা একক্লাশে পড়িত, তাহাদের মধ্যে একজন নাকি অতি সুন্দর কবিতা লিখিত। একবার

ইন্‌স্পেক্‌টার স্কুল দেখিতে আসিয়া, তাহার কবিতা শুনিয়া এমন খুশি হইয়াছিলেন যে, তাহাকে একটা সুন্দর ছবিওয়ালা বই উপহার দিয়াছিলেন।

ইহার মাসখানেক পরেই ইন্‌স্পেক্টার স্কুল দেখিতে আসিলেন। প্রায় বিশ পঁচিশটি ছেলে সাবধানে পকেটের মধ্যে লুকাইয়া কবিতার কাগজ আনিয়াছে। বড় হলের মধ্যে সমস্ত স্কুলের ছেলেদের দাঁড় করানো হইয়াছে, হেড মাষ্টার মহাশয় ইন্‌স্পেক্‌টারকে লইয়া ঘরে ঢুকিতেছেন— এমন সময় শ্যামলাল আস্তে আস্তে পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিল। আর যায় কোথা! পাছে শ্যামলাল আগেই তাহার কবিতা পড়িয়া ফেলে, এই ভয়ে ছোটবড় একদল কবিতাওয়ালা একসঙ্গে নানাসুরে চীৎকার করিয়া, যে যার কবিতা হাঁকিয়া উঠিল। মনে হইল, সমস্ত বাড়ীটা কর্তালের মত ঝন্‌ঝন করিয়া বাজিয়া উঠিল, ইন্‌স্পেক্‌টার মহাশয় মাথা ঘুরিয়া মাঝ পথেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন। ছাদের উপরে একটা বিড়াল ঘুমাইতেছিল, সেটা হঠাৎ পা ছুঁড়িয়া তিনতলা হইতে পড়িয়া গেল, ইস্কুলের দারোয়ান হইতে অফিসের কেশিয়ার বাবু পর্যন্ত হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল।

সকলে সুস্থ হইলে পর মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, 'এত চেঁচালে কেন?' সকলে চুপ করিয়া রহিল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল 'কে কে চেঁচিয়েছিলে?' পাঁচ সাতটি ছেলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল 'শ্যামলাল'। শ্যামলাল যে একা অত মারাত্মক রকম চেঁচাইতে পারে, একথা কেহই বিশ্বাস করিল না। যতগুলি ছেলের পকেটে কবিতার খাতা পাওয়া গেল, স্কুলের পর তাহাদের দেড়ঘন্টা আটকাইয়া রাখা হইল।

অনেক তম্বি তম্বার পর, একে একে সমস্ত কথা বাহির হইয়া পড়িল। তখন হেডমাস্টার মহাশয় বলিলেন, 'কবিতা লেখার রোগ হয়েছে? ও রোগের ওষুধ কি?' বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'বিষস্য বিষমৌষধম্, বিষের ওষুধ বিষ। বসন্তের ওষুধ যেমন বসন্তের টিকা, কবিতার ওষুধ তস্য টিকা। তোমরা যে যে কবিতা লিখেছ তার টিকা করে দিচ্ছি। তোমরা একমাস পঞ্চাশবার করে এটা লিখে এনে স্কুলে আমায় দেখাবে।' এই বলিয়া তিনি টিকা দিলেন—

পদে পদে মিল খুঁজে গুণে দেখি চোদ্দ
এই দেখ লিখে দিনু ভীষণ পদ্য!
এক চোটে, এইবারে উড়ে গেল সবি তা,
কবিতার গুঁতো মেরে গিলে ফেলি কবিতা।

একমাস তিনি কবিদের কাছে এই লেখা প্রতিদিন পঞ্চাশবার আদায় না করিয়া ছাড়িলেন না। এই কবিতার কি আশ্চর্য গুণ— তারপর হইতে কবিতা লেখার ফ্যাশান স্কুল হইতে একেবারেই উঠিয়া গেল।

সোনার হাঁস

সুখলতা রাও

এক কাঠুরের তিন ছেলে। তাদের মধ্যে ছোট ছেলেটি একটু বোকা ; তাই তাকে সকলে হাঁদারাম ব'লে ডাকে। একদিন কাঠুরে তার বড় ছেলেকে বলল, "আজ আমার অসুখ করেছে, আমি কাঠ কাটতে বনে যেতে পারব না, তুমি যাও।"

তা শুনে কাঠুরের বড় ছেলে কাঠ কাটতে বনে চলল। তার মা তার সঙ্গে রুটি আর দুধ দিয়ে ব'লে দিল, "বন ত ঢের দূরে, সেখানে গিয়ে তোমার বড্ড খিদে পাবে। তখন এই রুটি আর দুধ খেয়ো।'

বনের ধারে এক বুড়ো ব'সে ছিল। সে কাঠুরের ছেলেকে দেখে বলল, "আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। আমাকে একটু কিছু খেতে দেবে?" বড় ছেলে বলল। "যা আছে তাতে আমার নিজের পেট ভরবে না। তোকে কোত্থেকে দেব ; পালা!" এই বলে সে, কাঠ কাটতে গেল। গিয়ে যেই একটা গাছ কাটতে কুড়ুল উঠিয়েছে অমনি সেই কুড়ুল ফস্কে তার হাতের উপর প'ড়ে গেল। হাত কেটে ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়তে লাগল। কাজেই কাঠ কাটা আর হ'ল না।

পরদিন মেজ ছেলে কাঠ কাটতে গেল। তার সঙ্গে মা রুটি আর দুধ দিল। সেদিনও সেই বুড়ো বনের ধারে ব'সে ছিল, আর কাঠুরের ছেলের কাছে খেতে চাইল। তার মেজ ছেলে বলল, "নিজে না খেয়ে তোমাকে খেতে দিই আর কি! 'বয়ে গেছে!" তারপর সে বনের ভিতর গিয়ে কাঠ কাটবার জন্য যেমনি কুড়ুল উঠিয়েছে, অমনি ধপাস ক'রে কুড়ুলটা তার পায়ের উপর প'ড়ে গেল, কাজেই সেদিন আর সে হেঁটে বাড়ি যেতে পারল না।

তারপর কাঠুরের ছোট ছেলে গেল কাঠ কাটতে। সে বেচারা বোকা ব'লে তাকে কেউ ভালবাসে না। তার সঙ্গে তার মা খাবার দিল, খালি বাসি রুটি আর জল। সেদিনও বনের ধারে সেই বুড়ো ব'সে। হাঁদারামকে দেখে "বড় খিদে পেয়েছে বাবা। কিছু খেতে দেবে?" বলল বুড়ো। হাঁদারাম বলল, "তাই ত, কি করি? আমার কাছে ত কিছু নেই। শুধু বাসি রুটি আর জল আছে, তাতে কি তোমার পেট ভরবে?"

তারা দুজনে মিলে সেই রুটি আর জল ভাগ করে খেল। খেয়েদেয়ে, বুড়ো ভারি খুশি হয়ে বলল, "তুমি আজ প্রথমেই যে গাছটা কাটবে, তার নীচে একটা খুব ভাল জিনিস পাবে।" তারপর হাঁদারাম গেল কাঠ কাটতে। গিয়ে সে একটা গাছ কাটতেই গাছের ভিতর থেকে বার হল সুন্দর একটি সোনার হাঁস।

সমস্ত দিন কাঠ কেটে, সন্ধ্যার সময়ে, কাঠ আর সেই হাঁসটি নিয়ে হাঁদারাম বাড়ি চলেছে, আর খানিক দূরে যেতেই রাত হয়ে গিয়েছে। তখন সে ভাবল, "রাত্রে আর কোথায় যাব? একটা সরাইয়ে আজ থাকি।" এই ভেবে সে এক সরাইখানাতে গিয়ে

উঠল। সরাইওয়ালার দুই মেয়ে। সোনার হাঁস দেখে তাদের ভারি লোভ হয়েছে। দুজনেই মনে করছে, "ওর একটা পালক নিয়ে খোঁপায় পরব।"

রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়েছে, কেউ জেগে নেই, তখন সরাইওয়ালার বড় মেয়ে পা টিপে টিপে হাঁসের কাছে গেল। হাঁসের কাছে গিয়ে যেই সে তার একটা পালক ধ'রে আস্তে আস্তে টেনেছে, অমনি সর্বনাশ। পালক ত ছিঁড়ল না, লাভের মধ্যে তার হাতখানা হাঁসের গায়ে আটকে গেল। কিছুতেই সে হাত খুললে না। কাজেই সেখানে ব'সে থাকতে হোল। খানিক পরে তার বোনও পালক চুরি করতে এসেছে। এসে দেখে তার দিদি হাঁস নিয়ে কি করছে, অমনি সে তার কাছে গিয়ে হাত ধরে বলল, "বাঃ। তুমি একলা নেবে নাকি? আমাকে দাও?" ব'লে, আর সে তার হাত টেনে আনতে পারে না। সে তার দিদির হাতের সঙ্গে একেবাড়ে জুড়ে গিয়েছে। কাজেই সেই রকম হয়ে দু বোনকে সমস্ত রাত সেইখানে থাকতে হোল।

সকালে উঠে হাঁদারাম তার হাঁস নিয়ে বাড়ি চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে সরাইওয়ালার দুই মেয়েই হেঁচ্‌ড়ে হেঁচড়ে চলেছে। তাই দেখে সরাইওয়ালা ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এল, "আরে, কোথায় যাচ্ছিস? বুড়ো বুড়ো মেয়েরা এমনি ক'রে চলেছিস, লজ্জা করে না?" ব'লে যেই তার ছোট মেয়ের হাত ধরেছে, অমনি সেও তাদের সঙ্গে আটকে গেছে। হাঁদারাম কিন্তু সেদিকে চেয়েও দেখে না। সে তার হাঁস নিয়ে, আর হাঁসের সঙ্গে তিনজনকে নিয়ে, মনের সুখে বাড়ি চলেছে। সেইখান দিয়ে তখন এক গোয়ালা যাচ্ছিল। সে সরাইওয়ালাকে দেখে দৌড়ে এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "কোথায় যাচ্ছ? গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছ নাকি? আমার দুধের দাম দিয়ে গেলে না!" আর দুধের দাম। গোয়ালা তখন হাত নিয়েই ব্যস্ত ; তার হাত সরাইওয়ালার কাঁধে আটকে হাঁদারামের সঙ্গে চলেছে। গোয়ালার যে গোয়ালিনী ছিল, তার মেজাজ ভারি কড়া। সে ঘরের জানালা দিয়ে দেখলে, দুটি লোকের সঙ্গে দুটি মেয়ে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তার গোয়ালাও চলে যাচ্ছে। অমনি সে ঝাঁটা হাতে দৌড়ে বেরিয়ে এল, কিন্তু কিছু না বলে একেবারে গিয়ে গোয়ালার পিঠে দিয়েছে ঝাঁটা বসিয়ে আর অমনি গোয়ালার পিঠে ঝাঁটা আর ঝাঁটায় গোয়ালিনীর হাত আটকে গিয়ে, সেও হাঁদারামের সঙ্গে চলেছে।

সে দেশের যে রাজা, তাঁর মেয়ে কখনও হাসত না। তাই রাজা ঢোল পিটিয়ে দিয়েছিলেন, যে তাঁর মেয়েকে হাসাতে পারবে সে-ই তাকে বিয়ে করবে।

এই কথা শুনে হাঁদারাম তার হাঁস ঘাড়ে করে আর তার পিছনে সরাইওয়ালার বড় মেয়ে, তার পিছনে সরাইওয়ালার ছোট মেয়ে, তার পেছনে সরাইওয়ালা, তার পিছনে গোয়ালা আর ঝাঁটা হাতে গোয়ালিনীকে নিয়ে, একেবারে রাজার সভায় গিয়ে উপস্থিত হোল। তাদের সেই চমৎকার তামাশা দেখে সকলে, রাজামশাই নিজে, রানী আর তাঁর সখীরা সকলে একেবারে মাটিতে লুটোপুটি ক'রে হাসতে লাগলেন। আর, সকলের চেয়ে বেশী হাসল রাজার সেই মেয়ে।

ভরত দাশের গণ্ডার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মেদিনীপুরের মঙ্গলহাটা গ্রামের শ্রীযুক্ত ভরতকুমার দাশ দুটি গণ্ডার পুষেছেন বাড়িতে। এই সমস্ত খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। সেই খবরের চার দিকে কালো রুল দিয়ে বক্স আইটেম।

খবরটা পড়েই শিশুপাল টেবিল চাপড়ে বলল, দ্যাখ, দ্যাখ, এবারে মেদিনীপুর সব ব্যাপারে টেক্কা দিয়েছে। আর কিছু বলতে পারবি? এখন থেকে মেদিনীপুরের পা-ধোওয়া জল খাবি বুঝলি?

কালনেমি লম্বা খাতায় হিসেব মেলাচ্ছিল, সে বলল, উঁহু উঁহু, এখন বিরক্ত করিস না। ভুল হয়ে যাবে।

কিন্তু শিশুপাল তা শুনবে কেন? এত বড় একটা অস্ত্র পাওয়া গেছে, কালনেমিকে ঘায়েল করার, এ কখনো ছাড়া যায়? এসব খবর ঠাণ্ডা হতে দিতে নেই।

সে খবরের কাগজটা কালনেমির খাতার ওপর মেলে ধরে বলল, ওসব হিসেবটিসেব পরে হবে, আগে এটা পড়ে দ্যাখ।

কালনেমি হতাশ ভাবে দু হাত ছড়িয়ে বলল, এখনো টিফিনের সময় আসেনি, এর মধ্যেই তুই কাগজে পড়তে শুরু করে দিলি? মালিক দেখতে পেল ...

শিশুপাল বলল, এত বড় খবর বেরিয়েছে। আজ অফিস ছুটি দেওয়া উচিত। মেদিনীপুর হু-র-রে। থ্রি চিয়ার্স ফর মেদিনীপুর, হিপ্ হিপ্...

আশেপাশের অন্য টেবিল থেকেও অনেকে মুখ তুলে তাকাল। বটুকবাবু বলল, আবার দুজনে লেগেছে! তোমরা নিজেরা কাজ করবে না, আমাদেরও কাজ করতে দেবে না!

একটা ছোট বেসরকারি অফিস। দুটি মাত্র ঘরে মোট চোদ্দজন কর্মচারী বসে। জায়গায় এত টানাটানি যে দুজনকে এক টেবিলে বসতে হয়। কালনেমি আর শিশুপাল মুখোমুখি।

দুজনেরই তিরিশের কাছাকাছি বয়েস, দুজনেই গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু দুজনের কোনো ব্যাপারেই মতের মিল হয় না। শিশুপাল বসুর বাড়ি মেদিনীপুর জেলায়, আর কালনেমি মিত্রর বাড়ি চব্বিশ পরগণার ডায়মন্ডহারবারের কাছে। প্রথম দিন আলাপেই কালনেমি অবজ্ঞার সুরে শিশুপালকে বলেছিল, ও মেদিনীপুরিয়া? এর উত্তরে শিশুপাল বলেছিল, ডায়মন্ডহারবার মানে দখনো? ওখানকার লোকেরা খুব মামলাবাজ হয়।

সেই থেকেই তর্কের শুরু!

কালনেমি একবার ট্রেনে করে যাওয়ার সময় খড়গপুর স্টেশনে জল খেতে নেমেছিল।

কলের সামনে লম্বা লাইন, কালনেমি সবেমাত্র জলের তলায় হাত পেতেছে, এমন সময় ট্রেনের হুইস্‌ল বেজে উঠল। জল খাওয়াও হল না আর ছুটতে গিয়ে তার একপাটি চটি ছিঁড়ে গেল। সেই থেকেই মেদিনীপুরের ওপর কালনেমির খুব রাগ।

আর শিশুপালের এক মাসির বিয়ে হয়েছে কাকদ্বীপে। মাসি প্রায়ই বলেন, ঐ গুষ্টির কথা বলিস না। হাড়-মাস একেবারে ভাজা ভাজা করে খেল। তোদের যে একটু ডাকব একদিন, মাছ-দুধ খাওয়াব, তার উপায় নেই। সব সময়ই তো লাঠিলাঠি আর মামলা চলছে! সেইজন্য শিশুপাল চব্বিশ পরগনার লোকদের বড় হেয় মনে করে।

কাজের মাঝখানে যদি কোনক্রমে একবার চব্বিশ পরগনা কিংবা মেদিনীপুরের কোনো জায়গার নাম ওঠে, অমনি কাজ বন্ধ করে তর্ক শুরু করে দেয় দুজনে।

মজা দেখবার জন্য সহকর্মীরাও কেউ কেউ বলে ওঠে, যাই বল মেদিনীপুরের মতন জায়গা হয় না। এই তো দীঘার বেড়াতে গেলাম, কী ভাল কাটল, সেখানে কত মাছ খেলাম!

কালনেমি অমনি ফোঁস করে উঠে বলল, দীঘার মাছ? আরে ছ্যা ছ্যা! ঐ মাছের কোনো স্বাদ আছে নাকি? ইলিশ মাছ খেতে হলে যেতে হয় ডায়মন্ডহারবার। চিংড়ির জন্য বসিরহাট। পার্শে খেতে হলে কাকদ্বীপ। সব মাছের ভেড়িই তো চব্বিশ পরগনায়!

শিশুপাল অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, মেদিনীপুরে মাছের জন্য ভেড়ি লাগে না। যে-কোনো গ্রামেই পুকুর ভর্তি মাছ। মেঘ ডাকলে আমাদের গ্রামের রাস্তা দিয়ে কৈ মাছ হেঁটে বেড়ায়। আর মুর্গী? দশ টাকায় এক জোড়া মুর্গী আর কোথাও পাওয়া যায়?

এই রকম প্রায় রোজই চলে।

গত সপ্তাহে খবরের কাগজে একটা ছোট খবর বেরিয়েছিল। টিফিনের সময় সেই খবরটা পড়তে পড়তে ওদের সহকর্মী রমেশবাবু জিজ্ঞেস করেছিল, কাঁকড়াঝোড় জায়গাটা কোথায়?

শিশুপাল অমনি বলে উঠেছিল, মেদিনীপুরে! ওখানে দুর্দান্ত সুন্দর একটা জঙ্গল আছে।

রমেশ বলেছিল, আমি তো আগে নাম শুনিনি সেই জঙ্গলের। সেখানে আবার বাঘও আছে। এই দেখুন কাগজে বেরিয়েছে। দুটো বাঘ আদিবাসীদের গ্রামে এসে ছাগল ধরে নিয়ে গেছে।

সেই শুনে কালনেমি অট্টহাসি করে বলেছিল, কাঁকড়াঝোড় আবার একটা জঙ্গল, সেখানে আবার বাঘ! দেখো গিয়ে বাঘ নয় বনবিড়াল! কার সামনে জঙ্গলের কথা বলছে! আমার বাড়ির পাশে সুন্দরবন, সেখানকার রয়েল বেঙ্গল টাইগাররা ছাগল-টাগল ছুঁয়েও দ্যাখে না, মানুষ ধরেটরে ডিনার করে!

সব সহকর্মীই অবশ্য কাঁকড়াঝোড়ের তুলনায় সুন্দরবনকে সমর্থন করে। শিশুপাল মিনমিন করে বলার চেষ্টা করছিল, ঐ কাঁকড়াঝোড়ে মাঝে মাঝে হাতিও দেখা যায়।

সুন্দরবনে তো হাতি নেই।

কিন্তু কাঁকড়াঝোড়ে সত্যিই হাতি আছে কিনা সে কথা কাগজে ছাপা হয়নি, সুতরাং কোনো প্রমাণ নেই। সেইজন্য শিশুপালের দাবি অন্যরা মেনে নিতে রাজি হয় না।

শিশুপাল সেইজন্য একটু মনমরা হয়েছিল, আজ আবার সে জব্বর খবর পেয়ে গেছে! মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার! এই সেই গণ্ডার!

শিশুপালের চ্যাঁচামেচি শুনে বটুকবাবু-রমেশবাবুরাও হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাগজটার ওপর। সত্যিই তো জবর খবর। মেদিনীপুরে গণ্ডার। একটা নয় দুটো। তাও আবার পোষা। কে এই ভরতকুমার দাশ।

কালনেমি মিনমিন করে বলল, ভুল লিখেছে। খবরের কাগজে অনেক ভুল খবর বেরোয়!

শিশুপাল বলল, আরে, তোদের ঐ সুন্দরবনের অসত্য বাঘগুলোর খবরও তো কাগজেই ছাপা হয়। নইলে, সে সব বাঘ কি কেউ চোখে দেখেছে? আমাদের মেদিনীপুরের মানুষ গণ্ডারকে পোষ মানাতে পারে। যে কেউ ইচ্ছে করলে দেখে আসতে পারে!

কালনেমি বলল, হুঁ! গণ্ডার আবার কখনো পোষ মানে? তা হলে গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে ছাপা হয়ে যেত। তোদের ঐ বাংলা কাগজের খবর আমি বিশ্বাস করি না। আমরা বাড়িতে ইংলিশ নিউজ পড়ি। বাড়িতে গিয়ে মিলিয়ে দেখব।

বটুকবাবু সঙ্গে সঙ্গে অফিসের বয়কে ডেকে বললে, ওরে বংশী, পাশের অফিস থেকে ইংরিজি কাগজখানা একটু ধার চেয়ে আন তো!

সেই কাগজ আনা হল। হ্যাঁ, ইংরিজি কাগজেও বেশ গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে। দুখানা রাইনোসেরাস, পাশে আবার ব্র্যাকেট দিয়ে লেখা ডমেস্টিকেটেড।

শিশুপাল টেবিল চাপড়ে বলল, এবার! এবার! চব্বিশ পরগনার থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল তো!

রমেশবাবু একটু সন্দেহ সৃষ্টির জন্য বলল, অবশ্য দাদার ভুল হতে পারে। মঙ্গলহাটা গ্রামটা যদি জলপাইগুড়িতে হয় তা হলে আর অবিশ্বাসের কিছু নেই। ওখানে তো গণ্ডার আছেই।

শিশুপাল চোখ গরম করে বলল, দু-দুটো কাগজে ভুল ছাপা হবে? তাছাড়া, জলপাইগুড়িতে কোনোদিন গণ্ডার পুষেছে? ওরকম হিম্মৎ মেদিনীপুরের লোক ছাড়া আর কারুর হয় না।

বটুকবাবু বলল, যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই বাচ্চা গণ্ডার।

শিশুপাল বলল, চলুন এই শনিবার আমার সঙ্গে চলুন মেদিনীপুর, আমি খরচা দেব, নিজের চোখে দেখে আসবেন, বাচ্চা না বড়!

টিফিনের সময় কালনেমিকে দেখা গেল খবরের কাগজের অফিসে টেলিফোন করতে। ইংরিজি কাগজের লোকদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলতে হবে, সে ফোন করল

বাংলা কাগজের অফিসে।

কিন্তু প্রথম কথাতেই তাকে ধাক্কা খেতে হল। যে প্রথম টেলিফোন ধরলে, সে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ, বলুন, কী চাই?

কালনেমি বলল, দেখুন আজকের একটা খবর সম্পর্কে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই...

ওপাশের লোকটি বলল, কী খবর? কার খবর? কোথাকার খবর? লোকাল না ফরেন? রিপোর্টিং না এজেন্সি ম্যাটার? বলুন, বলুন!

ঘাবড়ে গিয়ে কালনেমি ফোন রেখে দিল।

শিশুপাল বললে, আরে আরে এ যে দেখছি ফোনও করতে পারে না। দ্যাখ আমি করছি।

সে ডায়াল ঘুরিয়ে কানেকশন পাবার পর নিজেই প্রথমে জিজ্ঞেস করল, ও মশাই, গণ্ডারের ব্যাপারটার কথা জিজ্ঞেস করছিলুম...

অন্য দিক থেকে বলল, গণ্ডার! এটা কি চিড়িয়াখানা ভেবেছেন নাকি? আজকাল যা হয়েছে টেলিফোনের ব্যাপার, সব সময় রং নাম্বার!

সেই লোকটি লাইন কেটে দিল।

বটুকবাবু বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও আমার কাকার এক শালা ঐ কাগজে কাজ করে। তার কাছ থেকে একেবারে ভেতরের খবর জেনে দিচ্ছি!

অপারেটরকে অনেক বুঝিয়ে বটুকবাবুর কাকার শালার সন্ধান পাওয়া গেল। সব শুনে তিনি বললেন, গণ্ডার? সেরকম কোনো খবর পেয়েছিলে বুঝি? কে বলল?

বটুকবাবু বলল, আপনাদের আজকের কাগজেই তো প্রথম পাতায় বেরিয়েছিল, দেখেননি?

কাকার শালা বলল, ওসব তো নিউজের ব্যাপার। আমরা তো কিছু জানি না। তবে দাঁড়াও তোমাকে আর একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি। তুমি ধরে থাকো।

বটুকবাবুকে অনেকক্ষণ ধরে থাকতে হল। টিফিনের সময় ফুরোতে আর দেরি নেই। নিউজ পেপারের লোক নিউজের খবর রাখে না, শুনে সবাই অবাক। কাগজের লোক নিজেদের কাগজও পড়ে না।

একটু বাদে আর একজন লোক ধরে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ, বলুন গণ্ডার সম্পর্কে কোনো খবর দেবেন? কলকাতার রাস্তার গণ্ডার বেরিয়েছে?

বটুকবাবু বলল, আজ্ঞে, না, না আমি সে কথা বলিনি। বলছিলাম কী, আজকের কাগজে মেদিনীপুরে যে গণ্ডারের খবর বেরিয়েছে, সেটা কি সত্যি?

লোকটি চটে গিয়ে বলল, সত্যি না কি আমরা মিথ্যে খবর ছাপাব? আপনি কে মশাই, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন?

না, না, সে কথা বলছি না। আমরা যদি ঐ গণ্ডার দেখতে যাই, দেখতে পাব তো?

আপনারা গণ্ডার দেখতে পাবেন কি পাবেন না, তা আমরা কী জানি! লোককে

গণ্ডার দেখানো কি আমাদের দায়িত্ব। গণ্ডার দেখার অত গরজ থাকে, তা হলে অতদূরে মেদিনীপুরে যেতে হবে কেন, আলিপুরে চলে যান।

ঐ গণ্ডারের খবর যিনি লিখেছেন, তিনি নিজের চোখে দেখেননি?

আরে মশাই, সব কিছু নিজের চোখে দেখে লিখতে গেলে তো আমাদের এক হাজারটা চোখ থাকা দরকার। তবে ঐ খবরটা আমরা অনেক চেক করে তারপর ছেপেছি। দু-তিন জায়গায় খোঁজ নেওয়া হয়েছে, সব জায়গাতেই মিলেছে। লাইভ্স্টক সেনসাস হচ্ছে তো, লাইভস্টক সেনসাস কাকে বলে জানেন আশা করি, গৃহপালিত পশু, যেমন গরু-মোষ-ছাগল-ভেড়া এইসব গোনাগুণতি হচ্ছে, তার মধ্যে ঐ দুটি পোযা গণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে! আশ্চর্য ব্যাপার, এ দেশে কিন্তু কেউ জলহস্তী পোযে না!

টেলিফোন রেখে দিয়ে বটুকবাবু যেই বলল খবরের কাগজের লোক নিজের চোখে দেখে লেখেনি, অমনি কালনেমি লাফিয়ে উঠল, গাঁজাখুরি। ওদের নামে মামলা আনা যায়!

শিশুপাল আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলেন দোখনের কাণ্ডটা। এই যে লিখেছে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট, মহকুমা হাকিম বলেন...এসব কখনো মিথ্যে হতে পারে? ঠিক আছে, এই শনিবার কে কে যাবে মেদিনীপুর? আমি খরচা দেব! নিজের চোখে দেখিয়ে দেব!

এরকম সুযোগ কজন ছাড়ে। রমেশবাবু আর বটুকবাবু দজনেই রাজি হয়ে গেল ওদের সঙ্গে যেতে। বাজি ধরা হল গণ্ডার নিয়ে যে-পক্ষই জিতুক একশ টাকা খাওয়াবে।

হাওড়া স্টেশনে এসে কালনেমি একসময় আপত্তি জানাল, সে খড়গপুর হয়ে যাবে না। কিন্তু তার আপত্তি টিকল না। খড়গপুরকে বাদ দিয়ে কি মেদিনীপুর যাওয়া যায়? শিশুপাল চেঁচিয়ে বলল, ভীতু! ভীতু!

মঙ্গলহাটা গ্রামে পৌছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল! ভরতকুমার দাশের নাম জিজ্ঞেস করতেই সবাই চিনতে পারল এক বাক্যে। কয়েকজন এগিয়ে এসে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলে যান। এই রাস্তার একেবারে শেষ বাড়িটা। মস্ত বড় বাগান, আর পুকুর আছে দেখবেন।

তাদের ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি।

বটুকবাবু ফিসফিস করে শিশুপালকে জিজ্ঞেস করল, এদের কাছে জানতে চাইব নাকি?

শিশুপাল বললে, কিছু দরকার নেই। এতদূরে এসে পড়েছি, একটু পরেই তো চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে!

রমেশবাবু বললে, তা ঠিক। কিন্তু কথা হচ্ছে, ঐ ভরত দাশ লোকটা কি পোযা গণ্ডারদের ছেড়ে রাখে না খাঁচায় রাখে? আমার বড্ড কুকুরের ভয়!

শিশুপাল প্রায় তেড়ে উঠে বলল, আপনি তো মশাই আচ্ছা লোক। গণ্ডারের সঙ্গে

কুকুরের তুলনা করছেন? গণ্ডার কি কুকুরের মতন ঘেউ ঘেউ করে?

রমেশবাবু বলল, গণ্ডার কী ভাবে ডাকে তা আমি জানিই না। তবে আমি আপনাদের পেছনে থাকব!

ভরত দাশের বাড়িটি বেশ বড়। সামনে অনেকখানি বাগান, তাতে আবার গেট। ভেতরে চৌকো চত্বরের চারদিকে চারখানা ঘর। তার মধ্যে দুখানা খড়ের চালের। বাড়ির পেছন দিকেও অনেক গাছপালা! বেশ অবস্থাপন্ন লোক। এইরকম লোকেরই গণ্ডার পোষা মানায়।

চৌকো চত্বরটার মোড়ায় বসে একজন মাঝবয়েসী খালি গায়ে মানুষ, হুঁকো টানছেন। এই দলটি ভেতরে এসে জিজ্ঞেস করল, ভরতকুমার দাশ আছেন নাকি?

হুঁকো টানা থামিয়ে লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

বটুকবাবু বলল, কলকাতা থেকে।

শুনেই লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বিগলিতভাবে বলল, ও কলকাতা থেকে? আসুন, আসুন, এই কে আছিস রে, চেয়ারটা নিয়ে আয়। চায়ের জল বসা। লক্ষ্মীকে দেখতে এসেছে! লক্ষ্মীকে সাজতে বল্।

বটুকবাবুরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। বাড়ির ভেতর থেকে একজন লোক ওদের জন্য চেয়ার বয়ে আনলেন। দু-তিনজন মহিলাও উঁকি মারলেন।

হুঁকো হাতে লোকটি বলল, বসুন, বসুন, আসতে কোনো কষ্ট হয়নি তো? আমি ভেবেছিলুম, আগামীকাল আসবেন। খবর দিলে আমি স্টেশনে লোক পাঠাতুম।

শিশুপাল বলল, আজ্ঞে, আমাদের পরিচয় দিয়ে নিই। আমি শিশুপাল বসু, ইনি বটুকেশ্বর দত্ত, ইনি রমেশচন্দ্র নাগ আর ঐ একজন হচ্ছে কালনেমি মিত্তির। আমরা এসেছি ভরতকুমার দাশের সঙ্গে দেখা করতে।

লোকটি বলল, আমিই সেই অধম। আমার মেয়ের নামই লক্ষ্মী। একটু বসুন। লক্ষ্মীকে সাজিয়েগুজিয়ে নিয়ে আসছি।

বটুকবাবু বলল, লক্ষ্মী...মানে...আমরা তো আপনার মেয়েকে দেখতে আসিনি!

আমার মেয়েকে দেখতে আসেননি! তা হলে আপনারা...

আমরা...মানে...আপনার বাড়ির গণ্ডার দুটো দেখতে এসেছি, মানে দূর থেকে এক ঝলক দেখলেই চলবে, একটা বাজি হয়েছে কিনা।

ভরতকুমার প্রথমে চোখ গোল করে বলল, আপনারা বড়দা সাঁতরার কাছ থেকে আসেননি? আমার মেয়েকে দেখতে আসেননি? আপনারা গণ্ডার দেখতে...ওঃ হোঁ-হো-হো-হো...

ভরতকুমার এমন হাসি শুরু করলেন যে সারা পাড়া যেন কেঁপে গেল একেবারে। হাসির চোটে হাত থেকে পড়ে গেল হুঁকো। প্রথমে তিনি বসে পড়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন। তারপরে হাসতে হাসতে একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি!

এরা চারজন একেবারে হতভম্ব। ভরতকুমার দাশের হাসি আর থামছেই না। লোকের যেমন কাশির রোগ থাকে, এর বোধহয় তেমন হাসির রোগ। বটুকবাবু বলল, চল কেটে পড়ি। রমেশবাবু বলল, বাজির কিছু ফয়সালা হল না যে। শিশুপাল বলল, ঐ কালনেমি ব্যাটাই হেরেছে।

কালনেমি মাটিতে বসে পড়ে ভরতকুমারের হাত ধরে ব্যাকুলভাবে বলতে লাগল, ও দাদা, ও দাদা শুনুন। শুনুন আমিও রামায়ণের ক্যারেকটার, আপনিও রামায়ণের ক্যারেকটার। আমরা দুজনে এক দলের। ঐ শিশুপালটা মহাভারত আরও বড় বইয়ের ক্যারেকটার বলে গর্ব করে। কিন্তু ওর যে মুণ্ডু উড়ে গিয়েছিল, সেটা মনে রাখে না। আপনি শুধু একবার বলে দিন তো, আপনার বাড়িতে গণ্ডার নেই। ওর মুণ্ডুটা আবার হেঁট হয়ে যাক।

শিশুপালও অন্যদিকে বসে পড়ে বলল, ও ভরতদাদা, ও ভরতদাদা, আপনিও মেদিনীপুর, আমিও মেদিনীপুর। আমরা হলুম গে আত্মীয়, কী বলুন? একবার চট করে গণ্ডার দুটো দেখিয়ে দিন তো। একটা দেখালেও চলবে।

ভরতকুমার এবারে হাসি থামিয়ে উঠে বসলেন। মুখ মুছলেন গামছা দিয়ে। তারপর বললেন, দেখবেন, দেখবেন, দেখুন তা হলে।

সুর করে ডাকলেন, আয় তো রে আমার কার্তিক। আয় তো রে আমার গণেশ। আয় আয় আয়।

অমনি গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে প্যাঁক প্যাঁক ডাকতে ডাকতে দুটো বেশ বড় রাজহাঁস চলে এল উঠোনে।

ভরতকুমার বললেন, আমি মিছে কথা বলি না। এখনকার ছেলেছোকরারা ইংরিজি জানে না, আমি কী করব, বলুন? থানা থেকে লোক এল আমার বাড়ির গরু-ছাগল গুনতে। আমি সব শেষে বললুম, আই হ্যাভ টু গ্যান্ডারস। আমি কি কিছু ভুল বলেছি? তারা যদি মানে না বুঝে গণ্ডার লিখে নেয়...

কালনেমি লাফাতে লাফাতে বলল, নেই, গণ্ডার নেই, নেই!

শিশুপাল তার ঘাড় চেপে ধরে বলল, ওরে ভাল করে চেয়ে দ্যাখ। গণ্ডার না হল তো কী হয়েছে? এমন রাজহাঁস জন্মে দেখেছিস। তোদের সুন্দরবনে তো সব পাতিহাঁস!

হরিপদর বিপদ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

হরিপদ খুব বিপদে পড়েছে। সবসময় মুখ ভার। খেতে-শুতে চলাফেরা করতে সুখ নেই। ঘুমিয়ে স্বস্তি নেই। তার নাকি লেজ গজাচ্ছে।

হ্যাঁ, লেজ। পিঠের দিকে শিরদাঁড়ার নীচে যে তেকোণা হাড়টা আছে, সেখানেই ব্যাপারটা ঘটছে।

সবচেয়ে মুশকিলটা হল, কথাটা কাকেও বলা যাচ্ছে না। এইতে হরিপদ আরও মনমরা হয়ে পড়েছে। বিপদ-আপদ ঘটলে অন্যকে জানালেও খানিকটা সুখ পাওযা যায়, সে সাহায্য করুক বা না করুক। কিন্তু এমন গুরুতর কথা বলতেই যে লজ্জা করে। তাছাড়া বললেও কি কেউ তার লেজ গজানোটা ঠেকাতে পারবে?

প্রথমে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল এভাবে।

এক সকালে হঠাৎ হরিপদ টের পেয়েছিল, শিরদাঁড়ার নীচের তেকোণা হাড়াটায় কেমন একটা অস্বস্তি, আর চুলকোনি।

সেই যে শুরু হল, চুলকোনি চলতেই থাকল। হরিপদ সারাক্ষণ সেখানে হাত দেয়। শেযে তিতিবিরক্ত হয়ে পাড়ার ডাক্তারবাবুর কাছে গেল।

ডাক্তারবাবু একটা ওযুধ লাগাতে দিলেন বটে, কিন্তু কাজ হল না। তখন হরিপদ গেল তারক কবরেজের কাছে। হরিপদ বরাবর ডাক্তারের চেয়ে কবরেজদেরই বিশ্বাস করে।

কবরেজমশাই আতস কাচ দিয়ে জায়গাটা দেখে গম্ভীর মুখে বললেন— হুঁ!

হরিপদ বলল— কী হয়েছে কবরেজমশাই?

কবরেজমশাই বললেন— আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ওই হাড়টাকে বলে পিকচঞ্চু অস্থি। কেন বলে জানো? ওটা পিক অর্থাৎ কোকিলের চঞ্চুর মতো। চঞ্চু মানে কি জানো?

হরিপদ মাথা নাড়াল।

— চঞ্চু মানে ঠোঁট। কোকিলের ঠোঁট দেখেছে? দেখনি? তুমি মহামুর্খ।

হরিপদ মনে মনে রাগ করলেও চুপ করে থাকল। সে তত মুর্খ নয়। গরিব লোকের ছেলে বলে পয়সার অভাবে বেশিদুর পড়াশোনা হয়নি। তবে যেটুকু হয়েছে, তাই বা মন্দ কী? সে এখন ফার্গুসন কোম্পানির অপিসে ছোটসাহেবের খাস বেয়ারা। ছোটসায়েব তাকে খুব স্নেহ করেন। কত বকশিশ দেন।

তারক কবরেজ বলেছিলেন— দেখ বাপু, তোমার পিকচঞ্চু অস্থিতে যা দেখছি, লক্ষণ বড় ভাল নয়। তুমি কি কখনও হনুমান মেরেছিলে?

হরিপদ অবাক হয়ে বলেছিল— হনুমান? না তো।

— তাহলে নিশ্চয়ই পাটকেল ছুঁড়েছিলে।

হরিপদ ছেলেবেলায় গ্রামে থাকত। তাদের গ্রামে হনুমান ছিল অনেক। সে আর সব ছেলেদের সঙ্গে জুটে হনুমান তাড়াতে ঢিল ছুঁড়ত বটে।

হরিপদ মাথা চুলকে বলেছিল— হনুমানের কথা কেন কবরেজমশাই?

তারক কবরেজ গলার স্বর চাপা করে বলেছিলেন— বলছি কি সাধে? তোমার মতো ঠিক একই রোগ হয়েছিল নরহরি উকিলের। সেও হনুমানকে ঢিল ছুঁড়ে এই বিপদ বাধিয়েছিল। শেষে আদালতে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছিল বেচারীকে।

হরিপদ ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন— কেন, কেন?

তারকবাবু বলেছিলেন— তুমি মূর্খ। লেজ নিয়ে কেউ আদালতে যেতে পারে?

— লেজ? হরিপদ ভ্যাবাচাকা একেবারে।

— হ্যাঁ, লেজ। হনুমানের লেজ। তারক কবরেজ বলেছিলেন। সাড়ে তিন ফুট লেজ কম কথা নয়। তাকে গুটিয়ে যত ছোটই করো, পেছনটা ফুলে থাকবে।

তা তো থাকবেই। কিন্তু নরহরি উকিলের লেজ গজিয়েছিল বলে হরিপদরও গজাবে নাকি? হরিপদ কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল—আমারও কি লেজ গজাবে নাকি কবরেজমশাই?

— হুঁ, গজাবে।

— ওরে বাবা! লেজ নিয়ে ছোটসায়েবের কাছে যাব কেমন করে? হরিপদ প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। আর রাস্তায় নামলেই ছেলেপুলেরা পেছনে লাগবে।

তারক কবরেজ ফ্যাঁচ করে হেসে বলেছিলেন— তা তো লাগবেই। নরহরি উকিল কি সাধে আদালতে যাওয়া ছেড়েছিল? থাক্ গে, যা বলছি, শোন। এই লেজ গজানো রোগের একটাই ওষুধ আছে। কিন্তু সে-ওষুধ যোগাড় করা বড় ঝকমারি। তেত্রিশ টাকা তেত্রিশ পয়সা খরচ হবে।

হরিপদ তাতে পিছপা নয়। তিনশো তেত্রিশ বললেও রাজি হত। ওরে বাবা! মানুষের লেজ গজানোর মতো বিপদ আর কী থাকতে পারে?

তেত্রিশটাকা তেত্রিশ পয়সা দিয়ে এসেছিল হরিপদ। তারপর কথামতো দিন তিনেক পরে গেল কবরেজের কাছে।

তারক কবরেজ বললেন— বাপ্ স! তোমার লেজ গজানো ঠেকাবার ওষুধ আনতে আমার যা কষ্ট গেল, বলার নয়। হুতুমপুরের নাম শুনেছ? সেখানে বনজঙ্গল খুঁড়ে নিয়ে এলুম। তারপর বটিকা তৈরি করলুম। মলম বানালুম। রোজ রাত্তিরে শোবার সময় একটা করে বড়ি খাবে। আর এই মলমটা মাখাবে পিকচঞ্চু হাড়ে। একমাস পরে ফের ওষুধ দেব। ......

তারপর দিনসাতেক ওষুধ খেয়েছে এবং মলম লাগিয়েছে হরিপদ। তবু সেইরকম চুলকাচ্ছে। তার ওপর কী একটা ঠেলে বেরোচ্ছেও যেন। ফোঁড়ার মতো। ভয়ে ভয়ে সে ছুঁয়ে টের পেতে চায়. লোমটোম আছে নাকি। ঠেলেওঠা জিনিসটা কেমন খসখস করছেও

যেন। তাহলে কি ওষুধে কাজ হচ্ছে না?

আপিসে তাকে দেখে ছোটসাহেব বলেন— কী হরিপদ? অসুখবিসুখ করেছে নাকি?

হরিপদ আসল কথাটা তো বলতে পারে না। শুধু বলে— একটু জ্বরমতো হয়েছে স্যার!

— তাহলে অপিসে এসেছ কেন? ছুটি নাও।

শেষ পর্যন্ত ছুটিই নিতে হল হরিপদকে। ততদিনে তার সেই মারাত্মক জিনিসটা ইঞ্চিটাক উঁচু হয়ে ঠেলে বেরিয়েছে। কবরেজের কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাদের গ্রামে একজন কবরেজ আছেন বটে! গ্রামের কবরেজ বলে তারকবাবুর মতো নামডাক নেই। কিন্তু হাজার হলেও হরিপদ গ্রামের মানুষ। যত্ন করে দেখবেন বইকি। হরিপদ সেদিনই গ্রামে চলে গেল। ......

হরিপদর এক পিসি ছাড়া গ্রামের বাড়িতে আর কেউ নেই। পিসিকে সে মাসে মাসে টাকা পাঠায়। পিসি তো হরিপদকে দেখে ভারি খুশি। কিন্তু ওর হাবভাব দেখে ভড়কে গেল। বলল— ও হরে, তোর কী হয়েছে? তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

হরিপদ হাসবার চেষ্টা করে বলল— ট্রেনে-বাসে এসেছি তো, তাই বড্ড ক্লান্ত। আচ্ছা পিসিমা, গাঁয়ে আজকাল আর হনুমান আসে?

পিসি বলল— হনুমান? কোথায় হনুমান? আর কি সে রামরাজত্ব আছে রে? সব হনুমান কোথায় পালিয়েছে। আর শুধু হনুমান কেন, আজকাল শেয়াল-টেয়ালও আর নেই। এমন কী, আগের মতো পাখিও দেখতে পাইনে!

— কেন, কেন?

— পাপে। মানুষের পাপে। বুঝলি হরে? মানুষের এত পাপ যে পাখ-পাখালি জন্তু-জানোয়ার সব্বাই মানুষকে ঘেন্না করে পালিয়ে গেছে!

হরিপদ গম্ভীর হয়ে বলল— তা যাই বলো পিসিমা, হনুমান পালিয়েছে বলেই না তোমার মাচানে অত লাউ শশা কুমড়ো ফলে রয়েছে! হনুমান থাকলে সব খেয়ে ফেলত না কি?

অমন পিসি মুড়ো ঝাঁটা তুলে বলল— হুঁ, খেয়ে ফেললেই হল। ঝাঁটা ছুঁড়ে মারব না মুখে?

হরিপদ বলল — আচ্ছা, ধরো কথার কথা বলছি, যদি আমি— মানে এই হরে হঠাৎ হনুমান হয়ে যাই ......।

এটুকু শুনেই পিসি খিলখিল হেসে বলল— ওরে, থাম থাম। তুই হনুমান হবি কী রে হরে? বালাই ষাট! তুই কেন মুখপোড়া হনুমান হবি, শুনি?

হরিপদ বলল— ধরো, যদি হই?

পিসি একটু ভেবে বলল— তুই হনুমান হলে একটার বেশি শশা খাসনে কিন্তু! তার বেশি খেলে আমার রাগ হবে।

— তাই হবে। তা পিসি, আমি যদি মুখ ভেংচাই তোকে?

পিসি ফের খিলখিল করে হাসল। তারপর বলল— আমিও ভেংচাব। শুধু কি ভেংচাব? সেই ছড়াটাও গাইব ঃ

এই হনুমান কলা খাবি?

জয়-জগন্নাথ দেখতে যাবি?

হরিপদ বলল— আমি যদি রাতারাতি হনুমান হয়ে যাই, তাহলে কিন্তু ভড়কে যেও না পিসি। গাঁয়ে তো আর হনুমান নেই। কাজেই যদি কোনও হনুমান হঠাৎ দেখতে পাও, জেনো সে তোমার ভাইপো এই হরে। বুঝলে তো?

পিসি এতক্ষণে একটু অবাক হলে বলল- — তা ও হরে, এসব কথা কেন বলছিস বাবা? বালাই যাট! তুই হনুমান হতে যাবি কোন্ দুঃখে?

হরিপদ আমতা হেসে বলল— কিছু বলা যায় না পিসিমা।

— থাম হতচ্ছাড়া ছেলে! আয় খাবি আয়!

হরিপদ চুপচাপ বাড়ির উঠোনে বিশাল নিমগাছটার দিকে তাকিয়ে রইল। যদি লেজটা গজিয়ে যায়, সে তো হনুমান হয়ে যাবে। তখন ওই গাছে গিয়ে উঠবে। কিন্তু গাছটায় নাকি ভূত আছে। ছেলেবেলায় সে সেই ভূতটার ভয়ে সন্ধ্যাবেলা গাছটার দিকে তাকাতেই পারত না। কপালের ফেরে যদি হনুমান হয়ে ওঠে, ভূতটার সঙ্গে ভাব করে নিতেই হবে।

পিসি রান্নাঘরে রান্না করছে। ঠিক দুপুরবেলা। হরিপদ পাশের পুকুরে গেছে স্নান করতে। পুকুরঘাটে ভিড় জমে আছে। হঠাৎ ভিড় থেকে একটা ছোট্ট ছেলে চেঁচিয়ে উঠল— ওরে! ওই দেখ, একটা হনুমান!

আর সব ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল ঃ এই হনুমান কলা খাবি? জয়-জগন্নাথ দেখতে যাবি?

হইচই পড়ে গেল। গাঁয়ে কতকাল কেউ হনুমান দেখেনি। হঠাৎ পুকুরপাড়ে একটা হনুমান দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠল— হনুমান এসেছে! হনুমান এসেছে!

হরিপদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর টের পেল, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। পিঠ টনটন করছে। সে সামনে দু'হাত নামিয়ে ঝুঁকল। তারপর দেখল— সর্বনাশ! তার মানুষের শরীরটা তো আর নেই! সারা গা ধূসর লোমে ঢাকা। আর পিঠের দিকে সেই 'পিকচঞ্চু'তে বিঘৎখানেক লেজ গজিয়ে গেছে।

মরিয়া হয়ে হরিপদ চেঁচিয়ে উঠল— উঁপ।

আরও সর্বনাশ! মানুষের ভাষাটাই যে আর বেরুচ্ছে না। হরিপদ যত কথা বলার চেষ্টা করছে, উঁপ আঁপ খ্যাঁকোর খ্যাঁক ছাড়া আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

এবার ছেলের পাল ঢিল ছুঁড়তে শুরু করল। হরিপদ রাগে দুঃখে মুখ ভেংচাতে ভেংচাতে অশ্বত্থ গাছটায় গিয়ে উঠল।

তাতেও কি রেহাই আছে? কে চেঁচিয়ে বলল— ওঁরে! ভুঁইয়ের কুমড়োগুলো সব

শেষ করে ফেলবে রে! বন্দুকটা নিয়ে আয় তো।

হরিপদ বিপদ টের পেল। আগের যুগ আর নেই। আজকাল মানুষ এত ধর্ম মানে না। হনুমান ফসল নষ্ট করে। কাজেই দরকার হলে বন্দুক ছুঁড়ে বসবে হয়তো!

ভয় পেয়ে হরিপদ তাদের বাড়ির দিকে দৌড়ুল।

কিন্তু যেই পাঁচিলে উঠে হনুমানের ভাষায় বলেছে— ও পিসিমা! অমনি পিসি ভেংচি কেটে এবং মুড়ো ঝাঁটা দেখিয়ে সেই ছড়া গাইতে শুরু করেছে।

রাগে-দুঃখে হরিপদ ভাবল, নিকুচি করেছে গাঁয়ের লোকের! তার চেয়ে বরং কোনও রকমে যদি কলকাতা চলে যায় ফের, তাহলে অন্তত আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়ে ঢুকতে পারলে আর ভয় নেই। অন্তত পেটের খাওয়াটা জুটবে।

হরিপদ তো আর মানুষ হয়ে নেই যে বাসে চাপবার চেষ্টা করবে। সাত মাইল নাক বরাবর মাঠ বনবাদাড় পেরিয়ে সে রেল স্টেশন পৌঁছুল। প্লাটফর্মে একটা ঝাঁকড়া গাছে পাতার আড়ালে বসে ট্রেনের অপেক্ষা করতে থাকল।

ট্রেনটা এলে সে উঁপ করে ছাদে চড়ে বসল। তারপর আর কী? আর হাওড়া স্টেশনে পৌঁছুনো ঠেকায় কে?

কিন্তু বিপদ হল ট্রেন থেকে নামার পর।

হাজার হাজার লোক সবসময় স্টেশনে থইথই করছে। তাদের মধ্যে একটা হনুমান গিয়ে ঢুকলে কী হুলস্থুল না হবে! তাড়া খেয়ে হরিপদ সোজা উঠে পড়ল হাওড়া ব্রিজের মাথায়।

কলকাতা শহরে এ একটা ঘটনার মতো ঘটনা। এতকাল হাওড়া ব্রিজের মাথায় পাগলরা চড়ে ভেংচি কাটে। আজ কিনা একটা হনুমান চরে ভেংচি কাটছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক দাঁত বের করে ভেংচি কাটছে আর কাটছে।

খবর পেয়ে খবরের কাগজের লোকেরা এল। ক্যামেরা এল। টিভি-র লোকেরাও এল। হরিপদর ছবি উঠতে থাকল ক্যামেরায়। কাল প্রথম পাতায় ছাপা হবে কাগজে। সন্ধের পর টিভিতে দেখানো হবে। এখন খালি হরিপদর সান্ত্বনা, মানুষ হয়ে তো এমন নাম ছড়াত না, ছবিও ছাপা হত না। ভাগ্যিস, লেজ গজিয়ে হনুমান হতে পেরেছে!

কিন্তু তারপর বিপদ এল।

দমকল আর চিড়িয়াখানার লোকেরা এসে গেছে খবর পেয়ে। হরিপদ একেবারে ডগায় গিয়ে কুঁকড়ে বসে আছে।

দমকলের লোকদের কত ফিকির আছে। খপ করে তাকে একটা খাঁচাকলে ঢুকিয়ে ফেলল এবং লম্বা মইয়ের সাহায্যে নামিয়ে আনল। তারপর গাড়ি চালিয়ে সোজা চিড়িয়াখানায় তুলল।

যাক্, বাঁচা গেল। নিরাপদে থাকা যাবে। খাওয়া-দাওয়াও মিলবে। লোকেরা খাঁচার কাছে এলে মনের সুখে ভেংচি কাটা যাবে। হরিপদ খুশি।

কিন্তু সুখ তার বরাতে নেই। যেই না তাকে হনুমানের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, অমনি হনুমানগুলো যেন চমকে উঠেছে।

হরিপদ কোণায় বসে পিটপিট করে তাকিয়ে রইল। ওদের চোখে কেমন একটা সন্দেহ ফুটে বেরুচ্ছে যেন। সবচেয়ে ধেড়েটা অর্থাৎ পালের গোদা গম্ভীর মুখে হঠাৎ খ্যাঁক করে একটা ধমক দিল।

হরিপদর এখন হনুমানের ভাষা বুঝতে অসুবিধে নেই। গোদাটা তাকে বলছে— এই! তুই কোন্ ব্যাটারে?

হরিপদ হনুমানের ভাষায় বলল— চিনতে পারছ না দাদা? আমি তোমাদেরই একজন।

— চালাকি হচ্ছে? পালের গোদা তেড়ে এল। তোর গায়ে যে মানুষ মানুষ গন্ধ! তুই নিশ্চয় মানুষের ঘরে বড় হয়েছিস! ওরে জাতনাশা! তোকে গোবর খেতে—

অন্য একটা হনুমান বলল— ওর লেজটাও কেমন বিচ্ছিরি! ছ্যা, ছ্যা,! একি লেজ?

পালের গোদা হুকুম দিল— আয় তো সবাই মিলে টেনে ছিঁড়ি। ওর একটা ভাল লেজ দরকার।

হুকুম পেয়েই সব হনুমান হরিপদর লেজটা ধরে জয় রাম বলে যেমনি হাঁক মেরে দিয়েছে হ্যাঁচকা টান, অমনি জেলটাও গেছে খুলে।

আর হরিপদও সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হয়ে উঠেছে।

একদঙ্গল হনুমানের ভেতর একটা মানুষ ঢুকে পড়লে অবস্থা ভারি শোচনীয় হয়। হরিপদকে সবাই মিলে খামচাতে শুরু করল। দু-চারটে ক্ষুদে বাচ্চা হনুমান সুড়সুড়িও দিতে থাকল। হনুমানের ভাষায় চেঁচাতে লাগল তারা — রাম! রাম! এটা যে মানুষ!

হরিপদ লাফালাফি জুড়ে দিল এবং চেঁচাতে থাকল — ওরে বাবা! ওরে বাবা! বাঁচাও! বাঁচাও!......

হরিপদ তাকাল। পিসি দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে। বসল—

ও হরে, স্বপ্ন দেখছিলি? ওঠ, ওঠ। কত বেলা হয়েছে।

হরিপদ এক লাফে উঠে বসল। স্বপ্ন দেখছিল? তাই বটে। কিন্তু পিঠের দিকে শিরদাঁড়ার নীচের ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়। ওই স্বপ্নটাই বা সত্যি হতে বাকি থাকে কেন?

ওই তো তার ভবিষ্যৎ। সব স্পষ্ট দেখতে পেল।

হরিপদ কাঁদো কাঁদো মুখে বলল— ও পিসি, হারু কবরেজকে একবার খবর দাওনা গো! আমার .... আমার নাকি লে-লে-লে......

হরিপদ মাঝে মাঝে তোৎলামি করে। পিসি বলল .... কেন রে? হারুদাকে কেন? উঠোন থেকে সেই সময় কে ডাকল— ও হরে! কলকাতা থেকে এসেছিস শুনলুম— দেখা করতে যাস নি যে বড়?

মেঘ না চাইতেই জল। হারু কবরেজ এসে গেছেন। ঘরে ঢুকতেই হরিপদ লুটিয়ে প্রণাম করল। তারপর বলল— ও পিসি, তুমি হারুজ্যাঠার জন্যে চা আনো। ততক্ষণে

আমি অসুখটা দেখিয়ে নিই।

পিসি বেরুলে হরিপদ দরজা বন্ধ করে চাপা গলায় বলল— জ্যাঠামশাই, দেখুন তো এটা কি গজাচ্ছে শিরদাঁড়ার নীচে!

হারু কবরেজ দেখেই ফিক করে হেসে বললেন— ব্যাঘ্রস্ফোট!

ওরে বাবা! হরিপদ আঁতকে উঠল। তারক কবরেজ বলেছে যা, তাতে হনুমান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। হীরু কবরেজ যা বলছেন, তাতে যে বাঘ হওয়ার সম্ভাবনা আছে! হরিপদ ভয় পেয়ে বলল— বাঘের লেজ? ওরে বাবা? তাহলে কি সোঁদরবনেই গিয়ে ঢুকতে হবে?

হারু কবরেজ বললেন— তোমার মাথা! ব্যাঘ্রস্ফোট মানে পাড়াগাঁয়ে যাকে বলে বাঘা ফোঁড়া। বুঝলে? তোমার ওটা ফোঁড়া হয়েছে। ভোগাবে। ঠিক আছে। ওষুধ দিচ্ছি। কালই ফেটে যাবে! ভেবো না। আসলে এবছর যা গরম পড়েছিল, ঘরে ঘরে সব্বাইর শুধু ফোঁড়া হচ্ছে।

হরিপদ এবার বাঘের মতো লাফ দিয়ে ফের কবরেজের পায়ের ধুলো নিল।